সার্ধশতবর্ষে

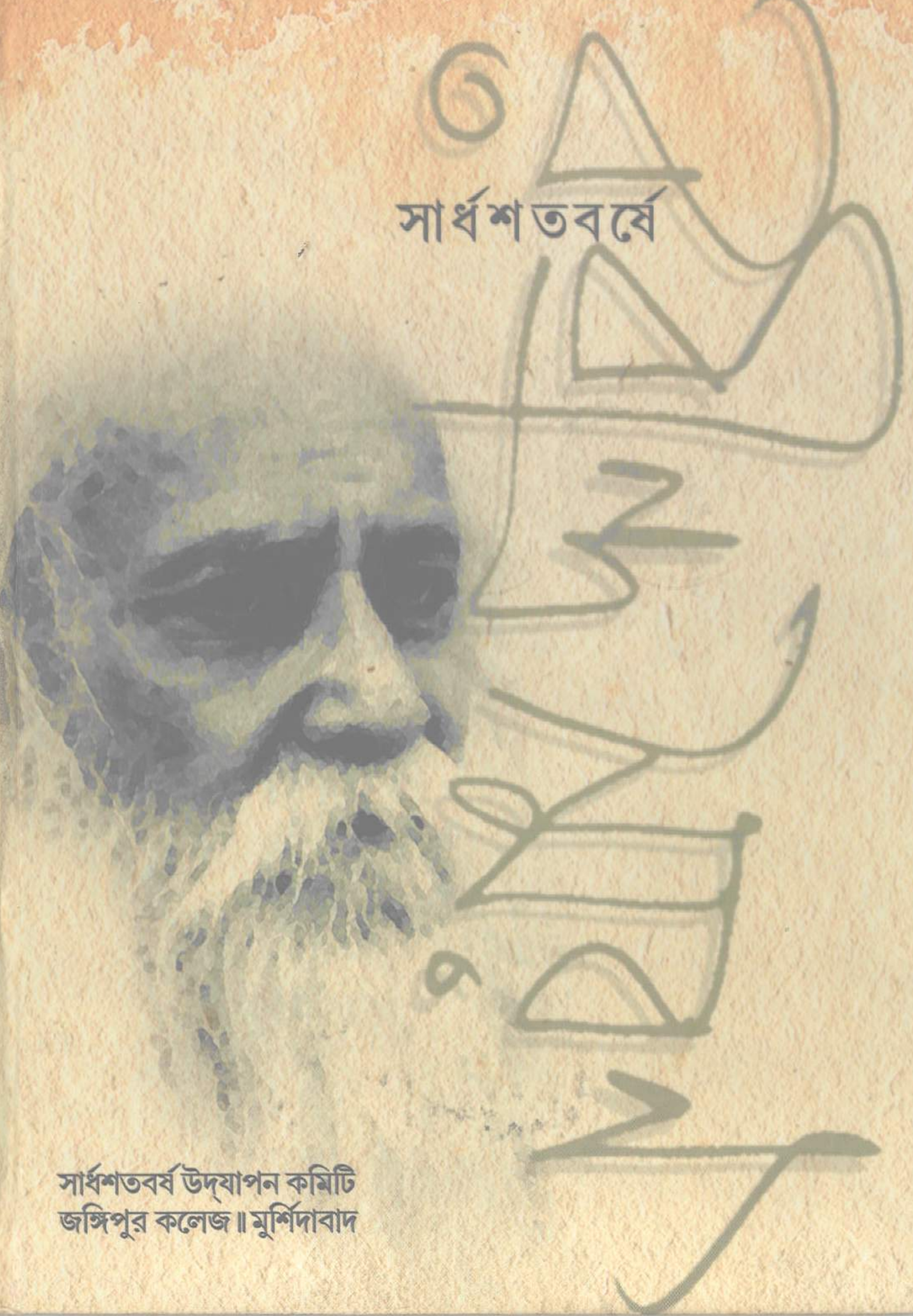

সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি
জঙ্গিপুর কলেজ ॥ মুর্শিদাবাদ

সার্ধশতবর্ষে

রবীন্দ্রস্মরণ

সম্পাদনা
নুরুল মোর্তজা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জঙ্গিপুর কলেজ

আর্ট পাবলিশিং
৮সি, টেমার লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : বাইশে শ্রাবণ ১৪১৮

গ্রন্থস্বত্ব : অধ্যক্ষ, জঙ্গিপুর কলেজ

ISBN : 978-81-921883-0-0

আর্ট পাবলিশিং, ৮সি, টেমার লেন, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তি মুদ্রণ, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত। অক্ষর বিন্যাস : বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ : সুব্রত মাজি

মূল্য : একশো টাকা

মুখবন্ধ

উচ্চশিক্ষা দপ্তর কিংবা সরকারি নির্দেশনামা আসার আগেই জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমবেত উদ্যোগে গঠিত হল রবীন্দ্রনাথের 'সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি'। ঠিক হল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনাচক্র, গবেষণাধর্মী রচনা-সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ এবং ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হবে। কর্মসূচি রূপায়ণে বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করা হল এবং উপসমিতিগুলি অনুষ্ঠানের আয়োজনে কাজ শুরু করে দিল। সীমিত অর্থ-সামর্থ্য নিয়ে মূলত ছাত্রছাত্রীদের অদম্য উৎসাহে আয়োজন অনেকাংশে সফলতা পেল। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের কাজে গতি আনা গেল না। তার অন্যতম কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখাগুলি হাতে না-পাওয়া। বর্তমান সংকলনে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের রচনা। আমাদের অনুরোধে তাঁদের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও লেখাগুলি পাঠিয়েছেন বলে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। সার্ধশতবর্ষের কর্মসূচিগুলির মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশনার পরিকল্পনাটিকে আমরা বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছি। নিঃসন্দেহে অন্যান্য অনুষ্ঠানের তুলনায় এই কাজটির স্থায়িত্ব বেশি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠককুল বহুদিন পরেও এই গ্রন্থ থেকে তাঁদের মননের রসদ পেলে আমাদের আয়োজন সার্থক হবে।

সার্ধশতবর্ষের মতো বড়ো উপলক্ষ যে কোনো সৃজনশীল মানুষের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আগ্রহের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের কর্মচঞ্চল জীবনে মানববিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্র হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং সেই উপলব্ধ বিশ্বকে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভায় জারিত করে অনন্য সাহিত্যরূপে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্য সম্ভারের অন্তর্নিহিত আবেদন মানবচিত্তের বন্ধনমুক্তি

পুঁথি-নির্ভর শহুরে সংস্কৃতি ধারণ করেননি। বহমান লোকসংস্কৃতিকে তিনি জাতির আত্মপরিচয় বলে জানতেন। তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের মতো নাটক ও মঞ্চভাবনায় লোকঐতিহ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনার অনুপম মিশ্রণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাটক ও তাঁর মঞ্চভাবনা বিষয়ে ড. বিমলচন্দ্র বণিকের দীর্ঘ প্রবন্ধটি সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল কাব্য-মালঞ্চে বহু বিচিত্র ফুলের সমারোহ। রবীন্দ্র কবিতায় ফুলের ব্যবহার নিয়ে একটি ফুলের মতো সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়। জীবনের প্রথমপর্বে কবি একটি কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), আর সাহিত্য জীবনের বানপ্রস্থে এসে চিত্র ও সংগীত নিয়ে মগ্ন থেকেছেন। কবিতা, ছবি ও গান নিয়ে কবির অন্তরের অনুরাগ সমান ছিল। ড. শীলা ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছবি ও গান নিয়ে আলোচনা করেছেন। জন্মের দেড়শো বছর পর সংগীতরসিক বাঙালির মনে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কবির বাড়তি আত্মবিশ্বাসের কারণ অজানা নয়। লোকায়ত শেকড় আঁকড়ে, জাতীয় শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে, আন্তর্জাতিক পুষ্পে সুরভিত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য-ফল প্রদান করা সেই সংগীতের মর্মকথা। ড. শুচিস্মিতা সান্যালের 'ভারতীয় সংগীতের ধারায় রবীন্দ্রসংগীত' রচনাটি রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে আগ্রহী পাঠক-শ্রোতাকে তৃপ্ত করবে। 'গীতাঞ্জলি' কবিতা সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। সেই সংকলনের ইংরেজি অনুবাদ কবিকে তথা পরাধীন ভারতবাসীকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান এনে দেয়। সেই অসামান্য কীর্তির একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে অধ্যাপক সাধন দাসের বিশেষ নিবন্ধ 'গীতাঞ্জলি : শতবর্ষ পরে'। ঊনবিংশ শতাব্দের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যু ঘটেছে পরাধীন ভারতে। তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ। পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার অভিপ্রায়ে গঠিত হয়েছে একাধিক সংগঠন; সংঘগুলি কখনো বিচ্ছিন্নভাবে কখনো সংগঠিতভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বড়ো ঘটনাগুলি কবিকে উদ্বেলিত করেছে নিরন্তর। তিনি যেহেতু সর্বমানবিক ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন অতএব কোনো ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলে পাশ কাটাতে পারতেন না। সেই সব অভিঘাত কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো-বা পরোক্ষভাবে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর ইতিহাসচেতনা ও রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ক বক্তব্যগুলি লক্ষ করি বিভিন্ন প্রবন্ধ ও ভাষণে, রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আলাপচারিতায়। বর্তমান সংকলনে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা নিয়ে একটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখেছেন ড. সুকান্ত পাল এবং রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেছে অধ্যাপক সৌমেন ঘোষ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আন্তর্জাতিক চাপ কবিকে কীভাবে বিড়ম্বিত করেছিল সে বিষয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করেছেন ড. সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তথা ঐক্য সম্পাদন। স্বার্থপরতা থেকে, চিন্তা চেতনার কূপমন্ডূকতা থেকে, ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে, আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি থেকে মনুষ্যত্বের গন্তব্যে যাত্রা করার অন্যতম সহজ পথ রবীন্দ্রসাহিত্যের যথার্থ পাঠ। আজ যখন বিশ্বজুড়ে মানবতার সংকট, যখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্প (ইন্ডাস্ট্রি) অস্ত্রনির্মাণ এবং সেইসব অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র বিক্রির জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পরিকল্পিত বিরোধ, সভ্যতার সেই মহাসংকটকালে রবীন্দ্রনাথকে খুব মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন) রচিত কবি বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত কবিতার সুরে সুর মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে —

> তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
> হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
> সংক্রমিত মহামারি মানুষের মর্মে ও মজ্জায়
> প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। ...

'সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রস্মরণ' গ্রন্থটি চোদ্দটি পৃথক প্রবন্ধের সংকলন। প্রত্যেকেই উদার উন্মুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছেন। শুধুমাত্র সাহিত্যের আলোচনা নয়, — কবির ইতিহাসবোধ, রাষ্ট্রচিন্তা, গ্রামীণ ভারতবর্ষের পল্লিসঞ্জীবন-কল্পে বহুমুখী আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা কিংবা সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা আমাদের সংকলনের মানবৃদ্ধি করেছে। তাঁর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি কম বলে কবিকে বরাবর সমালোচিত হতে হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের যথার্থ পাঠকমাত্রই জানেন সেই সমালোচনা অনেকাংশে অমূলক। বিশেষ করে গীতাঞ্জলি ও তার পরবর্তীকালের কাব্য পূরবী, লেখন, পুনশ্চ, পত্রপুট, শ্যামলী এবং রক্তকরবী, কালের যাত্রা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ প্রভৃতি নাটকগুলিতে কবি নরনারায়ণের জয়ধ্বনি করেছেন। আমাদের সংকলনে গ্রথিত ড. অসীমকুমার মণ্ডল ও সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুটি এ বিষয়ে পাঠকের ধারণাকে পুষ্ট করবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শনের ভিত নির্মাণ করেছে উপনিষদের অধ্যাত্মদর্শন। প্রাক্ বিশ্বভারতী পর্বের সাহিত্য-সংগীতের মর্মবাণী তার প্রমাণ। ১৯০৯ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত 'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে ঔপনিষদিক ভাবনার বনস্পতি। উপনিষদের কয়েকটি বাণী কবিকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তার সুসংহত আলোচনা করেছেন ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে মশগুল কবি ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম' আর ১৯২০ সালেই কবি পৌঁছে গেলেন 'বিশ্বভারতী'-র বিশ্বজনীন ভাবনায়। রবীন্দ্রনাথ কীভাবে নিজেকে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে সর্বমানবিক ঐক্যের মানবধর্মে উন্নীত হলেন তার রূপরেখা পাওয়া যেতে পারে আমার রচনাটিতে। রবীন্দ্রনাথ শুধু

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ চরিত্রটিতে কিয়দংশে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রক্ষেপ আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে বিবেচনাহীন উন্মাদনা কবিকে পীড়া দিত। গ্রামীণ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করে স্বাবলম্বী জাতি নির্মাণ ছিল কবির অভিপ্রায়। আজকের দিনেও তাঁর আর্থ-সামাজিক প্রকল্পগুলি কতখানি প্রাসঙ্গিক ড. হেনা সিন্‌হার অসামান্য প্রবন্ধটিতে সে বিষয়ে চমৎকার আলোচনা আছে।

বইটি সম্পাদনার কাজে স্মারকগ্রন্থ উপসমিতির সভাপতি অসীমদা ড. অসীমকুমার মণ্ডল সবসময় অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্য দুই সদস্য মাতৃসমা হেনাদি ড. হেনা সিন্‌হা, যাঁর স্নেহহস্ত মাথায় নিয়ে যে কোনো কাজ স্বাধীনভাবে করার আস্কারা পাই; অন্যজন বন্ধুবর বিমল ড. বিমলচন্দ্র বণিক, যাঁর হার-না-মানা সংগ্রামী জীবনচর্যা যে কোনো মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার নিদর্শন, তাঁরা সবাই সর্বতোভাবে পাশে থেকেছেন। মূল কমিটির কার্যকরী সভাপতি, কলেজের অধ্যক্ষ ড. আবু এল শোকরানা মণ্ডল মহাশয়ের নিরন্তর উৎসাহ আমাদের প্রাণিত করেছে। আর্ট পাবলিশিং-এর প্রকাশকবন্ধু শ্রী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসম্ভব ধৈর্য ও তৎপরতা শেষপর্যন্ত বইটি প্রকাশে সহায়তা করেছে। প্রচ্ছদশিল্পী শ্রী সুব্রত মাজি খুব সুন্দর একটি প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করে বইটিকে শোভনরূপ দিয়েছেন। অক্ষর বিন্যাসে শ্রী বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশাদারী কর্মদক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। এছাড়াও নিভৃতে থেকে যে সমস্ত মুদ্রণকর্মীর নিবিড় শ্রমে এই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে তাঁদের সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা। মহাকবির সার্ধশতবর্ষের জন্মোৎসবে আমাদের এই সামান্য প্রয়াস রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকসমাজের কাছে যদি সামান্য কৌতূহলের উদ্রেক করতে পারে তবে আমাদের শ্রম সার্থক বলে গণ্য হবে।

জঙ্গিপুর কলেজ — নুরুল মোর্তজা

আগস্ট ২০১১

সূচিপত্র

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিবাদী কণ্ঠ / ড. অসীমকুমার মণ্ডল ১১

উপনিষদের কয়েকটি বাণী ও রবীন্দ্রনাথ / ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫

রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' পাঠের ভূমিকা / নুরুল মোর্তজা ৪২

রবীন্দ্র মঞ্চভাবাদর্শ : উৎস থেকে মোহনায় / ড. বিমলচন্দ্র বণিক ৫২

রবিঠাকুরের ফুলবাগানে / ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ৮৫

রবীন্দ্রভুবনে : ছবি ও গান / ড. শীলা ভট্টাচার্য ৯১

ভারতীয় সংগীতের ধারায় রবীন্দ্রসংগীত / ড. শুচিস্মিতা সান্যাল ৯৮

গীতাঞ্জলি : শতবর্ষ পরে / সাধন দাস ১০২

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা / ড. সুকান্ত পাল ১০৬

ঔপনিবেশিকতার স্বৈরতান্ত্রিক চাপ ও রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা /
ড. সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৫

সাংকেতিক নাটক : রবীন্দ্রভাবনায় সাধারণ মানুষ /
ড. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা : জাতীয়তাবাদ / সৌমেন ঘোষ ১৪২

রবীন্দ্রনাথের পল্লি সংগঠন ভাবনা : একালের প্রেক্ষিত / ড. হেনা সিন্‌হা ১৫৪

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিবাদী কণ্ঠ

ড. অসীমকুমার মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ যেহেতু Art for art's sake-এ বিশ্বাসী ছিলেন তাই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন একথা বলা যায় না। বহির্বিশ্বের নানা দৃশ্য বর্ণ গন্ধ ঘটনা মানুষের হৃদয়ে যে বহু বিচিত্র অনুভূতি জাগায়, হৃদয়কে আলোড়িত করে তাকেই মুখ্যত আনন্দ দানের জন্য তাঁর বিচিত্র শ্রেণির রচনার মধ্যে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি ছিলেন ভাববাদী রোমান্টিক কবি, ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি, এই বিশ্বের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। কিন্তু অন্যান্য ভাববাদী ধার্মিক সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ও জগৎদর্শনের পার্থক্য ছিল। ধার্মিকরা কেউ কেউ মনে করেন যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগৎ পরিপূর্ণ, সুন্দর ও মঙ্গালময়। এখানে কোনো অপূর্ণতা, অসুন্দর ও অমঙ্গালের অস্তিত্ব নেই — আপাতদৃষ্টিতে যাকে অমঙ্গাল বলে মনে হয় তার পিছনে রয়েছে কোনো বৃহত্তর মঙ্গাল যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না — তাই বর্তমান প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কার, রীতি-নীতি ইত্যাদির পরিবর্তনের প্রয়াস অর্থহীন। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন রবীন্দ্রনাথ এই ভুবনে শুধুই সুন্দর ও মঙ্গাল দর্শন করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে সেই সুন্দর ও মঙ্গালই স্থান পেয়েছে — যেহেতু তাঁর দৃষ্টিতে বাস্তবের কোনো অপূর্ণতা, অমঙ্গাল বা অসুন্দর প্রতিভাত হয়নি তাঁর সাহিত্যেও তাই অমঙ্গাল, অপূর্ণতা বা কুৎসিতের অর্থাৎ বাস্তবের যথাযথ প্রতিফলন অনুপস্থিত। যাঁর দৃষ্টিতে জগৎ-সংসারের কোনো অনিয়ম, অকল্যাণ, অন্যায়, অপকর্ম ধরা পড়ে না তাঁর রচিত সাহিত্যে তার প্রতিফলিত হওয়ার বা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করার কোনো প্রশ্ন আসে না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ ধরনের মূল্যায়নের সঙ্গো আমি একমত হতে পারি না। কারণ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই সমাজ-সংসারের অমঙ্গাল, অসুন্দর ও অপূর্ণতা ধরা পড়েছে এবং তাঁর সৃষ্টিতে তার প্রতিফলনও ঘটেছে। এই ধরণীকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রাণভরে ভালোবাসতে চেয়েছেন, এই পৃথিবীকে তিনি নিষ্কলুষ নিটোল শতদল-পদ্মের মতো সুন্দর দেখতে চেয়েছেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল বিশ্ববিধানের পরিণাম মঙ্গালময়, তিনি দেখেছেন — 'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা। মঙ্গালঘট হয়নি যে ভরা', কিন্তু আশা করেন সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে তা পূর্ণ হবে; এই বিশ্ব-সংসারে পূর্ণরূপে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে তিনি দেখেননি। তবে আশা করেছেন একদিন তা

প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি এদেশের মানুষের ধর্মাচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু তাকে ত্রুটিহীন বিশুদ্ধ রীতি বলে মনে করেননি, সত্যপথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; বিশ্বের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থার দিকে উদার মুক্ত ও সহানুভূতির সঙ্গে দৃষ্টিপাত করে খুব সতর্কতার সঙ্গে তার অপূর্ণতার দিকগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি তার যথার্থ রূপের সন্ধান দিতেও প্রয়াসী হয়েছেন — তিনি পরিপূর্ণতাকে বাস্তবে সম্পূর্ণরূপে দেখেননি, বিশ্বাস করেছেন আমরা ধীরে ধীরে সে-দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। এই আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, ইচ্ছা ও প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের থাকাই স্বাভাবিক। মানুষ জীবনে বেঁচে থাকবে কী আঁকড়ে ধরে, সৃষ্টি করবে কোন আশায় যদি এইসব স্বপ্ন না থাকে!

তবে রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ধরনের বাস্তবতা বা কুৎসিত ও অমঙ্গলের প্রকাশ কম বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয় সেগুলো হয়তো কিছুটা সত্যি — বিশেষ করে কাব্য ও কবিতার ক্ষেত্রে, সেখানে শুভর প্রকাশ যত ব্যাপক অশুভ অসুন্দর ততটা নয়। অশুভ ও হতাশার প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যে পূর্ণিমা চাঁদের কলঙ্কের মতো এবং আধুনিক কাব্যে শুভ ও আশা মরুভূমির মরীচিকার মতো। অকল্যাণ অসুন্দর রবীন্দ্রকাব্যে চাঁদের কলঙ্কের মতো হওয়ার কারণও ছিল। তিনি চাননি বাস্তব সংসারের অশুভ ও অমঙ্গলের দিকটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরতে। তাঁর অনীহা ছিল পাঠককে মাইলের পর মাইল নিবিড় অন্ধকারে পথ হাঁটাতে; আলোকিত পথেই চলুক পাঠক, মাঝে মাঝে অন্ধকারেও — সবখানে যে এখনো আলো জ্বলেনি এটা সে জানুক; তবে তার মধ্যে এই হতাশা না জাগুক যে অন্ধকার ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে আলোকে ক্রমশ গ্রাস করেছে — বরং তিনি এই আশা জাগাতে চেয়েছিলেন যে অসৎ থেকে সৎ-এ, তমসা থেকে আলোর দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা।

রূঢ় বাস্তবের দুঃসহ দুঃখ-যন্ত্রণার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রবীন্দ্রসাহিত্যে না থাকার কারণ এই নয় যে, এই চিত্র যতটুকু আছে তাঁর অভিজ্ঞতা ততটুকুই ছিল। বাস্তবে তাঁর এই অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশি কিন্তু তার প্রকাশ ছিল কিছুটা কম। তবে আধুনিক সাহিত্যিকদের যতটা এ ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথের ঠিক ততটা ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথের যে তা থাকা সম্ভব ছিল না তা বোঝা যায় তাঁর 'আমার কবিতা জানি আমি, / গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।'' — এই অকুণ্ঠ বিনীত ঘোষণায়। ''মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে, / ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।'' .....রবীন্দ্রনাথের এই বিনম্র উচ্চারণে ব্যক্ত অখ্যাত দরিদ্র অজ্ঞ ও নিরানন্দ মানুষদের মর্মের বেদনার সম্যক ধারণা সম্পর্কে কিছুটা অভাববোধের কারণটি।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বাস্তব জীবনের সংসর্গ কিছুটা কম — এইরকম মনে হওয়ার পিছনে কাজ করেছে বিশ শতকের তিরিশের দশকের বাস্তববাদী, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী, আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় বাস্তবের অমঙ্গল অশুভ কদর্য অন্যায় দুঃসহ

দুঃখ-যন্ত্রণা ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্রের বর্ণনা। আধুনিক সাহিত্যে বাস্তবতার যথাযথ প্রতিফলন ঘটুক — এটা যে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তা আমরা উপলব্ধি করি তাঁর এই উচ্চারণ থেকে — "এসো কবি অখ্যাত জনের / নির্বাক মনের / মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার / প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার, / অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক সেই মরুভূমি / রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।" একই সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যে বাস্তবতার অনুপুঙ্খ চিত্র দেখে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ..... "সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি / ভালো নয় ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।" তাহলে আধুনিক সাহিত্যে লেখকেরা কুৎসিত অশুভ ও অমঙ্গলকে কি বাস্তবে যতটা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি করে তুলে ধরেছেন? এ প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব মন্তব্য করেছেন — "আধুনিক সাহিত্যে অমঙ্গলবোধ স্বাভাবিক বা যথাযথ নয়, সযত্ন চর্চিত ও মাত্রাজ্ঞান রহিত।"

বাস্তবে অমঙ্গলের অভিজ্ঞতাটা যতটা ছিল সাহিত্যে তার প্রতিফলন ততটা ঘটেনি রবীন্দ্রনাথের — একথা পূর্বে বলেছি এবং তার কিছু কারণও উল্লেখ করেছি। আরও কিছু কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার নবজাগরণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ রোমান্টিক কবি। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির উদার ও গৌরবময় আদর্শ আধুনিক ভারতবাসী তথা বাঙালির সামনে তুলে ধরে এই প্রাচীন ঐতিহ্যের মঙ্গলময় দিকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সমালোচনা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আদর্শে করেননি — প্রাচীন কবিরা তাঁদের রচনায় কী বলতে চেয়েছেন সেটাকে শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তিনত দৃষ্টিতে উপলব্ধি করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সমালোচনা হল পূজা। সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে তার ভালো-মন্দ-বিশ্লেষণ নয়, সমগ্র সৃষ্টিকে সংশ্লেষণধর্মী অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখে তার ব্যাখ্যাকেই তিনি আদর্শ সমালোচনা মনে করেছেন। তাই রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির মধ্যে ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ করার মহান আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এই মহান আদর্শকে রামায়ণের সমালোচনায় বড়ো করে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রামায়ণে কৈকেয়ীর মতো রাজ-মহিষী এবং মন্থরার মতো দাসীও ছিল যারা নিজের অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সংসারে এমন কর্ম করতেও পিছপা হয় না যাতে স্বামীর জীবন বিপন্ন হয়, পরিবার আক্রান্ত হয় গভীর দুঃখ যন্ত্রণায়। বাল্মীকি বাস্তবের এই অশুভ ও অকল্যাণ অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে জায়গা ছেড়ে দেননি যাতে সমগ্র কাব্য জুড়ে অশুভ, অকল্যাণ ও অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয় এবং বেশি গুরুত্ব পায়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারে অবতরণ করেছিলেন অমূল্য রত্নের সন্ধানে, সেখানে তিনি যে শুধু হিরে-জহর-সোনা-দানাই দেখতে পেলেন, কাঠ-কয়লা তাঁর চোখে পড়ল না, এ হতে পারে না, কাঠ-কয়লাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অশুভ

অকল্যাণ অশান্তিকে বাল্মীকির মতোই বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক ভারতবাসী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভালো দিকগুলি গ্রহণ করুক এবং তার আলোকে এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির খারাপ দিকগুলি বর্জন করুক — অন্যদিকে একইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল রত্নগুলি সাদরে গ্রহণ করুক এবং তারই আলোকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির খারাপ দিকগুলি প্রত্যক্ষ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করুক। বাল্মীকির রামায়ণে যুদ্ধ আছে, দুঃখ আছে কিন্তু পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য নেই, শুধু রামায়ণ নয় মহাভারত এবং কালিদাসাদি অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যস্রষ্টাদের রচনাতেও তা অনুপস্থিত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাই প্রায় আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। গ্রিক ট্র্যাজেডি নাটকের চূড়ান্ত নৈরাশ্যময় হাহাকার শেক্সপিয়ারও মেনে নিতে পারেননি। তাই গ্রিক ট্র্যাজেডির নির্দোষ ব্যক্তির শুধু নিয়তির নির্দেশে অমোঘ পরাজয় না দেখিয়ে তার কিছু ত্রুটিকে এই পরিণতির কারণ হিসেবে তুলে ধরে নতুন ধরনের ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছেন এবং রেনেসাঁসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ পাঠকের দ্বারা তা সানন্দে গৃহীতও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের অকল্যাণকর ও অশুভ দিকগুলি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে ঘোষণা করলেন রামায়ণে ভারতবর্ষের ঘরের কথাকে বৃহৎ করে দেখানো হয়েছে; আর সেই কথা বাহুবল নয়, যুদ্ধ নয়, ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগের সুমহান আদর্শ যার প্রকাশ লক্ষ করা যায় রাম-সীতা-লক্ষ্মণ প্রভৃতির ত্যাগের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ এই লক্ষ্য নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের উপবনে প্রবেশ করেন এবং রামায়ণের স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর একটা যেন মিল খুঁজে পান।

মহাভারতের মূল কথা ত্যাগ। সেখানে যুদ্ধ আছে ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য, সে অধিকার যখন অর্জিত হয়েছে তখন পাণ্ডবরা ধনসম্পদ রাজ্য সব ত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের পথ বেছে নিয়েছে, কিছুই ভোগ করেনি। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের এই শুভবোধের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যে প্রভাবিত হন একথা অনস্বীকার্য। কালিদাসের কল্যাণবোধের দ্বারাও প্রভাবিত হন তিনি। আমরা লক্ষ করি তিনি শকুন্তলার সঙ্গে টেম্পেস্টের তুলনামূলক আলোচনা করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে শকুন্তলা নাটকের যদিও তার সূত্র তিনি পেয়ে যান কবি গ্যেটের কাছে। তবে এটা বড়ো কথা নয়, বড়ো হল শকুন্তলা নাটকের ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য। দুর্বাসার অভিশাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারল না, শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হল, শুরু হল তার দুঃখের তপস্যা, শেষে মাছের পেট থেকে পাওয়া আংটি দেখে দুষ্মন্তের পূর্বের স্মৃতি ফিরে পেল এবং উভয়ের দুঃখ অনুশোচনার পর মিলন ঘটল। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনির কোনো অবাস্তবতা বা আকস্মিকতার সমালোচনা করেননি, যদিও তখন এগুলো নাটকের ত্রুটি বলে গণ্য হত না। তিনি বললেন কালিদাস সুকৌশলে নাটকের মধ্যে শান্তি ও শুভচেতনার বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য দুর্বাসার অভিশাপের ঘটনাটিকে স্থান

দিয়েছেন। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম মিলন যে স্থায়ী হত না তার বীজ নিহিত ছিল তাদের স্ভাবের মধ্যে। শকুন্তলার প্রেম ছিল জগৎ-বিমুখ, আর দুষ্মন্তের হৃদয়ে প্রেমের কোনো বোধ ছিল না, কারণ নারী ছিল তাঁর কাছে সহজলভ্য। কাজেই শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত চিনতে পারলে সে হংসপাদিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করত মাত্র। তাদের উভয়ের মধ্যে যথার্থ পরিপূর্ণ প্রেমের জাগরণ ও বিকাশ ঘটত না।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিচ্ছেদের মূল যে নিহিত ছিল দুষ্মন্তের স্বভাবের মধ্যেই — কালিদাস তা আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের মতো অনুপুঙ্খ চিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেননি, আভাসে ইঙ্গিতে নেপথ্যে হংসপাদিকার উদাস বেদনাবিধুর সংগীতে তা ব্যক্ত। কালিদাস স্বভাবকে অস্বীকার করেননি, দেহকেও উপেক্ষা করেননি, তবে স্বভাবকে কুৎসিতকে শান্ত স্নিগ্ধ কল্যাণকর বাতাবরণে সংযত রেখেছেন, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি। এটিও তাঁর বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনা নয়, তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে স্রষ্টাদের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এরা কেউ উপেক্ষিত নয়, তবে আমার মনে হয় বাণভট্টের কাদম্বরী এই দৃষ্টিতেও উপেক্ষিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিকোণ থেকে ঊর্মিলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ও কাদম্বরীকে উপেক্ষিতা বলাতে প্রয়াস পেয়েছেন তাতে চরিত্রগুলিসহ প্রবন্ধটি মৌলিক সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। আমরা সেটা লক্ষ করি ' মেঘদূত' প্রবন্ধেও। নবজাগরণের কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরে সংসারের কদর্যতা সম্পর্কে যতটা ধারণা ছিল ঠিক ততটাই তাঁর রচিত সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে না বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা বলেছি রোমান্টিক গীতিকবি। রোমান্টিক কবি কল্পনার দৃষ্টিতে জগৎকে দর্শন করেন, হৃদয়ের আলোকে যাকে সত্য, সুন্দর ও মহানরূপে অনুভব করেন তাকেই সাহিত্যে স্থান দিয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে যা ক্ষুদ্র-তুচ্ছ, সাধারণ রোমান্টিক কবির দৃষ্টিতে তাই অনেক সময় অসাধারণ সুন্দর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক দৃষ্টিপাতে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য-মাধুর্য, বর্ণ-গন্ধ, রূপ-রস, স্নেহ-প্রেম, ভক্তি-ভালোবাসা, ক্ষমা-ত্যাগ, উদারতা-মহত্ত্বতা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বেশি প্রত্যক্ষ করেছেন কদর্যতা, হীনতা, বর্বরতা, কাপুরুষতা, অন্যায়, অধর্ম প্রভৃতির থেকে। সম্ভবত এটাও একটি কারণ রবীন্দ্র সাহিত্যে অশুভ অকল্যাণ অপেক্ষা সুন্দর ও কল্যাণের বেশি স্থান জুড়ে থাকার।

রবীন্দ্রসাহিত্য হীনতা-নীচতা, অশুভ-অকল্যাণ অমানবিকতা-অসুন্দরের প্রতিফলন কম ঘটেছে একথা বলা হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে। আধুনিক সাহিত্যে কুশ্রী-কর্দযতার, ক্ষুদ্র-তুচ্ছের, অন্যায়-অপকর্মের, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণার চিত্র বেশি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে প্রাচ্য ও পাশচাত্য উভয় দেশেই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কল্লোল-কালিকমল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের এই প্রবণতা দেখা দিয়েছিল যতটা পাশচাত্য প্রভাবে ততটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। তবে মানুষের জীবন-যন্ত্রণা যে আগের থেকে বেড়েছে,

তাঁদের জীবন ও জগৎকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটেছে আগের থেকে এদেশেও তা অনস্বীকার্য এবং তার ছাপ যে রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যে পড়বে এ বিষয়ে দ্বিমত থাকার কথা নয়। পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্য-রচনার বিষয় প্রথমে ছিল ঈশ্বর ও ধর্ম, পরে সেখানে স্থান পেয়েছে রাজা-মন্ত্রী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ, আরও পরে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত ও মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের জীবন-যন্ত্রণার কথা স্বাভাবিক নিয়মে। এই কারণে মানুষের কামনা-বাসনা, শোষণ-নিপীড়ন, দুঃখ-যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বেশি প্রতিফলিত। প্রসঙ্গত আমরা মনে রাখব বাস্তব জীবনের হীনতা-নীচতা, দুঃখ-যন্ত্রণা, দৈহিক কামনা-বাসনা ইত্যাদির বাস্তব অভিজ্ঞতা যতটা ছিল রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে তাকে স্থান দিয়েছেন অনেকটা সংযতভাবে; অন্যদিকে কল্লোলের যুগের লেখকরা এগুলো যতটা দেখেছেন ততটাতো বলেইছেন, অনেক সময় রোমান্টিক কল্পনার দৃষ্টিতে কিছুটা বেশি করে বাড়িয়েও বলেছেন।

রামায়ণ-মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, কালিদাস প্রভৃতির ভক্ত-পাঠক রবীন্দ্রনাথের আর একটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা এখানে বলব। তিনি কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসের কথা জানালেও আমরা দেখেছি মানব-কল্যাণ তাঁর সাহিত্য রচনার আর একটি লক্ষ্য ছিল। তবে এই লক্ষ্য তিনি পূরণ করেছেন আর্টের ধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে। যেসব সামাজিক প্রথা, সংস্কার, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের অকল্যাণ করে সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন এবং তা দূর করার কথাও বলেছেন; কিন্তু তা বলেছেন প্রচারধর্মিতা ও উদ্দেশ্যমূলকতাকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণত্ব। প্রবন্ধে সরাসরি মানব কল্যাণের কথা বলেছেন ..... বলা সম্ভবও। কাব্য-কবিতা, নাটক বা গল্প-উপন্যাসে সেটা সরাসরি বলেননি, কৌশল অবলম্বন করেছেন ...... সেটাই স্বাভাবিক।

মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন মানবতার অপমান, মানুষের দুঃখ-বেদনা তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। তখন কবি অনুসন্ধান করেছেন সেই কষ্ট-যন্ত্রণার উৎসের। তারপর তিনি প্রতিবাদ করেছেন সেই নীতি-নিয়মের যা মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার মূল কারণ।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রতিবাদী কণ্ঠ :

এদেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ যে দারিদ্র্য তা বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন এ দেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ ধনী জমিদারদের শোষণ। তিনি 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় প্রতিবাদ করে বললেন ...... 'এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি / রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।'

এদেশের শিক্ষিত ও ধনী মানুষেরা দরিদ্র জনগণকে যুগ যুগ ধরে অবজ্ঞা করে

এসেছে, প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়নি ..... শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করেছে দেখে 'গীতাঞ্জলির' ১০৮ নং কবিতায় রবীন্দ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হল ...... "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে / পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

ধনী-সমাজ যদি দরিদ্র জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে না দেয় তাহলে কি তারা চিরকাল একই অবস্থায় থাকবে? ধনী-সমাজ তা না দিলে অবহেলিত জনগণকেই সম্মিলিতভাবে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এইভাবে প্রতিবাদ করার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কবি। তাই 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় বলেছেন — "যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে / যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;"

ধর্ম বলতে সাধারণত মানুষ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলি নিখুঁতভাবে পালন করাকেই বোঝে। আর এই আচারগুলি তারা পালন করে অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে। এই ছিদ্র-পথেই হিন্দু-ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে আবেগ-উন্মত্ততা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদের সংকীর্ণতা জাতীয় মানবজাতির অমঙ্গালকর ব্যাধিগুলি। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম-পালনের এই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে জানালেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশই হল মানুষের প্রকৃত ধর্ম। জাত-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে ভালোবাসাই হল মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। ঈশ্বর মন্দির-মসজিদ ইত্যাদি দেবালয়ে নেই, তিনি আছেন সমস্ত মানুষের মধ্যে। তাই যথার্থরূপে ধর্ম পালন করতে হলে ধর্মাচারের মধ্য থেকে এই ব্যাধিগুলি দূর করে সকল মানুষকে ভালোবাসতে হবে। সংসার ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, এখানে থেকেই মানুষকে ভালোবাসতে হবে, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে হবে ..... অন্যথায় ধর্ম পালন হয়ে উঠবে অর্থহীন। 'চৈতালি' কাব্যের 'দেবতার বিদায়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বলেছেন ......

"জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে"

একই কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'কাঙালিনী' কবিতায়। 'চৈতালী' কাব্যের 'পুণ্যের হিসাব' কবিতায় কবি লিখেছেন ......

"চিত্রগুপ্ত হেসে বলে, 'বড়ো শক্ত বুঝা।
যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।"

এ কাব্যের 'বৈরাগ্য' কবিতায় দেবতার উক্তিতে কবি বলেছেন ....

" দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?"

'গীতাঞ্জলি'র একশো উনিশ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ঈশ্বর আছেন খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শুচি' কবিতার শ্মশানবাসী চণ্ডাল ও মুসলমান জোলা কবীরকে রামানন্দ বুকে জড়িয়ে ধরে হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যতাকে দূর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। একই উদ্দেশ্যে ' প্রেমের সোনা' কবিতায় চিতোরের রানি ঝালি রাজপুরোহিতদের ধিক্কার অগ্রাহ্য করে রবিদাস চামারের কাছে হরিপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'গীতাঞ্জলি'র 'ভারততীর্থ' কবিতায় একই লক্ষ্যে কবি বলেছেন — "এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন / ধরো হাত সবাকার।"

নিরর্থক শাস্ত্রীয় আচার যা মানুষের মুক্ত জ্ঞানকে প্রতিহত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে একাধিক কবিতায়। যেমন 'নৈবেদ্য' কাব্যের একষট্টি সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন —

"জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর,
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর।"

রবীন্দ্রনাথ সামাজিক কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছেন একাধিক কবিতায়। যেমন 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় সমুদ্রকে শান্ত করার জন্য ব্রাহ্মণ মৈত্রর কথায় মোক্ষদার কোল থেকে তার ক্রন্দনরত সন্তানকে কেড়ে নিয়ে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। 'বিসর্জন' কবিতায় দেখা যায় এক নারী রোগাক্রান্ত সন্তানকে রোগমুক্ত করে ফিরে পাওয়ার আশায় এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়েছে। তার ধারণা ছিল মা গঙ্গা রোগমুক্ত করে শিশুটিকে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি .... হবার নয়।

এখানে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ না থাকলেও পরোক্ষভাবে তা ধ্বনিত। জনগণকে সজাগ ও সচেতন করার লক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই কুসংস্কারের চিত্র তুলে ধরেছেন।

'পলাতকা' কাব্যের 'নিষ্কৃতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের কুলীন সমাজের নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথার বিরোধিতা করেছেন। এখানে কুলীন নয় বলে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পুলিনকে বাদ দিয়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে মঞ্জুলিকার বিয়ে দিয়েছিল তার বাবা। বিয়ের কিছুদিন পরেই সে হয় বিধবা। বিধবা মঞ্জুলিকা কিছুদিন পর বাড়ি থেকে চলে গিয়ে সেই অকুলীন পাত্র পুলিনকে বিয়ে করে কুলিন সমাজের নিষ্ঠুর প্রথাকে রীতিমতো আঘাত করে নিজের নিরানন্দ জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করে তুলেছে। কুলীন প্রথার বিরুদ্ধে এটা মঞ্জুলিকার প্রতিবাদ।

পৃথিবীতে দুটি মহাযুদ্ধে মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মূলে ছিল Nationalism বা উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদ এবং তারই ক্রমপরিণতি সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ উপনিবেশ-বিস্তার যুদ্ধ ইত্যাদি। উগ্র জাতীয়তাবাদী বা

ফ্যাসিবাদী মনোভাব কোনো দেশের মানুষের মনে তখনই জাগে যখন তারা বিজ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে এবং ধনের অপরিমিত লোভ তাদের গ্রাস করে, তারা অমানুষে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির এই অর্থলোলুপতা, উপনিবেশ-বিস্তার, পররাজ্য-আক্রমণ সমগ্র মানবজাতির কাছে চরম অমঙ্গল ও অশুভ বিষয়। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে দুঃখে ও ক্ষোভে এই অন্যায় বর্বরতা ও অসভ্যতার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছে তীব্র ধিক্কার। 'পত্রপুট' কাব্যের ষোলো সংখ্যক 'আফ্রিকা' কবিতায় কবি বলেছেন —

"এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।"

এখানে আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার ও অমানবিক শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশিত। কবিতাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রচিত। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠে তাই ব্যক্ত হল ....

"আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল —
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি,"

এ কাব্যের সতেরো সংখ্যক কবিতাটি এক বছর পর রচিত। এই কবিতায় রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের অমানবিক কর্ম ও মানসিকতার বর্ণনা। যেমন —

"ধূপ জ্বলাল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে
'করুণাময় সফল হয় যেন কামনা'
কেননা, ওরা যে জাগাবে মর্মভেদী আর্তনাদ
অভ্রভেদ ক'রে,
ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র,
ধ্বজা তুলবে লুপ্ত পল্লির ভস্মস্তূপে
দেবে ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন,
দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।
তাই তো চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের নিতে আশীর্বাদ।"

লক্ষ করার বিষয় সাম্রাজ্যবাদীরা যখন অন্যায় করে তখন সেকাজে তাঁরা তাদের উপাস্য দেবতা বা দেবতুল্য মহামানবদের কাছে আশীর্বাদও প্রার্থনা করে। এই ভেবে তারা

আনন্দ অনুভব করে যে একাজ তারা যেন দেবতার ইচ্ছাতেই করছে বা ঈশ্বরই সে কাজ তাদের মাধ্যমে করছেন। রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় সাম্রাজ্যবাদীদের এই মনোভাবের দিকটি তুলে ধরেছেন তাঁর একাধিক কবিতায় এবং 'মুক্তধারা' নাটকে। সাম্রাজ্যবাদীদের এই মানসিকতার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

যুগে যুগে এই শক্তিশালী স্বার্থপর সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতা কি অটুট থাকবে, তাদের এই অন্যায় অপকর্ম কি অপ্রতিহতভাবে চলতেই থাকবে? রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী, অকল্যাণ ও অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটবে, কল্যাণের জয় হবে ..... এই আশার বাণী পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছেন। 'আরোগ্য' কাব্যের 'ওরা কাজ করে' কবিতায় কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে —

"জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।"

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্যটি করা হলেও তা প্রযোজ্য সব সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম সম্পর্কেই। 'নবজাতক' কাব্যের 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাতে সারা পৃথিবীর সমস্ত ধন ভোগ করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং পাশাপাশি ধার্মিক সেজে গীর্জায় গিয়ে শাস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করে ঈশ্বরের উপাসনা করার কপট ভণ্ডামি লক্ষ করে দুঃখে ক্ষোভে বেদনাবিধুর হৃদয়ে ও প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

"সবে না দেবতা হেন অপমান
এ ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজও তেজ
কল্যাণ শক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।"

এখানে 'ভীষণ যজ্ঞে' বলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার কথা যেমন বলেছেন তেমনি যুদ্ধের শেষে পৃথিবীতে আবার শান্তিময় জীবন ফিরে আসবে — এ আশা ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কবিতায় এ জাতীয় ধর্মীয় কুসংস্কার ও ভণ্ডামি, সামাজিক কুসংস্কার, দারিদ্র্য, সাধারণ মানুষের প্রতি শোষণ-নিপীড়ন, অবজ্ঞা-অবহেলা ইত্যাদির অশুভ চিত্র পাওয়া যায় এবং কবি নিজস্ব স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে তার প্রতিবাদ করে

কল্যাণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রতিবাদী কণ্ঠ :

কাব্য-কবিতার আলোচনায় আমরা দেখেছি সংসারে মানুষের সুন্দরভাবে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যেগুলো পর্বত-প্রমাণ বাধা তার প্রতিবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে করেছেন কবি স্বয়ং। কবিতা হৃদয়-নির্ভর আবেগ-উচ্ছ্বাসময় শিল্প, সেখানে গল্প-নির্মাণ বা চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ কম তাই নর-নারী নির্বিশেষে কোনো চরিত্রের মাধ্যমে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ কম। তবুও 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেনকে জমিদারের অন্যায়, 'প্রেমের সোনা' কবিতায় চিতোরের রানি ঝালি ও 'শুচি' কবিতায় রামানন্দকে সংকীর্ণ জাতিভেদ-প্রথা এবং 'নিষ্কৃতি' কবিতায় মঞ্জুলিকাকে কুলীন-প্রথা ও হিন্দু নারীর বৈধব্য-সংস্কারের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করতে দেখি। নাটক ঘটনা-প্রধান সাহিত্য এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র সৃষ্টির সুযোগ বেশি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাটকেও অজস্র চরিত্র সমাবেশ এবং নানা ধরনের চরিত্রকে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার, সামাজিক-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকে হিন্দু সমাজে দেবতার পুজোয় যুগ যুগ ধরে প্রচলিত বলিদান প্রথার বিরোধিতা করে কালীপুজোয় বলিদান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন রাজা গোবিন্দমাণিক্য। রাজপুরোহিত রঘুপতি চেয়েছেন এই প্রথাকে বহাল রাখতে। তিনি ছলে-বলে-কৌশলে চেষ্টা করেছেন রানি, রাজভ্রাতা, মন্ত্রী, সাধারণ প্রজা — সকলকে নিজের পক্ষে টেনে রাজাকে পিছু হটাতে। কিন্তু শেষে দেখি গোবিন্দমাণিক্যের জয় হয়েছে, পরাজিত হয়েছেন রঘুপতি। তিনি বাধ্য হয়ে রাজার নির্দেশ মানলেন, কিন্তু হৃদয় থেকে তা মেনে নিতে পারলেন না — এভাবে কাহিনির সমাপ্তি ঘটেনি, হৃদয় থেকে বলিদান-প্রথা বন্ধের নির্দেশ মেনে নিয়েছেন, নিজেই নিজের ভ্রান্ত ধারণার বিরোধিতা করেছেন। আঘাত ও প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে এভাবেই সত্য ও ন্যায়ের জয় হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে।

অন্ধভাবে শাস্ত্রীয় নীতিনিয়ম ও কুসংস্কার মেনে চলাটাই অন্যায়। কারণ এর ফলে মানুষ মুক্ত চিন্তা ও যুক্তি-বুদ্ধির পথ থেকে দূরে সরে আসে এবং মানুষের উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হয়। মেনে চলার আগে শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় যে কোনো নিয়মকেই যুক্তি-বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। এই ধরনের শাস্ত্রীয় নিয়ম ও কুসংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' (১৯১২) নাটকে। মহাপঞ্চক, উপাচার্য, আচার্য প্রমুখ শাস্ত্রীয় নিয়ম ও শাস্ত্র-আশ্রিত কুসংস্কার অন্ধভাবে মেনে চলেন। অন্যদিকে শোণপাংশু ও দর্ভকরা কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। এরা শাস্ত্রীয় নিয়মের বন্ধন-মুক্ত। পঞ্চক এদের সঙ্গে মিশে মুক্তির আনন্দের আস্বাদ পায়। এরপর সে হয়ে ওঠে অকারণে নিয়ম মানার

বিরোধী। তার দ্বারা ধীরে ধীরে প্রভাবিত হয়েছেন অচলায়তনের মহাপঞ্চক, উপাচার্য, আচার্য সকলেই। লক্ষ করার বিষয় যে শুষ্ক শাস্ত্রীয় প্রথা ও কুসংস্কার যা মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে তাকে তীব্রভাবে এখানে আঘাত করা হলেও জোর করে নিয়ম ভাঙতে বাধ্য করা হয়নি, পঞ্চকের জীবনানুভূতি ও মুক্তবুদ্ধির আনন্দ ও উল্লাসের ছোঁয়ায় নিজেদের হৃদয়ে যথার্থ সত্যকে উপলব্ধি করে তাঁরা ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুরাতন অকল্যাণকর ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছেন। এভাবেই মানুষ সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হয়, অন্ধকার থেকে আলোতে আসে। একই জিনিস লক্ষ করা যায় 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) নাটকেও।

জাতিভেদ প্রথাকে কুঠারাঘাত করা হয়েছে 'চণ্ডালিকা' নাটকে। এখানে বুদ্ধদেবের এক শিষ্য চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির ছোঁয়া জল পান করে জাতিভেদ প্রথার অসারতা প্রমাণ করেছেন।

'বশীকরণ' কৌতুক নাটকেও হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির তীব্র বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জামাতা অন্নদা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছে; তাই শ্বশুর মেয়েকে বিধবা সাজিয়ে হিন্দুসমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু বেশিদিন চলেনি এ নিয়ম, কিছুদিন পর স্ত্রীর সঙ্গে মিলন ঘটেছে অন্নদার।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমে বিশ্বাসী ছিলেন, বিশ্বমানবতাবাদেও .... কিন্তু বিরোধী ছিলেন পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদের। আমরা জানি পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদেরই পরিণতি প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যা মানবসভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। রবীন্দ্রনাথ মানবসভ্যতার উন্নয়নের স্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের উন্নতি ও তার ব্যবহারের সমর্থক ছিলেন। তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন যন্ত্রশক্তিকে মানুষের অকল্যাণে ব্যবহার করার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেন জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদের ইষ্টমন্ত্র তারা একটুও ভুলে যায়নি, বরং সারাদেশের মানুষ যাতে নামতা পড়ার মতো মুখস্থ বলতে পারে এবং অন্যদেশের মানুষের কাছে বিভীষিকা স্বরূপ হয়ে ওঠে তার জন্য তারা পাঠশালা থেকেই ছেলেমেয়েদের সেই ইষ্টমন্ত্র শেখানো শুরু করেছে। তিনি উপলব্ধি করেন বিজ্ঞানবলে বলীয়ান পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদের মন্ত্র জপা যদি চলতেই থাকে তাহলে মানবজাতির অকল্যাণ ঘটতেই থাকবে। এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী দেশের স্বরূপ তুলে ধরেছেন এবং তার বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকে। উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ তাঁর দেশের উন্নতিসাধনের জন্য অনাবৃষ্টিতে খেতে ফসল না হলেও শিবতরাইয়ের প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করতে চান। পেটে না খেয়ে মানুষ খাজনা কী করে দেবে? তারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে রাজার নীতির বিরোধিতা করে খাজনা দেওয়া বন্ধ রেখেছে খুবই সঙ্গত কারণে। রণজিতের পিতামহরা উত্তরকূটের জন্যই শিবতরাইয়ের নন্দিসংকটের গিরিপথ বন্ধ করেছিলেন যাতে শিবতরাইয়ের পশম

ঐ পথ দিয়ে বিদেশের বাজারে বিক্রি না হয়ে যায়। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উত্তরকূটের উন্নতির জন্য রাজা এবং দেশের সাধারণ মানুষ শিবতরাইয়ের মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ করতে চায়। উত্তরকূটের সাধারণ মানুষের কথোপকথন থেকে বোঝা যায় ওরা নিজেদের বিশ্বের সেরা মানুষ ভাবে এবং শিবতরাইয়ের মানুষদের ঘৃণা করে। পাঠশালার ছাত্রদের এই ধরনের শিক্ষাই দিচ্ছেন উত্তরকূটের এক পণ্ডিত। উত্তরকূটের রাজা, জনসাধারণ এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আলাপ-আলোচনা ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী-ফ্যাসিবাদী দেশের স্বরূপ খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেকটি দেশের মানুষ নিজের দেশকে ভালোবাসবে — কিন্তু তার জন্য অন্য দেশের মানুষের ক্ষতিসাধন করবে এটা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। শিবতরাইয়ের প্রজারা যখন খাজনা দেওয়া বন্ধ করল তখন রণজিৎ বিভূতির যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ঝরনায় বাঁধ দিয়ে শিবতরাইয়ের মানুষের জল বন্ধ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পানীয় জল ও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল বন্ধ হলে তারা রাজার আদেশ পালন করতে বাধ্য হবে। শিবতরাইয়ের মানুষ ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধভাবে মহাত্মা গান্ধির উদ্ভাবিত অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে রাজার এই অন্যায়ের বিরোধিতা করেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখিয়েছেন যুবরাজ অভিজিৎ রাজার এই নীতি ও আদর্শের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমে তিনি শিবতরাইয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে প্রজাদের খাজনা আদায় করেননি, পরন্তু নন্দিসংকটের গিরিপথ খুলে দিয়েছেন। দ্বিতীয়বার নিজের প্রাণের বিনিময়ে ঝরনার বাঁধ ভেঙে দিয়ে শিবতরাইয়ের মানুষের বেঁচে থাকার বাধা দূর করে দিলেন। দেখা যায় যুবরাজ অভিজিতের এই মানবপ্রেম এবং অন্যায়ের বিরোধিতার দ্বারা রাজমন্ত্রী এবং রাজার জাতীয়তাবাদী মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন কোনো মানুষই পুরোপুরি অমানুষ হয় না, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কিছুটা মনুষ্যত্ব ও বিবেকবোধ থাকবেই। অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে অন্যায়কারীর অন্তরের আত্মা পীড়িত হবে, জেগে উঠবে বিবেকবোধ এবং তখন তিনিই নিজের অন্যায়-অপকর্মের বিরোধিতা করবেন। এভাবেই ফ্যাসিবাদী বা জাতীয়তাবাদী দেশের মানুষের অন্যায়কারী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে — কল্যাণ হবে মানবজাতির।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন ধনবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কুৎসিত ও অমঙ্গলকর দিকটিও। তিনি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন, সম্পত্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাতেও বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু এই রাষ্ট্রব্যবস্থার খারাপ দিকটিকে মেনে নিতে পারেননি। 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকে রবীন্দ্রনাথ ধনবাদী সমাজব্যবস্থার অশুভ দিকটিকে তুলে ধরে তার বিরোধিতা করেছেন। ধনবাদী সভ্যতায় যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান ধনকামী মানুষের ধন সংগ্রহের নেশা এমনভাবে তীব্র হয়ে ওঠে যে তারা মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে যন্ত্রে পরিণত হয়। তখন কলকারখানার

শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে শোষণ করতেও তাদের বাধে না। এ নাটকে দেখা যায় রাজা মকররাজ যন্ত্রশক্তির সাহায্যে হয়ে উঠেছেন যন্ত্র, স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে, তাই কারখানার শ্রমিকদের যন্ত্রের মতো কাজ করাতে চান, তারা যাতে বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে বা বস্তির দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনকে ভাগ্যের লিখন বলে ভাবে তার জন্য সেখানে মদের দোকান, দেবতার মন্দির, পুরোহিত ঠাকুর, অধ্যাপক সব কিছুর সুপরিকল্পিত পরিপাটি ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এত ঐশ্বর্যের মধ্যে রাজার মনে শান্তি নেই, অসুখী তিনি। অসুখী তাঁর কারখানায় কর্মরত পল্লিগ্রাম থেকে আসা শ্রমিকরা — ফাগুলাল, বিশু, চন্দ্রা প্রভৃতি। এরা স্বল্প বেতনে উদয়অস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এবং অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে দিনযাপন করে। অর্থাভাবে চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত এরা। মনের অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কখনো মদ্য পান করে কখনো বা মন্দিরে গিয়ে তথাকথিত ধর্মের কথা শোনে। আর যক্ষপুরীর নিয়ম মেনে কাজ করে। যক্ষপুরীর নিয়ম মেনে কাজ করেনা কেবল রঞ্জন। সে রাজা মোড়ল সর্দার কাউকে ভয় করে না। নিজের খেয়ালে মনের আনন্দে সে কাজ করে যা যক্ষপুরীর ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অনিয়ম। তাই তার ওপর ভীষণ চটা রাজা ও মোড়লরা। যেহেতু রঞ্জন প্রাণবন্ত সাহসী যুবক তাই তাকে ভালোবাসে নন্দিনী — আর রঞ্জনের ভালোবাসার টানেই সে এসে পড়েছে যক্ষপুরীতে। যক্ষপুরীর দম বন্ধ করা যান্ত্রিক পরিবেশে নন্দিনী যেন এক ঝলক মুক্ত দখিনা বাতাস যাতে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে চায় কিশোর থেকে বিশুপাগল, এমন কি স্বয়ং রাজা পর্যন্ত। সবার প্রাণে দোলা লাগায় নন্দিনী, সকলেই তাকে ভালোবাসে; সকলের প্রাণ যান্ত্রিক নিয়মের বেড়া টপকে বেরিয়ে এসে হৃদয়ের মুক্ত আকাশে দুই পাখা মেলে মনের আনন্দে উড়ে যেতে চায়। রাজা নন্দিনীর উপর রেগে যান — কারণ নন্দিনীর সঙ্গে কথা বললে তাঁর কাজের সময় নষ্ট হয়। কিন্তু নন্দিনীকে তিনি তাড়িয়েও দিতে পারেননা। এইভাবে নন্দিনীর সংস্পর্শে ও প্রভাবে রাজার যান্ত্রিক জীবনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়েছে তাঁর হৃদয়াকাশের রুদ্ধ দ্বার। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের চরম মুহূর্তে রাগে ক্ষোভে তিনি হত্যা করলেন রঞ্জনকে। রঞ্জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাজার পূর্ণ মুক্তি ঘটেছে — তিনি নন্দিনীর সঙ্গে নিজের তৈরি যক্ষপুরীর যান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করেছেন। মকররাজের যান্ত্রিক জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অশুভ দিকটিকে চিহ্নিত করে তার প্রতিবাদ করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে এবং তার পরিবর্তনের পথও দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকে অশুভ শক্তির প্রতিবাদ করেছেন কখনো শুভবোধসম্পন্ন মানুষের মাধ্যমে, কখনো অত্যাচারিত মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে, কিন্তু সেই প্রতিবাদ এমনভাবে করা হয়েছে যাতে অত্যাচারী মানুষের শুভবোধ জাগ্রত হয়েছে, হৃদয় থেকে তাদের মনের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের কল্যাণের

জন্য অশুভশক্তির এই ধরনের পরিবর্তনই কাম্য। যেখানে জোর করে শুধুমাত্র বাইরের বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, মানুষের মনের কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয় না, সেখানে পরিবর্তনের ফল সব সময় সুদূরপ্রসারী হয় না, রবীন্দ্রনাথের নাটকে বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মনের আমূল পরিবর্তনের যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা এই কারণে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রতিবাদী কণ্ঠ :

'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেবতার পুজোয় পশুবলিদান প্রথার যে প্রতিবাদ করেছেন সে বিষয়ে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি এরই নাট্যরূপ 'বিসর্জন' অবলম্বনে। তাই এখানে একই বিষয়ের পুনরায় আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসের নিখিলেশকে আমরা প্রতিবাদী চরিত্র রূপেই পাই। স্বদেশি আন্দোলনের যুগ এই উপন্যাসের পটভূমি রচনা করেছে। এই আন্দোলনের নেতারা স্বদেশি দ্রব্যের প্রচলন ও বিদেশি দ্রব্য বয়কটের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁরা বিদেশি কারখানাজাত বস্ত্র জোর করে পুড়িয়ে ফেলার কর্মসূচিও গ্রহণ করেছিলেন। এদেশের মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করাই ছিল এইসব কর্মসূচি গ্রহণের মূল লক্ষ্য। একই উদ্দেশ্যে তখন স্বদেশি নেতারা ভাটপাড়ায় ভবানীপুজোও শুরু করেছিলেন দেশমাতৃকার সঙ্গে দেবী ভবানীকে অভেদ কল্পনা করে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনকে সমর্থন করে অনেক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন, রাখীবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপন করেছিলেন এবং দেশের মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম জাগানোর জন্য এদেশে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য স্বেচ্ছায় বিদেশি দ্রব্যের বয়কট ও স্বদেশি দ্রব্যের প্রচলন নীতির সমর্থকও ছিলেন কিন্তু জোর করে এই নীতির প্রচলন ও বিদেশি বস্ত্র পোড়ানোর কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করতে পারেননি। রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিলনেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে নিখিলেশের মধ্য দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের নেতা সন্দীপের এই দুটি কর্মসূচির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। নিখিলেশের যুক্তি যে বিদেশি বস্ত্রগুলি পোড়ানো হয় সেগুলি এদেশের মানুষের অর্থের বিনিময়ে কেনা। তাই এতে ক্ষতি হয় তাদেরই। তখন এদেশের তাঁতে যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় বোনার ব্যবস্থা ছিল না, যে যৎসামান্য বস্ত্র বোনা হত তার মূল্যও ছিল বেশি। সেই বেশি মূল্য দিয়ে দেশি খদ্দর কিনে ব্যবহার করার সামর্থ্যও ছিল না এদেশের সাধারণ মানুষের। অন্যদিকে বিদেশি কারখানাজাত কাপড় অনেক সস্তায় বিক্রি হত এবং সাধারণ মানুষ সস্তায় সে কাপড় কিনতে পারত। কাজেই জোর করে বিদেশি দ্রব্য বয়কট করার আগে দেশ নেতাদের উচিত এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে মিলজাত বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করে স্বল্প মূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে সরবরাহ করা।

আমরা দেখি নিখিলেশ নিজে যতটা সম্ভব স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে স্বদেশি আন্দোলনের নেতা যিনি বিদেশি কাপড় পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি স্বয়ং বিদেশি দ্রব্যই বেশি ব্যবহার করতেন। বাস্তবত স্বদেশি আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিতেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন সত্যিই ছিলেন। এ ধরনের নেতাদের এই আচরণের প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

অন্যদিকে এদেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিলনের ফলে। নিখিলেশ ভবানীপুজোর বিরোধিতা করেছেন এই যুক্তিতে। নিখিলেশের কণ্ঠে যে প্রতিবাদ আমরা শুনি তা বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথেরই পরোক্ষভাবে যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ এবং তা দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিল কল্যাণকর।

দরিদ্র মানুষকে দয়া করে দান করার রীতিটা এদেশে খুবই প্রাচীন। পঞ্চু নিখিলেশের একজন সাধারণ প্রজা। তার জমিজমা অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসা এবং মৃত্যুর পর প্রায়শ্চিত্ত ও শ্রাদ্ধ-শান্তিতে বিক্রি হয়ে গেলে সে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায় এবং জমিদার নিখিলেশের কাছে বারবার সাহায্যের জন্য আসে। সাহায্য দিয়েও যান নিখিলেশ। ক্রমে দয়ার দান গ্রহণ করে স্বনির্ভর হওয়ার পরিবর্তে পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার দিকে এগিয়ে চলে পঞ্চু। নিখিলেশের মনে হল এটা পঞ্চু ও তার পরিবারের পক্ষে অকল্যাণকর। তাই পরে আবার যখন পঞ্চু নিখিলেশের কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে গেল তখন তিনি আর অর্থ দান করেননি, হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে টাকা ধার দিয়েছেন যাতে সে আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবিকানির্বাহ করতে পারে। এভাবে নিখিলেশ প্রচলিত দয়ার দানের রীতির প্রতিবাদ করেছেন এবং যথার্থ কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন মানুষকে। 'লোকহিত' (১৩২১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকে ব্যাপক ক্ষেত্রে স্থাপন করে আলোচনার দ্বারা বলতে চেয়েছেন শুধু অর্থ নয় দয়া করে মানুষকে কোনো রকম সাহায্যই করতে নেই। মানুষকে সাহায্য করতে হবে এমনভাবে যাতে তার আত্মমর্যাদা নষ্ট না হয়, মাথা নীচু না হয়ে যায় এবং নিজের কাজ নিজে করে নেওয়ার মতো ক্ষমতা অর্জন করে।

'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য গোঁড়ামির প্রতিবাদ করে নায়ক গোরাকে বিশ্বমানবতাবাদে উন্নীত করেছেন। তাকে মানবজাতির কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন বাস্তব জীবনে বহু অভিজ্ঞতার পথ পরিক্রমার পর। গোরা নিজেও প্রতিবাদী মানুষ। সে এদেশের মানুষের প্রতি ব্রিটিশ শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে হাজতবাস করেছে। প্রথমে ব্রাহ্ম পরিবারে বিনয়ের বিয়ের ব্যাপারটিকে মেনে নেয়নি যখন সে নিজেকে হিন্দু বলে জানত ..... পরে অবশ্য তার মতের পরিবর্তন ঘটে এবং শুধু বিনয়ের বিয়েতে সমর্থন নয়, নিজেও একই পরিবারের মেয়ে সুচরিতাকে ভালোবেসেছে। এই উপন্যাসে আর একটি প্রতিবাদী চরিত্র পাই — সে হল ললিতা। সে

শুধু প্রেমিকা নয় রীতিমতো সাহসী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না বীরাঙ্গনা — যে শুধু তার প্রেমিকের নর্মসহচরী হতে চায় না, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে চায়, বলতে চায় — "মৃত্যুর মাঝে দাঁড়ায়ে বলিব তুমি আছ আমি আছি।" বিনয়ের বন্ধু গোরা। ললিতা ভালোবাসে বিনয়কে। মায়ের সঙ্গে বিনয়সহ একটা নাট্যদলের হয়ে এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে পৌঁছে যখন সে জানতে পারল এই ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশেই গোরা জেলে গেছে তখন তার সেখানে অভিনয় করতে আত্মমর্যাদায় বাধল, তার প্রতিবাদী সত্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে মাকে জানিয়ে দিল যে তার পক্ষে এ অভিনয় করা সম্ভব নয়। ললিতার মায়ের পক্ষে নাটকের অভিনয় বাতিল করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু বিদ্রোহিনী ললিতা সে দলে অভিনয় না করে বিনয়ের সঙ্গে একা স্টিমারে করে বাড়ি ফিরে এসে ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। ললিতাকে আরও একবার বিদ্রোহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দেখে আমরা মুগ্ধ হই। বিনয় ললিতাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চায়। বিনয় হিন্দু, অন্যদিকে ললিতা ব্রাহ্ম। ললিতার মা গোঁড়া ব্রাহ্ম, তিনি দাবি করলেন যে বিনয়কে ব্রাহ্ম মতেই অনুষ্ঠান করে বিয়ে করতে হবে। এই মত না মানলে বিয়েটা হয়তো হবেই না এই আশঙ্কায় বিনয় ললিতার মায়ের কাছে নতি স্বীকার করে ব্রাহ্ম মতেই বিয়েতে রাজি হয়ে গেল। বিনয়ের এই সিদ্ধান্তে ললিতা আপত্তি তুলল। তার মনের কথাটি হল এই যে তাকে যে ভালোবেসে বিয়ে করবে সে কারও কাছে কোনো মতেই মাথা নীচু করবে না, সে সব সময় মাথা উঁচু করে থাকবে। বীরাঙ্গনা বীরপুরুষকেই কামনা করে। ললিতা মায়ের অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করে জানাল যে বিনয় হিন্দু তাই সে হিন্দু মতে অনুষ্ঠান করে তাকে বিয়ে করবে। ললিতার এই দৃঢ় প্রস্তাব তার মা মেনে নিতে বাধ্য হলেন এবং বিনয়ের মর্যাদা রক্ষা পেল। একই সঙ্গে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম যে ললিতা যথার্থই বিনয়ের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হতে পারল তার মধ্যে এ উজ্জ্বল প্রতিবাদী সত্তা থাকার কারণেই।

'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের কুমুদিনীকেও আমরা প্রতিবাদী চরিত্র বলতে পারি। পিতামাতা হারা কুমুদিনী বর্তমানে বিত্তহীন পরিবারে দাদা বিপ্রদাসের কাছে মানুষ। সে লেখাপড়া করেছে, পিয়ানো বাজানো শিখেছে। এখন বিত্তহীন হলেও একসময় তারা ছিল ধনী এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন। উত্তরাধিকার সূত্রে পুরোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও রুচিবোধ লাভ করেছে কুমুদিনী। অর্থের অভাবে এই কুমুদিনীর বিয়ে হল দালালির টাকায় হঠাৎ করে ফুলে-ফেঁপে ওঠা ধনীলোকের সন্তান স্বল্পশিক্ষিত মধুসূদনের, যে কিনা পারিবারিক সূত্রে বা উচ্চশিক্ষার সূত্রে মূল্যবোধ, রুচি ও সৌন্দর্যবোধ কোনো কিছুই লাভ করেনি। সে শুধু চেনে নারীর দেহ এবং অর্থ। স্বভাবতই বিয়ের পরদিন থেকেই উভয়ের মধ্যে শুরু হয়েছে রুচিবোধের দ্বন্দ্ব। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা ও আচরণের মধ্য দিয়ে কুমুদিনীর কাছে মধুসূদন যতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল তার প্রতি

কুমুদিনীর বিরূপতাও ততই ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। বিয়ের পরদিন কুমুদিনী যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে তখন পাশে বসে থাকা মধুসূদন একসময় হঠাৎ কুমুদিনীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে সেই হাতের আঙুল থেকে তার দাদার দেওয়া সোনার ছোট্টো আংটিটা খুলে নিয়ে নিজের জামার পকেট থেকে আট-দশটি হিরের আংটি বের করে কুমুর দুহাতের দশটি আঙুলে পরিয়ে দিয়েছে এবং ভেবেছে এতে কুমুদিনী খুব খুশি হবে; দাদার দেওয়া আংটির আর্থিক মূল্য যত কমই হোক কুমুর কাছে এর যে একটা হৃদয়গত মূল্য আছে, আর্থিক মূল্য যে তার ধারে-কাছে কখনো পৌঁছোতে পারবে না, সেটা মধুসূদন উপলব্ধি করতেই পারল না। কুমুর মনে হতে লাগল দশটি বিছে যেন দশটি আঙুলে দংশন করছে, বেদনায় ভরে গেল কুমুর মন — যদিও বাইরে তা প্রকাশ করল না। পরে কুমুদিনী এও জেনে গেল যে মধুসূদনের চরিত্রও ভালো নয়। কুমুদিনী মধুসূদনের প্রতি বিরূপ এতটাই হয়ে উঠল যে, ঘোষণাও করল এ বাড়ি ছেড়ে সে চলে যাবে। কিন্তু এর পরে জানতে পারে যে সে মা হতে চলেছে। তখন আর কোনো বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ সে করেনি, ও বাড়ির বড়ো বউ হয়েই থেকে গেছে পেটের সন্তানের কথা ভেবে। পরে কুমুদিনী বাইরে বিশেষ কোনো প্রতিবাদ না করলেও মনের দিক থেকে সে যে নিরন্তর প্রতিবাদ করেছে একথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

রবীন্দ্র-ছোটোগল্পে প্রতিবাদী কণ্ঠ :

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির অধিকাংশই রচিত জমিদারি দেখাশোনার উদ্দেশ্যে শিলাইদহে অবস্থানকালে। তখন তাঁর খুব কাছ থেকে পল্লিবাংলার মানুষের ভালোমন্দ উভয় দিক ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে এবং সেই ভালোমন্দ উভয় দিকেরই প্রতিফলন ঘটে তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে। সংসারের খারাপ দিকগুলি সাহিত্যে তুলে ধরার অর্থই হল পরোক্ষভাবে সে ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের সজাগ ও সচেতন করে তোলা। একে আমরা পরোক্ষভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবে গণ্য করব। রবীন্দ্রনাথের কিছু ছোটোগল্পে এরকম কুৎসিত চিত্র উদ্‌ঘাটিত হতে দেখব আমরা। তবে কোনো কোনো ছোটোগল্পে স্বয়ং লেখকই প্রতিবাদ করেছেন এবং কোথাও কোথাও বেশ কিছু চরিত্রও সরাসরি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে।

এদেশে পণ-প্রথা মানুষের জীবনে একটা অভিশাপ। এই প্রথার হাঁড়িকাঠে বলি হচ্ছে বহু তরতাজা প্রাণ, ছারখার হচ্ছে বহু সংসার। রবীন্দ্রনাথ মানবসমাজের এই কুৎসিত ও অশুভ বিষয়টি অবলম্বনে দুটি গল্প লিখেছেন। 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) গল্পে দেখা যায় রামসুন্দর তাঁর একমাত্র কন্যা নিরুপমাকে সুখী করার জন্য তার বিয়ে দিয়েছেন বড়োলোকের বাড়িতে। কিন্তু পণের সব টাকা বিয়ের আগে তিনি পরিশোধ করতে পারলেন না, কিছু

টাকা বাকি থেকে গেল। ভেবেছিলেন পরে আস্তে আস্তে শোধ করে দেবেন, কিন্তু বিয়েতে তাঁর বেশ কিছু টাকা ধার হয়ে গেল। বিয়ের পর পণের বাকি টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করা পর্যন্ত নিরুপমার বাপের বাড়ি যাওয়া বা বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে তার দেখা করা বন্ধ করে দিলেন নিরুপমার শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা। রামসদয় পাওনাদারদের টাকাই শোধ করতে পারছেন না, পণের বাকি টাকা পরিশোধ করবেন কী করে! এদিকে সংসারেও টানাটানি পড়েছে। নিরুপমাকে ঘরে আনতে তিনি বার বার তার শ্বশুরবাড়িতে যান, কিন্তু নিরুপমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো দূরের কথা বাপের সঙ্গে দেখা করতেও দেওয়া হয় না। রামসুন্দর বার বার অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। ওদিকে নিরুপমার ভাগ্যেও জুটতে লাগলো লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান-অবহেলা। অবশেষে দুঃখে অপমানে নিরুপায় রামসুন্দর পণের টাকা পরিশোধ করার জন্য নিজের বাসগৃহটি বিক্রি করে টাকা নিয়ে নিরুপমাকে আনতে গেলেন। শ্বশুর বাড়ির ব্যবহারে অপমানিত নিরুপমা তার বাবাকে টাকা দিতে না দিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিল। পণপ্রথার ফলভোগী নিরুপমার এটা একটা সবল প্রতিবাদ। এরপর নিরুপমা বড়োলোক শ্বশুরবাড়ির লোকের অত্যাচার ও অবহেলায় মারা গেছে। কিছুদিন পর পাত্রপক্ষ আবার ছেলের বিয়ে ঠিক করেছে। এবার রবীন্দ্রনাথ পণ আদায়কারী পাত্রপক্ষকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন -- "এবারে বিশহাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।" দেখা গেল বিয়ের পর নিরুপমা পণপ্রথার কুফল সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হয় এবং তার আত্মমর্যাদা জেগে ওঠে। তাই নিজের জীবনের করুণ পরিণতির কথা জেনেও এই প্রথার তীব্র বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করেছে।

এর বাইশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'অপরিচিতা' (১৯১৪)। এই গল্পে দেখা যায় বিয়ে বাড়িতে পৌঁছে সাতপাকের আগে পাত্রের মামা পাত্রীর বাবাকে অনুরোধ করেছেন বিয়েতে মেয়েকে পণস্বরূপ যে পরিমাণ সোনার গয়না দেওয়ার কথা হয়েছিল তা ঠিক আছে কিনা সেটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। এতে অপমানিত বোধ করেন শম্ভুনাথ ও তাঁর কন্যা কল্যাণী। বরযাত্রীদের খাওয়ানোর পর পাত্র ও তার মামাকে তারা জানিয়ে দেন যে এরকম যাদের মানসিকতা তাদের সঙ্গে তারা আত্মীয়তা করবেন না। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন পণপ্রথা উচ্ছেদ করতে হলে মেয়ে এবং মেয়ের বাবাকে এইভাবে তারা বিরোধিতা করতে হবে। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন।

হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহের প্রচলন ছিল না। সাগর পেরিয়ে কেউ বিদেশে গেলেও হিন্দু সমাজপতিরা তাকে সমাজে স্থান দিতেন না এবং নানাভাবে হেনস্থা করতেন। হিন্দুসমাজের দীর্ঘকালের এইসব কুপ্রথা ও অন্ধ বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'ত্যাগ' (১৮৯২), 'মহামায়া' (১২৯৯), 'নামঞ্জুর' (১৩৩২), 'সংস্কার'

(১৩৩৫) প্রভৃতি ছোটোগল্পে যেহেতু হিন্দুসমাজের মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে এগুলো ছিল অশুভ ও অকল্যাণকর। 'ত্যাগ' গল্পে দেখা যায় বিলাত যাওয়ার জন্য ব্যারিস্টার জামাইকে পরিত্যাগ করার জন্য প্যারীশঙ্করকে নির্দেশ দিলেন সমাজপতি ব্রাহ্মণ হরিহর। এ নির্দেশ অমান্য করলে হরিহর প্যারীশঙ্করকে শুধু সমাজচ্যুতই করেননি তার ছেলেমেয়ের বিয়েতে নানাভাবে বাধা দিয়ে অত্যাচারও করেছেন। প্যারীশঙ্কর বাধ্য হয়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন। বেশ কিছুকাল পরে হরিহরের পুত্র হেমন্ত কলকাতায় পড়াশুনা করতে এসে প্যারীশঙ্করের প্রতিবেশী বিপ্রদাস চ্যাটার্জির আশ্রিতা বিধবা কায়স্থকন্যা কুসুমের প্রতি আকৃষ্ট হলে প্যারীশঙ্কর কুসুমের পরিচয় গোপন রেখে তাদের বিয়ে দিয়েছেন। পরে যখন কুসুমের পরিচয় জানা গেল তখন হরিহর ছেলেকে নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীকে ত্যাগ করতে। হেমন্ত কুসুমকে ত্যাগতো করেইনি পরন্তু সে স্পষ্টভাবে তার বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে যে সে জাত মানে না। এখানে হেমন্ত, কুসুম, প্যারীশঙ্কর ও বিপ্রদাস হিন্দুসমাজের জাতি ও বর্ণভেদপ্রথা, বিধবা নারীদের বিয়ে না দেওয়া, সাগর পেরিয়ে বিদেশে না যাওয়া প্রভৃতি কুসংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

'মহামায়া' (১২৯৯) গল্পে রবীন্দ্রনাথ কৌলিন্য প্রথা, একই মেলের মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে কুলীন মেয়ের বিয়ে দেওয়া, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর জোর করে সহমরণে পাঠানো প্রভৃতির বিভৎসতার তীব্র প্রতিবাদ করে এই প্রথাগুলিকে ভেঙে দিয়েছেন। এখানে কুলীনদের প্রথা অনুসারে মহামায়ার বিয়ে হয়েছে এক বৃদ্ধের সঙ্গে। বিয়ের কিছুক্ষণ পরে বিধবা মহামায়াকে স্বামীর চিতায় সহমরণে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মহামায়া বেঁচে গেছে। বিয়ের আগে যে রাজীবের সঙ্গে কুলীন নয় বলে মহামায়ার বিয়ে দেয়নি তার পরিবার সেই রাজীবই এগিয়ে এসে মহামায়াকে বিয়ে করেছে। এখানে রাজীব ও মহামায়া অমানবিক কুলীন প্রথার প্রতিবাদ করেছে।

'নামঞ্জুর' গল্পে ভালোবাসা সত্ত্বেও বর্ণভেদের কারণে অনিল অমিয়াকে বিয়ে করেনি। 'সংস্কার' গল্পে খদ্দরধারিণী নেত্রী একজন অসুস্থ ঝাড়ুদারকে শুধু মেথর বলে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে ট্যাক্সিতে স্থান দেয়নি। 'মুসলমানীর গল্প' শীর্ষক ছোটোগল্পে ব্রাহ্মণকন্যা কমলা বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে ডাকাতদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অসহায় অবস্থায় হাবিব খাঁ নামে একজন সাহসী ও সৎ মুসলমানের আশ্রয় পায় এবং তার বাড়িতে রাত্রি কাটিয়ে পরের দিন সকালে বাড়ি ফিরে গেলে হিন্দুসমাজে কমলার আর স্থান হয়নি। এই সব গল্পে হিন্দুসমাজের সংকীর্ণ জাতি ও বর্ণভেদ প্রথার অশুভ দিকগুলো তুলে ধরে প্রকারান্তরে তার প্রতিবাদই করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

মানুষ বিপদে পড়লে ডাক্তার কীভাবে তার কাছ থেকে অমানুষের মতো অন্যায়ভাবে অর্থ অপহরণ করে তার চিত্র রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে। এই গল্পের আর

একটি ঘটনায় দেখা যায় এক গরিব চাষি সাপের কামড়ে মরে যাওয়া শিশুকন্যাকে নিয়ে থানায় এসেছে রিপোর্ট করতে। সে সারাদিন থানায় বসে আছে কিন্তু তার ঘুষ দেওয়ার মতো অর্থ নেই বলে পুলিশ রিপোর্ট নিচ্ছে না। এখানে গ্রামের মানুষের উপর ডাক্তার ও পুলিশের অত্যাচারের পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩১০) গল্পের নায়ক শশিভূষণ একজন বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চরিত্র। এই গল্পের দুটি ঘটনায় গল্পকার এদেশের জেলে ও নৌকার মাঝিদের উপর ইংরেজদের অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন। প্রথম ঘটনায় দেখা যায় একজন ইংরেজ নদীতে স্টিমারে করে যাচ্ছে। সে দেখল এ দেশের একটি পালতোলা মালবোঝাই নৌকা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। হঠাৎ কৌতূহলের বশে সে ওই নৌকাটির পালে গুলি করলে নৌকাটি জলমগ্ন হল। শশিভূষণ এ ঘটনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। তিনি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আদালতে মাঝিদের পক্ষ নিয়ে সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। পরে আবার ইংরেজদের দ্বারা অত্যাচারিত হবার আশঙ্কায় মাঝিরা কেউ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল না। ফলে অত্যাচারী সাহেবের কোনো শাস্তি হল না। দ্বিতীয় ঘটনায় দেখা যায় জেলার পুলিশ সুপার নদীপথে যাচ্ছেন। জেলেরা মাছ ধরার জন্য স্টিমার চলাচলের মতো জায়গা ছেড়ে নদীতে জাল পেতেছে। সাহেবের নৌকা নদীর মাঝ বরাবর আসছে দেখে জেলেরা চিৎকার করে সাহেবের নৌকার মাঝিদের সাবধানও করে দিল। জেলেদের কথায় কর্ণপাত না করার জন্য সাহেবের নৌকা যখন জালে জড়িয়ে গেল তখন সাহেবের নৌকার মাঝিরা তাঁর নির্দেশে জেলেদের অনেক টাকা দামের জালতো কেটে দিলই উপরন্তু পুলিশরা ছুটল সেই জেলেদের ধরতে। জেলেরা ভয়ে পালিয়ে গেলে পুলিশেরা কতগুলো সাধারণ মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল সাহেবের কাছে। শশিভূষণ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে সাহেবের সঙ্গে তাঁর মারামারি হয়ে গেল। শশিভূষণ এবারও আদালতের আশ্রয় নিলেন। কিন্তু স্থানীয় জমিদারের নায়েব হরকুমারের ভয়ে জেলেরা সাহেবের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে শশিভূষণের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হল। পরের উপকার করতে গেলে অনেক সময় নিজের ক্ষতি হয়। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের সৎ ও সাহসী মানুষ তাঁরা নিজের ক্ষতি হলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, পরের উপকারও করবে। তাঁরা 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমারের মতো বলবেন, "তুমি অধম হইতে পার, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" শশিভূষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই বার্তাই দিয়েছেন।

"শাস্তি" (১৩০০) গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেছেন কম মজুরিতে অন্যায়ভাবে জমিদারদের গরিব মানুষের দিয়ে কাজ করানোর। দুখিরাম ও ছিদামকে কীভাবে জমিদার-বাড়িতে কাজ করতে হয়েছে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতেও

হইয়াছে — উচিত মতো পাওনা মজুরি পায় নাই এবং তাহার পরিবর্তে যে সকল অন্যায় কটূ কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।"

স্বল্প মজুরিতে ও প্রায় অর্ধাহারে বৃষ্টিতে ভিজে এবং কটূক্তি শুনে সারাদিন জমিদার বাড়িতে কাজ করা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই অবস্থায় বাড়ি ফিরে যখন দুখিরাম খেতে চেয়ে তা পেল না পরন্তু কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শুনলে তখনই রাগে ক্ষোভে জ্ঞানশূন্য হয়ে স্ত্রীকে দা দিয়ে কোপ মেরে বসল। দুখির এই ভুলের জন্য জমিদারের উৎপীড়ন অনেকাংশে দায়ী। ছিদাম দাদাকে বাঁচানোর জন্য প্রচার করল ঝগড়া করে ছোটোবউ বড়ো বউয়ের মাথায় দায়ের কোপ বসিয়েছে। শুধু তাই নয় সে রামলোচনকে বলেছে যে, বউ চলে গেলে বউ পাওয়া যাবে কিন্তু ভাই গেলে আর ভাই পাওয়া যাবে না। মুখে একথা বললেও ছিদাম স্ত্রীকে ভালোবাসতো। সে ভেবেছিল ভালো উকিল নিয়ে আদালত থেকে চন্দরাকে নির্দোষ প্রমাণ করে নিয়ে আসবে এবং বাস্তবে সেরকম ব্যবস্থা করে চন্দরাকে শিখিয়েও দিয়েছিল আদালতে তাকে কী বলতে হবে। চন্দরা স্বামীর এই কথা শুনে স্তম্ভিত হয় এবং দুঃখে ক্ষোভে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। হওয়ারই কথা। একজনের খুনের দায় আর একজনকে শিরোধার্য করতে অনুরোধ করা যে কত বড়ো অন্যায় তা আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। চন্দরারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এই অনুরোধটা করেছে চন্দরার স্বামী যাকে সে সব থেকে বেশি ভালোবাসে — এটাই তাকে সবচেয়ে বেশি করে আঘাত করল। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বন্ধনটা কতটা অন্তঃসারশূন্য সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। তার মনে হল বেঁচে থেকে এমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। তাই আদালতে সে তার জাকে দা দিয়ে কোপ মারার ঘনটাটি এমনভাবে বিবৃত করল যাতে অনিবার্য হয়ে ওঠে তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং তার স্বামী কোনোমতেই বাঁচাতে না পারে তাকে। ফাঁসির আগে সিভিল সার্জেন চন্দরাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কাকে দেখতে চায়, তখন সে তার মায়ের কথা বলে। তার স্বামী দেখা করতে চাইলে তার কণ্ঠ থেকে একটি শব্দ উচ্চারিত হল — মরণ। চন্দরার এই আচরণকে তার স্বামীর অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ বলা যায়।

'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১) গল্পের মৃণাল রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশিষ্ট প্রতিবাদী নারী। মৃণাল সুন্দরী, কবি, ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও প্রখর বুদ্ধিমতী নারী। প্রথম গুণটির মর্যাদা না ছিল স্বামীর কাছে না ছিল সেই পরিবারের আর কারো কাছে। দ্বিতীয় গুণটি ছিল সকলের অজানা। বাকি গুণ দুটি পরিবারের লোকদের কাছে ছিল অনাসৃষ্টি ও বিড়ম্বনা স্বরূপ। এছাড়া তার ছিল একটি কোমল হৃদয়। শ্বশুরবাড়িতে গোরুগুলোর প্রতি নিষ্ঠুর উপেক্ষা তাঁর হৃদয়ে বেজে ছিল এবং নিজেই তাদের যত্ন করতে এগিয়ে এসেছিলেন। পরিবর্তে জুটেছিল অসম্মান। বাড়ির আঁতুরঘরটি ছিল অস্বাস্থ্যকর, সম্ভবত সে কারণেই তাঁর সন্তানটি মারা

যায়। ডাক্তারের পরামর্শেও বাড়ির লোকের চেতনা না জাগায় ব্যথিত হন তিনি। তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে কতটা হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর, বাড়ির বউদের তারা কত হীন দৃষ্টিতে দেখে তা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যখন বড়ো জায়ের পিতৃমাতৃহারা অসহায় বোন খুড়তুতো ভায়েদের অত্যাচারে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয় এবং দিদির শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নেয় কোনো মতে বেঁচে থাকার জন্য। সারাদিন ঝিয়ের মতো খাটিয়েও দুটো ভাত দিতে তারা নারাজ। বড়ো জা বোনের দুঃখে অন্তরে ব্যথিত হলেও ভয়ে বাইরে তা প্রকাশ করেন না, বরং ভাবে-ভঙ্গিতে দেখান বাড়ির লোকের মনোভাবকে যেন সমর্থন করছেন। মৃণাল যখন বিন্দুকে আশ্রয় দিয়েছেন তখন যে বিন্দু ভেতরে ভেতরে খুশি হয়েছেন তা বুঝতে মৃণালের অসুবিধা হয়নি। বাড়ির লোকেরা জোর করে এক পাগলের সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে দিয়ে বিদায় করেছে বাড়ি থেকে। শেষে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে এই জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে বিন্দু। মৃণালকে বিদ্রোহিনী করে তুলেছে বিন্দুর এই হৃদয়-বিদারক জীবন-পরিণতি এবং তার প্রতি মৃণালের স্বামী ও পরিবারের সকলের অমানবিক নিষ্ঠুর ব্যবহার। পরিবারের সকলের বিরাগভাজন হচ্ছেন জেনেও শুধু অকৃত্রিম মানবিকতার দায়ে সহৃদয় সহানুভূতি নিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে সক্রিয়ভাবে নানারকম সাহায্য করে গেছেন মৃণাল। কিন্তু এরপরেও যখন তিনি বিন্দুকে বাঁচাতে ব্যর্থ হলেন তখন তাঁর অন্তর অনন্ত যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হল। তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল পুরুষ শাসিত হিন্দুসমাজে বিশেষ করে শ্বশুরবাড়িতে নারীর স্থান কোথায়? লক্ষণীয় যে শ্বশুরবাড়িতে নিজের ব্যক্তিগত খাওয়া-পরা বা স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না মৃণালের। কিন্তু মানুষ শুধু প্রাণে বাঁচে না, মনেও বাঁচে। মৃণালের শ্বশুরবাড়িতে বউদের আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার ছিল না। বড়ো জা যেভাবে ও বাড়িতে কোনো মতে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না মৃণালের সে জীবন মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তিনি এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করে মেজো বউয়ের খোলস পরিত্যাগ করে চিরকালের মতো শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে শ্রীক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মমর্যাদার সঙ্গে স্বাধীন একজন নারী হিসেবে শুধু মৃণাল হয়ে বেঁচে থাকার পথ বেছে নিয়েছেন। মৃণাল এই সিদ্ধান্তের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্টভাষায় যুক্তিসম্মতভাবে পত্র লিখে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বামীকে। মৃণালের এই প্রতিবাদ আধুনিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না নারীর প্রতিবাদ হিসেবে বাঙ্‌ময়।

'ল্যাবরেটরি' (১৩৪৭) গল্পের সোহিনী ও নীলা হিন্দু সমাজের সংস্কার মেনে চলেনি। তাই এদেরও আমরা প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবেই গ্রহণ করব।

কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের মতো রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের অনেক চরিত্র বিভিন্ন ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ

করেছেন বিভিন্ন অন্যায়ের চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরে। শিল্পের ধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে এইভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদের মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের মানব-কল্যাণ কামনা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করলেও যখন এই আন্দোলনের সঙ্গে ভবানীপূজা, জোর করে বিদেশি দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশি দ্রব্য প্রচলন এবং বিদেশি বস্ত্র পোড়ানোর কর্মসূচি যুক্ত হয় তখন তিনি এই আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এগুলো এদেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধী পরিত্যাগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তাঁর দেশজুড়ে মানুষকে দিয়ে চরকায় সুতো কাটানো কর্মকাণ্ডকে সমর্থন জানাননি। স্বদেশি-আন্দোলন বা স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করলেও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে তিনি যে সমর্থন করেননি সেটা লক্ষ করা যায় 'মুক্তধারা' নাটক এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে। আমরা দেখাতে চেষ্টা করলাম যে রবীন্দ্রনাথ শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করার উপদেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করেননি, ব্যক্তিগত জীবনেও যাকে অন্যায় বলে মনে করেছেন তার প্রতিবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে অন্যায় বলে মনে করেছেন সে বিষয়ে তাঁর সমকালে যে সকলে একমত ছিলেন এমনও নয়, পরবর্তীকালে যে সবাই ঐক্যমত্য হবেন এমন আশাও করা যায় না — তবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আমরা দেখলাম সুন্দর ও মঙ্গালের পাশাপাশি অসুন্দর, অমঙ্গাল ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ এই জগৎ-সংসারে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার চিত্র সাহিত্যে তুলেও ধরেছেন। যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানে তার প্রতিবাদ করেছেন শিল্পের ধর্ম যথাযথ রেখে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসুন্দর ও অমঙ্গালের চিত্র সাহিত্যে এমনভাবে তুলে ধরেননি যাতে হতাশার চোরাবালি পাঠককে গ্রাস করে।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বাংলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক ড. অসীমকুমার মণ্ডল বর্তমানে জঙ্গিপুর কলেজে কর্মরত।

উপনিষদের কয়েকটি বাণী ও রবীন্দ্রনাথ

ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞান, কর্ম, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাত্মবোধ প্রভৃতি মানবজাতির বহু বিচিত্র মানবিক বৃত্তির প্রতিটিই উপনিষদের পাতা থেকে খুঁজে পাবে তাদের চরিতার্থতার রসদ। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মূল্যায়ন সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করেছিলেন। যার ফলে রবীন্দ্র চেতনার মূল ধারাটি উপনিষদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল একেবারে মায়ের সাথে নাড়ীর যোগের মত করে। উপনিষদের মন্ত্ররাজি বারবার অধ্যয়ন তাঁর মনে উপনিষদের একটি অখণ্ড স্বরূপ গড়ে তুলেছিল, যার প্রভাব তাঁর ভেতরে ক্রিয়াশীল থেকেছে আমৃত্যু। একটি প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন - "The writer has been brought up in a family where texts of the Upanishads are used in daily worship; and he has had before him the example of his father, who lived his long life in the closest communication with God, while not neglecting his duties to the world, or allowing his keen interest in all human affairs to suffer any abatement." [Sadhana / Author's Preface, P vii]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবনে প্রধান দশটি উপনিষদ থেকেই পেয়েছেন প্রেম-ভক্তি-জ্ঞান-কর্মের সহস্রবিধ প্রেরণা। তাঁর অজস্র প্রবন্ধ ও বিবিধ ভাষণে রয়েছে তাঁর উপনিষদ অনুধ্যানের বহুবিধ প্রমাণ। বিশেষত উপনিষদের কয়েকটি ঋষিবাণীকে তিনি করে তুলেছিলেন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। ধ্রুবপদের মতো সেইসব বাণীর নিহিত জ্ঞানকে তিনি বারবার স্মরণ করেছেন তাঁর জীবনচর্যায়। আমরা এখানে এমনি কয়েকটি মন্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে তার প্রভাব আলোচনা করব।

ক. গায়ত্রী মন্ত্র :

বিধিমতো ভাবে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয় অত্যন্ত অল্প বয়সে। সেই সময়ে তাঁকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হত। সেই বয়সে গায়ত্রী মন্ত্র তাঁর কাছে কী রূপে প্রতিভাত হত সে কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'-তে, —

> "নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূ র্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব

করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। ..... গায়ত্রী মন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে। কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে। — আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেজের এককোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। ...... আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।"

তারপর থেকে যত বয়স বেড়েছে রবীন্দ্রনাথের কাছে গায়ত্রীমন্ত্র ততই ধরা দিয়েছে নতুন নতুন তাৎপর্যে, জড় আর চৈতন্য, বস্তুগত আর অধ্যাত্মজগতের যে অন্তর্নিহিত আত্মীয়তা এই মন্ত্রের প্রতি অক্ষরে স্ফূর্ত তার অর্থ সম্যক বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় লিখেছেন —

"আমাদের ধ্যানের মন্ত্র এক সীমায় রয়েছে ভূ র্ভুবঃ স্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী, আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃস্বঃকেও সৃষ্টি করছেন, আর একদিকে আমাদের ধী-শক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্যেই তিনি ওঁ।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও এই গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাব ছিল গভীর, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - "যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে গায়ত্রী মন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করেছে ...."

খ. "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম - "

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠ করলে জানতে পারা যায়, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম' এই বাণী তাঁর জীবনে কি গভীর প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। ঈশ্বরের শাশ্বত সত্তার প্রভা থেকে জগতের তুচ্ছতম বস্তুও যে পরিত্যক্ত নয় এই ঋষিবাণীতে সেই সত্যই বিধৃত। রবীন্দ্রনাথ এই বাণীর অন্তর্নিহিত সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন আপন হৃদয়ের গভীরতম লোকে। এ মন্ত্রের নিরন্তর ধ্যান তাঁর জীবনকে যে নিয়ন্ত্রিত করেছে সে কথা তিনি নিজেই জানিয়ে গিয়েছেন, —

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্।।

যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্র তারা নিয়মিত এবং আকাশের অনন্ত আরতি দীপের কোনোদিন নির্বাণ নাই, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন ইহা উপলব্ধি করো। সব স্পন্দিত তাঁহার ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো, তিনি ত্যাগ করছেন

তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে -- পিতামাতার গভীর স্নেহে -- মাধুর্যধারার অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত; ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায় কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে, প্রেমে আনন্দে -- ভোগ করো, পরিপূর্ণরূপে ভোগ করো। মা গৃধঃ। মনের ভিতরে কোনো কলুষ, কোনো লোভ না আসুক। পাপের লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক। এই তাঁর দীক্ষার মন্ত্র।"
['শান্তিনিকেতন', ২য় খণ্ড, পৃঃ-৪১৬]

রবীন্দ্রনাথের জীবনচর্যা কোন মন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হত এ ব্যাখ্যা কি তারই আভাস দিচ্ছে না।

গ. কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ

রবীন্দ্রনাথ তো সেই মানুষ যিনি একার প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীনিকেতনের মতো কর্মশালা। তিনি যত বড়ো সাহিত্যিক ঠিত তত বড়োই কর্মী মানুষ ছিলেন। কর্মযোগের পথেই জীবনের পরিপূর্ণতা আসা সম্ভব এটাই তিনি মনে করতেন। উপরোক্ত মন্ত্রে তিনি সেই বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। মন্ত্রটির তাৎপর্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখছেন, --

"উপনিষদ বলেছেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমান ভাবে বলেন না, জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলাবার পূর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন 'আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছিনে।' তাঁরা সংসারের মধ্যে, কর্মের মধ্যে, আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছে করেন। দুঃখতাপ তাঁদের আসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখদুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখেন এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান।"

ঘ. প্রাণস্তুতি

"প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা। নমস্তে অস্তু আয়তে। নমো অস্তু পরায়তে। প্রাণে হ ভূতং

ভব্যং চ। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়। নমস্তে স্তনয়িত্নবে। নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে। নমস্তে প্রাণ বর্ষতে।।''

এ হল প্রাণের বন্দনা, জীবনের স্তুতি। অনন্ত অখণ্ড বিচিত্র প্রাণৈষণার যে ধারা জগৎ জুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান এ মন্ত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তারই আহ্বান শুনতে পেয়েছেন। প্রাণের এই মহোৎসবে অভিভূত হয়ে লিখলেন -

> ''প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময় - কোথাও তার রন্ধ্র, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বাস করেছেন, তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন।''

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তো এই উত্তরাধিকার বহন করেছেন। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ প্রবাহকে নন্দিত করেছেন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিটি পর্বে।

ঙ. 'যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।'

মৈত্রেয়ী বৃহদারণ্যক উপনিষদে যজ্ঞবল্ক্য ঋষির পত্নী মৈত্রেয়ী প্রার্থনা করেছিলেন - যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না, তার দ্বারা আমার কী প্রয়োজন। আমি তা নিয়ে কী করব? এই প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও সঞ্চার করেছিল এক অনন্য অনুভূতি। তিনি লিখেছেন -

> ''মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোনখানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে। মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। ...... এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা অধিকার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম।
>
> মৈত্রেয়ীর এই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কখনও শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানব হৃদয়ের এই একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুল কণ্ঠে চিরন্তন কালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।''

বিশ্বপ্রেমী মানবপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠা মন মৈত্রেয়ীর এই প্রার্থনার সাথে কোথায় যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

চ. 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।'

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে জেনেছিলেন আনন্দ স্বরূপ বলে। আর তাই তো সারাজীবন বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ রসসমুদ্রে নিজেকে নিমজ্জিত রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র

সাহিত্যসৃষ্টির উৎসই তো ঐ আনন্দরসবোধ। মহাকবির জীবনের মন্ত্রই তো ছিল — 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর', 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'। উপনিষদের ঋষিকবিগণ ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপকেই বন্দনা করেই বলেছেন — ''রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।'' কবি, কর্মী, জ্ঞানী, শিল্পী, ভক্ত প্রত্যেকেই এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দকণাকে তাদের জ্ঞান, কর্ম, প্রেম, ভক্তির মধ্যে দিয়ে অনুধ্যান করে চলেছে - এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি'। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আমাদের কোনো কর্মকেই বন্ধন স্বরূপ ভাবা উচিত নয়। কারণ কর্মের মধ্যে দিয়েই অনুভব করতে পারি ব্রহ্মের আনন্দাংশকে, —

"And joy is everywhere; it is in the earth's green covering of grass; in the blue serenity of the slay; in the rockless exuberance of spring; in the severe abstinence of grey winter; in the living flesh that animates our bodily frame; in the perfect poise of the human figure, noble and upright; in living; in the exercise of all our powers; in the acquisition of knowledge; in fighting evils; in dying for gains we never can share." (Sadhana, P-116)

তাই তো লিখতে পেরেছিলেন -

'ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে 'ভালোবাসিয়াছি।'
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছড়ায়ে তোমার অধিকার।' (জন্মদিন / সেঁজুতি)

এই জীবনদর্শনের সাথে উপনিষদের ঋষিগণের ওই আনন্দস্তবের কী মিল, যেখানে তাঁরা বলছেন — ''কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।''

ছ. চরৈবেতি চরৈবেতি

উপনিষদের এই বিখ্যাত মন্ত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করেছেন সেটি অনুধাবন করব। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৩শ অধ্যায় / ৩য় খণ্ড) আছে —

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্‌বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ যথা।। চরৈবেতি।।
পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষতুরাত্মা ফলে গ্রহিঃ।
শেরেহস্য সর্বে পাপমানঃ শ্রমেণ পপ্রথে হতশ্চরৈবেতি।।
আস্তে ভগ আসীন স্যোর্ধ্বতিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি।

কলির শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠং স্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরংশ্চরৈবেতি।।
চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদুমুদম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য ত্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি।।

এ হল নিরন্তর চলার গান। সমস্ত জড়তা ঘুচিয়ে দিয়ে জায়মান চৈতন্যের গতির মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথও গেয়েছেন - 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।' সারাজীবন ধরেই তো তিনি অগ্রগতির সাধনা, চলার সাধনা করে গিয়েছেন। তাঁর ব্রহ্মাণ্ড তাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ত বিবর্তমান। সমাজজীবনেও রবীন্দ্রনাথ যেখানে যখনই দেখেছেন কুসংস্কারের জড়তা, তুচ্ছ অর্থহীন আচারের অচলায়তন, মনুষ্যত্বের অপমান গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে মানুষের সভ্যতাকে তখনই তিনি এ সব কিছুর ওপর নির্মম আঘাত হেনে এগিয়ে যাওয়ার আবাহন শুনিয়েছেন। তিনি জানতেন — অগ্রগতিই জীবন, থেমে যাওয়াই মরণ। কোথায় যাব বড়ো কথা নয়, যাব — যাওয়া-চলা এটাই বড়ো কথা। তিনি লিখলেন —

"গৃহী কহে, 'নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ভয় লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।' রথী কহে, 'যেতে হবে আগে।'
'কোনখানে' শুধাইল। রথী কহে, " কোনোখানে নহে,
শুধু আগে।"

এই 'রথী'ই তো কুরুক্ষেত্রে হতোদ্যম অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন চিরন্তন জাগার মন্ত্র, চলার মন্ত্র - গীতার বাণী। আমরা কি বুঝতে পারছি না আজো তিনি তাঁর বাঁশির সুরে সুরে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মন্ত্র শোনাচ্ছেন। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি কি আমরা? উপনিষদ আজো মানুষ হওয়ার কথা বলছে। কিন্তু মানুষ আমরা হচ্ছি কই? জড়ত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি।

জ. 'যো দেবোৎ গ্নৌ যোৎপ্সু
যো বিশ্ব ভুবনসাবিবেশ।
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।।'

উপনিষদের এই মন্ত্রে রয়েছে পরম চৈতন্যের বিশ্বময় উপস্থিতির বাণীরূপ। আমরা তো জানি রবীন্দ্রচৈতন্য জুড়েও ছিল বিশ্বব্যাপী প্রাণপ্রবাহকে প্রতিটি স্পন্দনে অনুভব করার আর্তি, স্বাভাবিকভাবেই উপরোক্ত মন্ত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত বেশি। 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় 'বিশ্বব্যাপী' শীর্ষক ভাষণে তিনি উপরোক্ত মন্ত্র সম্বন্ধে বললেন, "বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন, একথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি। একথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তারপরে যে ঋষি বলেছেন

'তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন' সে ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি মননের দ্বারা পাননি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতাব মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন - তিনি যে নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান - তিনি যে ফল ভক্ষণ করেছিলেন তাদের স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল — তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর গম্ভীর, কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় — সেকথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না। কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন, এই বনস্পতিতে আছেন?''

বলাবাহুল্য তিনি পেরেছেন, তিনিই পেরেছেন। তাঁর এই প্রার্থনা অপরিপূর্ণ থাকেনি। বিশ্বের হৃদয়ছন্দে দোলাতে পেরেছেন নিজের হৃদয়কে। আপন অনুভূতির প্রতিটি কণায় ধরতে পেরেছেন পরম চৈতন্যের বিশ্বব্যাপী উপস্থিতিকে। তাইতো লিখে গেছেন —

> 'আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই একথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন সমস্ত জড় জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে - আমার প্রাণের মধ্যে বহুযুগের তরুলতা আজ ভাষা পাইয়াছে — ...... আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহ মন পুলকিত হইয়া ওঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি। অতএব ইহাকে গোপন করিবেন না। ইহাকে লইয়া আমি লেশমাত্র লজ্জাবোধ করি না। আমি মানুষ, এইজন্যই আমি ধূলামাটি জল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই — ইহাই আমার গৌরব — আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দিব্যমান হইয়া উঠিয়াছে — আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ....' (ছিন্নপত্র)

উপনিষদের যে বাণী তার মূলেই রয়েছে বিশ্ববোধ, ঘাসশীর্ষ থেকে মহীরূহ শিখর পর্যন্ত সর্বত্রই মহান স্রষ্টার উপস্থিতিকে ঘোষণা করেছে উপনিষদ। এই ঔপনিষদিক বোধের জগতেই পরিপুষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চেতনা। তাই তো তাঁর মধ্যে পেলাম বিশ্বমানবতাবাদের এমন উজ্জ্বল উদ্বোধন। এই উদ্বোধনেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে উপনিষদের মন্ত্ররাজির তাৎপর্য। উপনিষদকে রবীন্দ্রনাথ কেবল বাহ্যজীবনাচরণে গ্রহণ করেননি, এমন কি শুধু মননের উপকরণ হিসেবেও রাখেননি, তার ভাবধারাকে মিশিয়ে নিয়েছিলেন নিজের অস্থি-মজ্জার সঙ্গে। তাঁর জীবনসাধনার প্রতিটি স্তরে এক অক্ষয় প্রেরণার উৎসরূপে সতত বিরাজমান থাকল উপনিষদ।

বাংলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপিকা ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর গার্লস কলেজে কর্মরতা।

রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' পাঠের ভূমিকা

নুরুল মোর্তজা

রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্মের ধারণা জন্মসূত্রে পাওয়া কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চার ফল নয়, বিশ্বের তাবৎ সাধকের কর্মসাধনার উত্তরাধিকার লব্ধ জ্ঞান; যা রবীন্দ্রপ্রতিভার সুবিশাল ভাণ্ডারে মিশে সার্বজনীন মানবধর্মে উন্নীত হয়েছে। রবীন্দ্র মননে এই বোধের উদ্বোধন কোনো একদিন অকস্মাৎ উদিত হয়নি; জ্ঞানান্বেষণের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পরিবর্তনশীল বিমূর্ত অবয়ব জীবনের উপান্তে এসে কতকটা স্পষ্টতা পেয়েছে। তাঁর বিপুল রচনা সম্ভারের অন্যতম অন্বেষণ মানবের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যসূত্র আবিষ্কার। তিনি মানববিশ্বের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য উপলব্ধি করে তুরীয় আনন্দ তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন এবং যে আনন্দ বা সত্যজ্ঞান তাঁর রচিত সাহিত্য-চিত্র-সংগীতের মাধ্যমে পাঠক-শ্রোতার চিত্তে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছেন। যে ঐক্য মানুষকে ক্ষুদ্রতা থেকে নীচতা থেকে জীবসত্তা থেকে পরমাত্মার অমৃতলোকের অংশীদার হিসাবে আত্ম-আবিষ্কারে মহীয়ান করেছে। সাহিত্য চিত্র সংগীত বাহিত এই সারকথাকে তিনি কোনো সময় আড়াল করেননি। করেননি বলে এক শ্রেণির সমালোচক তাঁর রচিত সাহিত্যকে বলেছেন বিশেষ বিশেষ আইডিয়ার বাহন। প্রকরণগত কারণে কবিতা-গান-নাটকে যেটুকু আড়াল আছে, প্রবন্ধ-ভাষণ-চিঠিপত্রে সেটুকুও নেই।

বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রে দ্রুত প্রবেশের জন্য আমরা তাঁর দুটি বক্তৃতা সংকলনের সাহায্য নেব। একটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালা, যার শিরোনাম ছিল 'Religion of man' (১৯৩১); অন্যটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রূপে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালা, যার শিরোনাম ছিল 'মানুষের ধর্ম'। এই দুটি বক্তৃতা সংকলনে তাঁর মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। 'The Religion of man' ও 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ দুটি একে অপরের পরিপূরক। প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে শুধুমাত্র এই দুটি বক্তৃতা সংকলন পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যাবে না। তাঁর রচিত সাহিত্য-চিত্র-সংগীতের নিভৃত ব্যঞ্জনা সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সহজিয়া সাধকদের মানবপ্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বর উপাসনার মহামন্ত্র এবং

ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অভিঘাতে প্রাপ্ত বাংলাদেশের নবজাগরণের শুভঙ্কর দিকটির কথা মাথায় রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মবোধের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি অনুধাবন করতে উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিত দুটি জরুরি ভূমিকার কাজ করবে।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের সন্ধান করতে গিয়ে বললেন, ঐক্যের উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব। যারা অনৈক্য ও বিভেদ, সংকীর্ণতা ও জড়তা থেকে আমাদের মুক্তির পথ দেখান তাঁরাই মহাপুরুষ। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মানবতাবাদী মহাপুরুষদের কর্মসাধনার গন্তব্য পর্যালোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 'ভারতপথিক রামমোহন' প্রবন্ধে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন,

> "বুদ্ধদেব জাতি বর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি।"[১]

মহামতি বুদ্ধদেবের ঐক্য তথা প্রেমের বাণীতে আপন ধর্মবোধের প্রকাশ দেখেছেন বলে তিনি তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেরণা হিসাবে বারবার বৌদ্ধ কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন 'কথা ও কাহিনী'র অসামান্য কবিতাবলি কিংবা 'রাজা' বা 'চণ্ডালিকা'র মতো তত্ত্ব নাটক। জাতপাতের শতধা বিভক্ত আচারসর্বস্ব ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির স্রোতহীন বদ্ধতার বাঁধ ভেঙে ঐক্য অনুসন্ধানে চলিষ্ণুতার মহাজাগতিক স্রোত নিজের অন্তরে অনুভব করার নামই দিয়েছেন 'মানুষের ধর্ম'। যাঁরা এই মৈত্রী সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁরাই মুক্তিদাতা। মানবমুক্তির বাণী ও বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত শিক্ষিত বাঙালি গ্রহণ করেছিল ইউরোপ থেকে। সেই ক্রান্তিকালে প্রাপ্তমনস্ক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যযুগ অতিক্রম করে দ্রুত পদক্ষেপে আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছিল। সর্ব অর্থে বাংলা তথা ভারতের মুক্তিদাতা রবীন্দ্রনাথের জন্ম এই যুগান্তরের আবর্তে। নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ সকলেই পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সঙ্গে শ্রান্ত ভারতের মিলন সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যার সারাৎসার এসে মিশেছে রবীন্দ্র প্রতিভার সুবিশাল ধারায়। অন্যদিকে বেদ উপনিষদের মূল বাণীর সঙ্গে মধ্যযুগের সহজিয়া সাধক চৈতন্যদেব, কবীর, রজ্জব, দাদু, নানক, তুকারাম, লালন প্রমুখ সন্তদের সহজ সাধনাজাত উপলব্ধি : মানুষের অন্তরস্থিত ঈশ্বর উপলব্ধির সহজপন্থা তথা মানবপ্রেমের সূত্র ধরে ঈশ্বর উপাসনার অসাধারণ বাণী তিনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর রচনায় নবরূপে ব্যক্ত করেছেন। অতএব রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্মের যথার্থ পরিচয় পেতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুটি ধারার সম্যক পরিচয় জানা প্রয়োজন।

শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে আগমন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হলেও

প্রথমে পরোক্ষভাবে ও পরে প্রত্যক্ষভাবে এ দেশ শাসন করেছে তারা। এই উপলক্ষে বর্তমান যুগের বেগবান চিত্তের অভিঘাত লাগল বাংলাদেশে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে। ... পাশ্চাত্যসংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা — নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য-উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্নম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে — সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্য এর প্রয়াস। ... এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে। ... মানুষের চিত্তসম্ভূত যা-কিছু গ্রহণীয় তাকে সম্মুখে আসবা-মাত্র চিনতে পারা ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদারশক্তিকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকে মানসিক আভিজাত্য বলে যে মানুষ কল্পনা করে সে কৃপামাত্র।"[২]

মানুষের চিত্তসম্ভূত যা কিছু গ্রহণীয় তাকে সম্মুখে আসবা-মাত্র চিনতে পারা ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদারশক্তি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একদিনে পুষ্ট হয়নি, তাঁকে কালে কালে অর্জন করতে হয়েছে। কারণ আমরা জানি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে কিংবা বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি অধ্যাত্ম বিশ্বাসে সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মকে মানুষের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি বিশ্বাস করতেন ব্রহ্ম জননীর মতো আমাদের ধারণ করে আছেন।[৩] 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার খণ্ডে খণ্ডে তাঁর এই বিশ্বাসের কথা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সেইসময় তিনি ঔপনিষদিক ব্রহ্মকে জীবনে পেতে চেয়েছিলেন।

> "উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময়, তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত, তা নয়; এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।"[৪]

সবদিক থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ কবিকে মোহমুগ্ধ করে রেখেছিল। তথাকথিত প্রথম বিশ্ব জুড়ে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মহড়া চলছে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আস্ফালনে কাতর রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি করে প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনাদর্শকে নবরূপে পেতে চেয়েছিলেন —

> শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন

দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লি যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবন তলে।[১]

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্য একটি কবিতায় কবির সেই রোমান্টিক আবেগ আর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে —

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র অশোক-মন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃত-মন্ত্র দাও সে জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যু-তরণ শংকা-হরণ দাও সে জীবন নব।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বিশ্বভারতী পরিকল্পনার প্রাক্‌পর্বের অসংখ্য রচনায় তাঁর এই রোমান্টিকতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এই পর্বে তাঁর শিক্ষাচিন্তার বুনিয়াদও নির্মাণ করেছে প্রাচীন তপোবনের আদর্শ। সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম (১৯০১)। সেখানে বৈদিক ও ঔপনিষদিক আবহে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। পরবর্তী দু-দশকের মধ্যে তাঁর ভাবনাচিন্তার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল তা জানা যায় বিশ্বভারতী স্থাপনার পরিকল্পনায়। 'যত্র বিশ্ব ভবত্যেকং নীড়ং' এই বিশ্বভারতী (১৯২০) বাঙালির নয়, হিন্দুর নয়, প্রাচীন ভারতের তপোবনের নবসংস্করণ নয় — এই শিক্ষায়তন যথার্থই আধুনিক বিশ্বের। রবীন্দ্রমানসের এই ব্যাপক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ পশ্চিম গোলার্ধ ভ্রমণ। মূলত তৃতীয় বারের জন্য ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণজাত অভিজ্ঞতা কবিকে বিশ্বনাগরিকত্ব দান করল (মে ১৯১২ — অক্টোবর ১৯১৩)। দেশে ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সংবাদ পেলেন (১৫ নভেম্বর, ১৯১৩) 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজি তর্জমা song offerings—এর জন্য সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার পেয়েছেন। তৃতীয়বারের ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বর্ণনা পাই 'পথের সঞ্চয়' নামক পত্রাবলীতে, যা ওই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও ১৯৩৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইউরোপীয়দের জীবন চাঞ্চল্যে মুগ্ধ কবি লিখলেন,

"ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। ... শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া

চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজেকে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না — দুর্লভের রুদ্ধদ্বারে অহোরাত্র প্রবলবেগে আঘাত করিতেছে।"[৭]

প্রাচীন ভারতের রোমান্টিক কল্পনায় নয়, এই পর্বে তাঁর মানবতাবোধের মহাবিশ্বে যাত্রা শুরু হল। ধর্মীয় তীর্থদর্শনের কঠোর পরিশ্রমে পারলৌকিক সঞ্চয় নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ মিলনে পথের সঞ্চয়ের আবশ্যিকতা তিনি উপলব্ধি করলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন উদ্যানে অধ্যাপক ডিকিনসন ও রাসেলের সঙ্গে রাত্রিকালীন আলাপচারিতায় তিনি উপলব্ধি করলেন —

"মানুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানা পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থ আনন্দে ও ঐশ্বর্যের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।"[৮]

ইউরোপযাত্রাকে তিনি সত্যের সন্ধানে তীর্থযাত্রা বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে চলাফেরা করার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং যা কিছু অভ্যস্ত পুরাতন, তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। সংস্কারহীন উদারদৃষ্টিতে পৃথিবীর বিচিত্র কার্মোন্মাদনাকে দেখার বিশেষ দৃষ্টি অর্জন করতে পারলে আত্মম্ভরিতার দীনতা থেকে মানবসমাজকে মুক্ত করে ঐক্যের মানবতায় উন্নীত করা যায়। এই কথাগুলি তাঁর 'পথের সঞ্চয়' পত্রাবলীর 'যাত্রার পূর্বপত্রে' বলেছেন —

"পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড়ো সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ। ... য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?"[৯]

বিজ্ঞানের অবিস্মরণীয় আবিষ্কারকে মূলধন করে যখন তাঁরা প্রযুক্তিগত শিল্প সৃষ্টিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে চলেছে এবং নব উদ্ভূত শিল্প-পণ্যের বাজারের খোঁজে বিশ্বময় অস্থির চাঞ্চল্যে ছুটে চলেছে তখন তাঁদের সেই অভিযানকে অনেকেই জড়শক্তির অভিযান বলে খাটো করেছে। কিন্তু তার মূলেও যে মানুষের আত্মা আছে তা আমরা দেখতে পাই না। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সেই বস্তুরাশির অভ্যন্তরেও মানুষের আত্মার সন্ধান পেয়ে বলেছেন —

"বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে তাহার একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে। য়ুরোপের সেই আত্মাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব – তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ চতুর্থবার ইউরোপ ভ্রমণে যান ১৯২৬-এ এবং পঞ্চম ও শেষবারের মতো ইউরোপ যান ১৯৩০-এ। এই শেষবারেই তিনি Religion of man নামক বক্তৃতা প্রদান করেন। বলাবাহুল্য মধ্যবর্তী সময় কিংবা তার পরেও তাঁর বিদেশ ভ্রমণ অব্যাহত ছিল। শেষবারের ইউরোপ ভ্রমণ পর্বে তিনি তাঁর বহুদিনের তীর্থযাত্রার স্বপ্ন সফল করলেন সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে। যে অভিজ্ঞতার অসামান্য বর্ণনা পাই 'রাশিয়ার চিঠি' পত্রসাহিত্যে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সেইসঙ্গে বিশ্বমানবতাবোধের প্রসারে সম্পূর্ণতা পেয়েছে মানুষের ধর্মের ধারণা।

রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণার ভূমিকাংশকে আর দীর্ঘায়িত না করে ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণিধানযোগ্য সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে শেষ করব – জাগরণ ও আত্মোপলব্ধির অর্থ যদি এই হয় যে, ক্ষুদ্রের ও সংকীর্ণের বন্ধন থেকে মুক্তি, তাহলে স্বীকার করতে হয় –

"চল্লিশ থেকে সত্তর – জীবনের এই তিরিশ বৎসর কেবলই ভেঙেছেন, নিজেকে বারবার অতিক্রম করেছেন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে যাত্রা করেছেন। প্রথম যৌবনে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম, তারপর ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ, তারপর তপোবন ও আনন্দবাদ, ব্রাহ্মসমাজ-নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা, জীবনে ও কর্মে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা – সবই রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন, শেষ পর্যন্ত মানব-ঐক্যবোধে উপনীত হয়েছেন। সত্যের রূপ ও প্রেরণা বারবার পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতায় পৌঁছেছে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ ও সর্বোত্তম সত্যোপলব্ধি। 'মানুষের ধর্ম' এই সত্যোপলব্ধির পরিচয়স্থল।"[১১]

দুই

বিশ্বহিতে নিরত মনুষ্যবোধের সমুজ্জ্বল আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' বুঝতেন। ধর্মের প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে মনুষ্যত্ব বিকাশের সাধনায়। আত্মকেন্দ্রিকতা নয়, সংকীর্ণ স্বার্থবোধ নয়, – বৃহৎ ও মহৎ জীবনের সাধনার নাম ধর্ম। 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতা সংকলনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব প্রকৃতিতে। যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।"[১২]

এই ধর্ম চেতনা রবীন্দ্রমানসে কবে জাগ্রত হল এই জিজ্ঞাসা দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম। 'প্রভাত সংগীত' (১৮৮৩) কাব্যগ্রন্থের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (রচনাকাল ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) কবিতাটিকে কবি বহুকাল পরে 'মানবসত্য' (১৯৩৬) রচনায় খণ্ডজীবন থেকে মহামানবলোকে মুক্তিরূপে, বদ্ধজীবন থেকে কবি হৃদয়ের বৃহৎ জীবনের দিকে, সমুদ্র অভিমুখে নির্ঝরের যাত্রা বলে বর্ণনা করেছেন।

> "সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব, তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে এই যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলো জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে? এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়। মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবার এই ডাক।"[১৩]

'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রই তরুণ রবীন্দ্রনাথের সেই অন্তর প্রতিক্রিয়ার কথা জানেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার মধ্যে কবির হৃদয়গুহা থেকে বেরিয়ে জগতে আত্মপ্রসারের আনন্দময় অভিব্যক্তির কথা ব্যঞ্জিত হয়েছে। সেখানেই আছে মানবপ্রীতির অমৃতকথা — আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাঙিব পাষাণকারা; ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবনের উপান্তে পৌঁছে কবির সর্বব্যাপক মানবধর্মের অস্ফুট প্রকাশ লক্ষ করা যায় এখান থেকেই। পরবর্তীকালের কবিতাগুলিতে মানুষ ও মানবমহিমাকে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখি। এখানে মনে রাখা দরকার এই মানুষ নিছক জৈব মানুষ নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ইনি 'নিখিল মানবের আত্মা'। যা আবার প্রচলিত বিশ্বাসের ঈশ্বর নন। মানুষের ধর্মের আলোচনায় তিনি বলেছেন,

> "আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা এমন কত আত্মা। তারা যে — এক আত্মার মধ্যে সত্য, তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানব পরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, ইনি আছেন সর্বদা জনে জনের হৃদয়ে।"[১৪]

প্রথম যৌবনে লিখিত 'একটি পুরাতন কথা' (রচনাকাল ১২৯১ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে 'অনন্ত দেশ ও অনন্তকালের সহিত আমাদের যোগে'র কথা বলেছিলেন, সে যোগে ছিল ঈশ্বরাশ্রয়। ১৩১৫ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রদত্ত 'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালাতেও রবীন্দ্রনাথ সত্যকার ব্রহ্ম-ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। নিত্যকার কাজে কর্মে আচরণে দিনরাত্রির আবর্তনে ঋতুর বৈচিত্র্যে গ্রহচন্দ্রতারকার নিত্য পরিক্রমণে, অণুর তরঙ্গলীলায় তিনি ব্রহ্মের উপস্থিতি অনুভব করেছেন। আমাদের জীবন ব্যক্তিসাধনার মধ্য দিয়ে অখণ্ড সাধনার অভিমুখী — এ বিষয়ে অসামান্য ব্যাখ্যা

করে জীবনটাকে ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূজা পুষ্পের মতো শুচি ও শুভ্র করে তুলেছেন। এই ধারণাই মানুষের ধর্ম পর্যায়ে এসে মানবে আশ্রয় লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের চরম লক্ষ্য মহামানব। যৌবনের শুরু থেকে সেই মহামানবের সান্নিধ্যে আসবার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তা সেই সময় সার্থকতা লাভ করেনি। তাঁর মানব-কল্পনা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে বিশ্বের নানা জাতি ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে। মহামানবের সাগরতীরে যে নরদেবতার বন্দনা তিনি করেছেন তখনও সে নরদেবতা ছিল অসম্পূর্ণ। গীতাঞ্জলি পর্বে এসে সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী কৃষকশ্রেণির মানুষের মধ্যে সেই নরনারায়ণকে প্রত্যক্ষ করে মহামানব ধারণাকে সত্য ও ব্যাপক করেছেন। ভারতবর্ষে যে ঐক্য সাধনার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, বিদেশ ভ্রমণ-সূত্রে সেই ঐক্য সাধনা অধিকতর অর্থবহ হয়েছে। তবে রাষ্ট্রতন্ত্রকে সে দেশে সর্বমানবিক ঐক্যের পথে বাধা বলে চিহ্নিত করেছেন। যেমন আমাদের দেশে মানবসত্য খণ্ডিত হয় ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভেদের বাধায়। বলাবাহুল্য এই ধর্ম সম্প্রদায় হল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসম্প্রদায়। এর বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মর্মবাণীর মিল খুঁজে পান মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সন্তসাধক ও বাউল-ফকিরদের নরদেবতার আরাধনায়। এরা আচার সর্বস্ব অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। রবীন্দ্রনাথ যে সন্ত সাধকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ এই সাধকদের গানে ও বাণীতে আছে ভেদহীন মানুষের কথা। 'The Religion of man' — নামক বক্তৃতামালায় তিনি বলতে চেয়েছেন এই মানুষের ধর্মই চিরন্তন ধর্ম। এখানে বলে রাখা ভালো যে, সন্তসাধক বা বাউলদের সাধনায় যেটুকু মিস্টিক পন্থা আছে রবীন্দ্রনাথে তা নেই। যদিও তাদের সাধনা মন্দির মসজিদ নিয়ে গড়ে ওঠেনি। তাদের হৃদয় মাঝেই কাবা-বৃন্দাবন। আচার অনুষ্ঠান বর্জিত বলে তাঁদের ধর্মে মানুষকে খণ্ডিত করে ভেদচিহ্ন অঙ্কনের মূঢ়তা নেই। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মের সমর্থন পেয়েছিলেন এখানেই।

> ‘‘অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। কেননা মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমা — আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা — বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপাচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ, কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা। সেইজন্যই কথিত আছে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তারা সত্যকে অন্তরে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌঁছোতে পারি।’’[১৫]

সেই কঠিন সাধনাকে বাংলার অশাস্ত্রজ্ঞ নিরক্ষর বাউল-ফকির সম্প্রদায় সহজ সাধনার মাধ্যমে সহজ করেছেন। মনের মানুষকে মনের মাঝে সন্ধানের মাধ্যমে আত্মায় পৌঁছানোর সাধনা তাঁদের।

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ। ....
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্ব ঠাঁই।

সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশান্তি। বলেছেন, তং বেদ্যং পুরুষং বেদ — যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়। বেদ উপনিষদের ধারা বেয়ে মধ্যযুগের সন্তকবি ও বাউল ফকিরদের সাধনার চিরপুরাতন ধারা রবীন্দ্রনাথে এসে আবার নতুন রূপে প্রকাশিত হয়েছে —

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকলখানে।।
আছে সে নয়ন তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায় —
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক-পানে।।

"অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাঁকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাহিরে বিক্ষিপ্ত আপনাহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলাম পথিক ভিখারির মুখে —

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"[১৬]

তাই তো জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপ্ত মঞ্চে বিদ্যৎসমাজের সামনে মানুষের ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে তাঁদের মনের মানুষের ধারণায় প্রাণিত হয়েছিলেন। গোটা পৃথিবী সেদিন সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে ও অবাক বিস্ময়ে মাটির পৃথিবী পানে দৃষ্টিপাত করলেন। ডিগ্রির অহংকার সরিয়ে রেখে তাঁদের সাধনার মর্মকথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন আপন হৃদয়পানে তাকিয়ে। 'পুনশ্চ' কাব্যেও এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রজ্জব, কবীর, দাদু, রামানন্দ, নাভা, রবিদাস, নানক ও বাংলার বাউলদের জীবন সাধনাকে তিনি 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় কাব্যরূপ দিয়েছেন। ধর্মীয় শ্রেষ্ঠাভিমানী আচারসর্বস্ব ধর্মের ধ্বজাধারীদের মানববর্জিত ধর্মচর্চার বিপরীতে তথাকথিত অশাস্ত্রজ্ঞ নিরক্ষর সন্তসাধক ও বাউল ফকিরদের মানবধর্মের জয়গাথা রচনা করেছেন। 'পত্রপুট' (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় কবির সেই উপলব্ধির চূড়ান্তরূপ প্রকাশিত হয়েছে, যেন নিখিল

মানবাত্মার অমৃতকুম্ভ থেকে উচ্চারিত হল মানবধর্মের মহামন্ত্র —

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন —
সকল মন্দিরের বাহিরে আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষ আর
মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।[১৭]

তথ্যসূত্র :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারত পথিক রামমোহন', ১৯৩৩।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ', সাহিত্যের পথে, ১৯৩৬।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ধর্মপ্রকার', ধর্ম, ১৯০৩।
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শান্তিনিকেতন' ৩ পৌষ, ১৩১৫।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৈবেদ্য, ১৯০১
৬। তদেব।
৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'খেলা ও কাজ' পথের সঞ্চয়, ১৯৩৯।
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইংলন্ডের ভাবুক সমাজ, পথের সঞ্চয়, ১৯৩৯।
৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাত্রার পূর্বপত্র, পথের সঞ্চয়, ১৯৩৯।
১০। তদেব।
১১। ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'মানুষের ধর্ম : রবীন্দ্রনাথের অন্বেষণ', সাহিত্য সন্ধান, ২য় সং. ১৯৮৮।
১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা, মানুষের ধর্ম, ১৯৩৩।
১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানবসত্য, সংযোজন, মানুষের ধর্ম, ১৯৩৬।
১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম, ১৯৩৩।
১৫। তদেব।
১৬। তদেব।
১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি আমি ওদের দলে, পত্রপুট, ১৯৩৬।

বাংলা ভাষাসাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক শ্রী নুরুল মোর্তজা বর্তমানে জঙ্গিপুর কলেজে কর্মরত।

রবীন্দ্র মঞ্চ ভাবাদর্শ : উৎস থেকে মোহনায়

ড. বিমলচন্দ্র বণিক

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছিল সমকালীন বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি চর্চার এক উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ইত্যাদি বিচিত্রক্ষেত্রে এ বাড়ির অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তাদের নব নব চিন্তাচেতনা দেশকে প্রতিনিয়ত প্রগতির পথের নতুন দিশা দেখাত। নবজাগরণের অনেক মন্ত্র এখান থেকেই প্রথম আলোকপ্রাপ্ত হত। এ বাড়ির এক পূর্বপুরুষ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সমকালীন বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট মানুষ। ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি সূত্রে তিনি গভীরভাবে ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি, জমিদারি ইত্যাদি ব্যাপারে বাংলার অর্থনীতির এক বিরাট চালিকাশক্তিতে পরিণত হন। অন্যদিকে তিনিই আবার ছিলেন একজন শিল্পগত প্রাণ, ছিলেন সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী, থিয়েটার, যাত্রা ইত্যাদির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কয়েকটি থিয়েটারের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চৌরঙ্গী ও সাঁ সুসি থিয়েটার। বিভিন্ন সময় এদের নানা পরামর্শ, বিপদে অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন —

> "১৮৩৫ সালের ১৫ই আগস্ট দ্বারকানাথ নিলামে চৌরঙ্গি থিয়েটার কিনিয়া নেন। থিয়েটারের ব্যবসা করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিনিয়া লইবার পর আবার থিয়েটারটি পুরনো মালিকদের দিয়া দেন। রঙ্গালয় ও অভিনয়কে ভালোবাসিতেন বলিয়াই প্রিন্স দ্বারকানাথ এভাবে চৌরঙ্গি থিয়েটারকে নিজের টাকা খরচ করিয়া ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর আর একটি বিখ্যাত ইংরাজি থিয়েটার মিসেস লিচ-এর সাঁ সুসির উন্নতিকল্পেও প্রিন্স দ্বারকানাথ বহু অর্থ সাহায্য করেছিলেন।"[১]

এহেন একজন উদার, নাট্যরসিক মানুষের বাড়িতে নাটকের আবহাওয়া থাকবে বলাই বাহুল্য। ১৮৬৫ সালেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটা নাট্যশালা গড়ে ওঠে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে (দ্বারকানাথের মধ্যম পুত্র গিরিন্দ্রনাথের অংশের ৫নং বাড়িতে)। রবীন্দ্রনাথ তখন মাত্র চার বছরের শিশু। বাড়ির ছোটোদের প্রত্যক্ষভাবে থিয়েটার দেখায়

নিষেধাজ্ঞা থাকায় হয়তো বালক রবি দূরবর্তী কোনো কক্ষের বাতায়নের ফাঁক দিয়ে কখনো সখনো তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি সেই সরগরম আসরে পৌঁছে দিতেন কল্পনার সড়ক দিয়ে। হয়তো মানস অভিনয়েও অংশ নিতেন। সুমহান সেই ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্য আবহাওয়াতেই ক্রমে গড়ে ওঠে তাঁর নাট্যচেতনা। 'গল্পসল্প'তে রবীন্দ্রনাথ স্বীকারও করেছেন — বাড়ির দালানের পিছনের দিকে ফাঁকা জমিতে বাঁশ নির্মিত মঞ্চে হরিশচন্দ্র হালদারের 'মুক্তকুন্তলা' নাটকে অভিনয়ের কথা। বাল্যকাল থেকেই তাঁর নাট্যাভিনয়ের শখের কথা তিনি 'জীবনস্মৃতি'-র এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এর থেকে আমরা আরও জানতে পারি, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনের অলীকবাবু চরিত্রেই ছিল তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনয়। "বাল্যকাল হইতেই আমার মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না, তাহার প্রমাণ হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়।"[২] এরপর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিলাত ভ্রমণ করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' নাটকের 'মদন' চরিত্রে অভিনয় করেন। এই নাটকের 'আয় সবে সহচরী' গানটি তিনিই লিখে দেন। এছাড়া, ইন্দিরাদেবীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে, এসময়ে তিনি দিদি স্বর্ণকুমারীদেবী রচিত 'বিবাহ উৎসব' গীতিনাট্যেও অভিনয় করেন। এইভাবে প্রাথমিক পর্বে পারিবারিক প্রচলিত মঞ্চব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই এক মহান নাট্যপ্রতিভার পথচলা শুরু হয়। এরও অনেক আগে মাত্র বারো বছর বয়সে 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন।

বাংলা থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ যখন আবির্ভূত হলেন তখন চলছিল পেশাদারি থিয়েটারের যুগ। ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার ইত্যাদি সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে তখন রমরমিয়ে চলছে 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'বিদ্যাসুন্দর', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', 'বঙ্গবিজেতা', 'শরৎ সরোজিনী', 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি দর্শক মনোরঞ্জক নাটক। গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু প্রমুখ নট-নাট্যকার তখন রঙ্গমঞ্চ জুড়ে রাজত্ব করছেন। প্রায় যাট বছরের নাট্য জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামান্য যোগাযোগও ঘটেছিল। ১৮৭২-৭৩ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' ও 'নবীন তপস্বিনী' (দুটিই দীনবন্ধু মিত্র রচিত) দেখতে যান কিংবা দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য 'জ্বল জ্বল চিতা' গানটি লিখে দেন। এই নাটকটি ১৮৭৬ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। কেদার

চৌধুরী কৃত তাঁর 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৮৮৬ সালের ৩ জুলাই। এমন কি সাধারণ রঙ্গালয়ের জনপ্রিয় অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সখ্যতাও ঘটে এবং তিনি ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক থিয়েটারেও অভিনয় করেছিলেন একসময়। পরবর্তীকালে 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'চিরকুমার সভা' ইত্যাদি নাটক এবং বহু গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে। তবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের হৃদ্যতা কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি। সাধারণ রঙ্গালয়ের গতানুগতিক মঞ্চভাবনা, মুখরোচক ও দর্শক মনোরঞ্জক নাট্য উপস্থাপনা, দৃশ্যপট নির্মাণ, প্রয়োগরীতি ইত্যাদি কখনোই তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বহু উদ্যোগ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ভাবনা সাধারণ রঙ্গালয়ের থিয়েটার ভাবনার সঙ্গে এক রেখায় আসতে পারেনি, তা বরাবরই সমান্তরাল পথরেখা ধরে অগ্রসর হয়েছে—

> ''অর্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী ও নরেশ মিত্র রবীন্দ্রনাথকে বাংলা রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় করার জন্য একাধিকবার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও জাতির দুর্ভাগ্য যে কোনো উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি -- যদিচ কোনো প্রযোজনাকেই প্রয়োগশিল্পের বিচারে ব্যর্থ বলা যায়নি। এই যখন তথ্য, তখন রবীন্দ্রনাথকে দোষ দেওয়া যায় না; তিনি আসলে সাধারণ রঙ্গালয়ের থেকে তাঁর নাট্যভাবনাকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে পরিচালিত করেছিলেন তাঁর শিল্পভাবনা ও জীবন জিজ্ঞাসার কারণে।''[৬]

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঐতিহ্যশালী ঠাকুরবাড়ির সুমহান চিন্তাচেতনার দ্বারা লালিত পালিত। পারিবারিক থিয়েটারের সমৃদ্ধ ভাবনায় প্রথমাবধি তাঁর নাট্যবোধ বিকশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন উদারচেতা মানবতাবাদী; তাঁর সৃষ্টির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কোথাও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল ছিল না। সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবাদপ্রতিম নাট্য ব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্রের (যিনি একাধারে নট, নাট্যকার, অভিনয় শিক্ষক, মঞ্চ প্রতিষ্ঠাতা, মঞ্চমালিক, সংগীতকার) সঙ্গেও তাঁর বিশেষ সংযোগ ছিল না। আসলে গিরিশচন্দ্র ছিলেন অনেকটাই রক্ষণশীল, শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁর জাতীয় চেতনাও ছিল অনেকটা হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টিভঙ্গি তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। এজন্য তিনি কোনো রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চায়ন করেননি, রবীন্দ্র নাটকের কোনো চরিত্রে অভিনয় করেননি কিংবা কোনো রবীন্দ্র গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ পর্যন্ত দেননি। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসকে তাঁর মনে হয়েছিল 'দুর্নীতিমূলক'। অথচ বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের একটি যুগান্ত সৃষ্টিকারী উপন্যাস, বাংলা

কথা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। গিরিশচন্দ্রের এই ধরনের মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গাতকারণেই রবীন্দ্রনাথ সাযুজ্যবোধ করেননি। তবু গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনোরকম বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি। বরং আপন ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্যের প্রতি সুবিচার করেই তিনি গিরিশ প্রতিভার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন —

> "............... গিরিশচন্দ্র যে একজন জিনিয়াস এবং তিনিই যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, এই প্রচলিত মতবাদ সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা অভিমত আছে, যেটা আমি প্রকাশ্যে আলোচনা করতে সংকোচবোধ করেছি পাছে কারো মনে আঘাত লাগে। তিনি একটা বিশেষ চিন্তাধারার পরিবেশন করেছেন যার সঙ্গে আমার চিন্তাধারার কোনো মিল দেখতে পাই না। পেশাদার মঞ্চের তিনি নাট্যগুরু, এবং তাঁর এই গৌরব লাঘব না করে আমি শুধু এইটুকু স্বীকার করব যে, এদেশে থিয়েটার বস্তুটিকে বাঙালির চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে তাঁর প্রতিভা সার্থক হয়েছে।"[৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ তিন দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র ছিলেন বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের একচ্ছত্র সম্রাট। কি অভিনয়, কি নাটক রচনা, কি নাট্যশিক্ষা, কি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা — তিনিই যেন শেষ কথা। এহেন গিরিশচন্দ্রের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নাটক সম্পর্কে তীব্র অনীহা রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশি করে যেন সাধারণ রঙ্গালয় বিমুখ করে তোলে। অর্ধেন্দুশেখর, কেদার চৌধুরী, শিশিরকুমার প্রভৃতি নাট্যশিল্পীরা চাইলেও একমাত্র গিরিশচন্দ্রের অসহযোগিতায় সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের বিচরণ অনেকটাই কঠিন হয়ে যায়। অন্তত গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশা পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের একটা সুপ্ত ইচ্ছা ছিলই সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর নাটক জনপ্রিয় হোক। সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যই তিনি তাঁর বহু নাটকের পরিবর্তন, পরিমার্জন করেছেন। তাঁর অনুমতি নিয়েই তাঁর বহু নাটক সাধারণ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। আবার বহু গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপও অভিনীত হয়েছে যেমন — 'বউ ঠাকুরানীর হাট'-এর কেদার চৌধুরী কৃত নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়', 'চোখের বালি'-র নাট্যরূপ দেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন শিশির কুমার ভাদুড়ী, 'মুক্তির উপায়' গল্পের সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপ 'দশচক্র', 'শাস্তি' গল্পের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত নাট্যরূপ 'অভিমানিনী', রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'দিদি' গল্পের নাট্যরূপ 'অকলঙ্কশশী', অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত 'দালিয়া' গল্পের নাট্যরূপ 'জীবনে মরণে' ইত্যাদি। দুই মহান নট ও নাট্যকারের পারস্পরিক মিলন ও সহযোগিতা ঘটলে, বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ তার মধ্যযুগেই আরও অধিক শক্তিশালী, বেগবান রূপে আত্মপ্রকাশিত হতে পারত। কিন্তু আমাদের

দুর্ভাগ্য সে সম্ভাবনা নানা কারণে অঙ্কুরিত হয়নি। নাটক ও থিয়েটার সম্পর্কে তাদের আপন আপন ভাবনাচিন্তা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে —

> "রবীন্দ্রনাথও চেষ্টা করেছেন, তাঁর নাটককে সাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় করার জন্য একাধিকবার পুনর্লিখন, বর্জন, সংযোজন সবই। তা সত্ত্বেও সাধারণ রঙ্গালয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই টিকে থেকেছে, আর রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভাগুণে সাধারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরাল এক অ-সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত না হবার আরও নানাবিধ কারণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে, আমরা জানি, কাহিনি বা চরিত্র অপেক্ষা ভাব বা তত্ত্বের প্রাধান্য। প্লটের অনিবার্য জটিলতা কিংবা চরিত্রের দুর্দমনীয় বেগ সবই যেন ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। রবীন্দ্রঘনিষ্ঠ E. G. Thompson-ও তাঁর নাটকগুলিকে বলেছেন 'vehicles of ideas'. আর কে না জানে সাধারণ কাহিনি বা চরিত্রের উপস্থাপন অপেক্ষা তার অন্তর্গত ভাবের উপস্থাপন বহুগুণ দুরূহ। বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার মাধ্যমে সেই ভাবের খোলস ছড়িয়ে নাটকের রসাস্বাদন সাধারণ দর্শকদের পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব! অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক জন্ম-রোমান্টিক কবি। সাহিত্য শিল্পের যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন সর্বত্রই এই কাব্যত্বের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে। আর ভাষাকে দিয়েছে এক অনাস্বাদিত রম্যতা। নাটকের ক্ষেত্রেও ভাবের দোসর হয়েছে এই কাব্যত্ব। ভাব বা আবেগকে যথাযথ স্ফুরণের সর্বোত্তম মাধ্যমই হল কবিতা বা পদ্যছন্দ, কখনোই গদ্যভাষা নয়। এই কাব্যত্ব বা কাব্যধর্মিতা বা গীতিধর্মিতা তাঁর নাটকগুলিকে করে তুলেছে অসাধারণ। আর এই অসাধারণত্বের ফলেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা গড়ে ওঠেনি। যতটুকু গড়ে উঠেছে তা নিতান্তই আকস্মিক। তাতে কোথাও আত্মিকতার ছাপ নেই। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের অভাবে তা কোথাও সহজ, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত নয়। একজন কবি বা কথাকার বা প্রাবন্ধিকের পক্ষে আমজনতাকে উপেক্ষা করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদাকে মূল্য না দিয়েই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু একজন নাট্যকারের পক্ষে প্রচলিত মঞ্চব্যবস্থা, সাধারণ দর্শকের প্রত্যাশাকে পদদলিত করে জনপ্রিয় নাটক রচনা অসম্ভব। অর্থাৎ বলা যায় তাঁর নাটকগুলি যৌথশিল্প কর্ম না হয়ে, বড্ড বেশি এককের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। সমালোচকের কথায় বলা যায় —

> 'রবীন্দ্রনাথের নাটক অসাধারণ, কিন্তু ঐ অসাধারণত্বই তাহার ত্রুটি, সাধারণের নিকট কিছু পরিমাণে নতি স্বীকার করিলে তবেই এগুলি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প হইয়া উঠিতে পারিত। ..... এগুলি অত্যন্ত বেশিভাবে এককের সৃষ্টি। নাটক যৌথ শিল্প,

তাহাতে যদি উগ্রভাবে এককের সৃষ্টি হয়, তবে তাহার একঘরে হইয়া থাকার আশঙ্কাই প্রবল।"[৬]

রবীন্দ্র-নাটক অসাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় না হলেও রবীন্দ্রনাথের অনেক চিন্তাভাবনার দ্বারা সাধারণ রঙ্গালয় ঋদ্ধ হয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়ের অনেক সংস্কার রবীন্দ্রনাথেরই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' থেকে আমরা জানতে পারি, এমারেল্ড থিয়েটারের লোকজন কীভাবে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক মঞ্চে অভিনীত 'রাজা ও রানী'-র অভিনয় লুকিয়ে দেখে তাঁর ভাবনার রূপায়ণ ঘটান তাদের থিয়েটারে। অর্থাৎ পেশাদারি থিয়েটারকে প্রভাবিত করলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কখনো পেশাদারি থিয়েটারের দ্বারা প্রভাবিত হননি। যেমন শেক্সপিয়ার, ইবসেন, হাউস্টম্যান, ব্রেখট প্রমুখ নাট্যকাররা হয়েছেন। তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ না করেই নাটক লিখেছেন। তাঁর মতে 'অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা, নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।' (রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধ)। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রথাদুষ্ট ভাবনার গোলামি না করেই তাঁর বন্ধন অসহিষ্ণু মন নানা বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিবিষ্ট থেকেছে। প্রমথনাথ বিশির মতে, নাট্যকারের পক্ষে তা একটি অবাঞ্ছিত অপূর্ণতা —

> "...... পরবর্তীকালে বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ যে সব convention or সংস্কারকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অনেকগুলিই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও পরিকল্পিত সন্দেহ নাই; রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রভাবিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, তিনি নিজে কখনো পেশাদার রঙ্গমঞ্চের দ্বারা অর্থাৎ গণচিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষার সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। ইহা গৌরব করিবার বিষয় নয়, নাট্যকারের পক্ষে ইহা একটি অবাঞ্ছিত অপূর্ণতা; শেক্সপিয়ার সমকালীন রঙ্গমঞ্চকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তেমনি নিজেও প্রভাবিত হইয়াছিলেন।"[৭]

সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকরাও ছিল অত্যন্ত মোটা দাগের। হালকা, চটুল, রঙ্গব্যঙ্গে পূর্ণ, সস্তা গানবাজনায় পরিপূর্ণ নাটকই ছিল তাদের পছন্দ। সূক্ষ্ম অনুভূতি, সংবেদনশীলতা, অন্তর্দৃষ্টি, কবিত্বময়তা ইত্যাদি ছিল তাদের চেতনায় অনাত্মীয়। রুচিশীল মানসিকতাও তাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। এই সকল সাধারণ দর্শকদের কথা চিন্তা করে অর্থাৎ ব্যবসায়িক লাভক্ষতির কথা চিন্তা করে মঞ্চ মালিকরাও রবীন্দ্র নাটককে তেমনভাবে পেশাদারি থিয়েটারে আমন্ত্রণ জানাতে সাহসী হতে পারেনি, রবীন্দ্র নাটকের মহান ভাবকে মঞ্চে বাস্তব রূপ দেবার উপযুক্ত, দক্ষ নটনটী বা

নির্দেশকও তখন ছিল দুর্লভ। গিরিশচন্দ্র তো নানা কারণে এ পথ মাড়াননি; শিশিরকুমারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্ভাবনা দেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনিও কবিকে আশাহত করেছিলেন। অনেকে আবার ভেবেছেন তাঁর নাটক কৃত্রিমতায় ভরপুর, তাতে রয়েছে জীবনাবেগের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির অভাব; কারোর কাছে তা 'মেয়েলিপনা' ও 'ন্যাকামি'-তে আচ্ছন্ন; কেউ তাতে দেখেছেন 'লিরিকের জলাভূমি' কারোর কাছে তা নিতান্তই 'বায়বীয়'। অনেকের মতে, নাটকগুলি 'যতটা পাঠযোগ্য ততটা অভিনয়যোগ্য নয়'। এর সঙ্গে রয়েছে রূপক সাংকেতিক পর্যায়ের নাটকগুলির তত্ত্বপ্রাধান্য, অমূর্ত ভাবব্যঞ্জনা। তবে এগুলির সফল মঞ্চায়নও যে সম্ভব, পরবর্তীকালে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী তা প্রমাণ করেছে। তবুও সমকালে এগুলির জনপ্রিয়তা না পাবার পশ্চাতে দর্শকদের স্থূল রুচি ও মঞ্চমালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বহুলাংশে ক্রিয়াশীল ছিল। জনৈক সমালোচকের মতে,

> "আসলে তখনও সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকমন হালকা রঙ্গরসিকতা, ঠাট্টা তামাসায় মজে ছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথের ওই নাটকগুলি ধরার দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনার উপযুক্ত নির্দেশক বা অভিনেতা-অভিনেত্রী হয়তো তখনো তৈরি হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে গিরিশচন্দ্রের মতো দক্ষ পরিচালক, নাট্যশিক্ষকও রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনা করতে এগিয়ে এলেন না।"[৮]

সমকালের পেশাদারি থিয়েটারে জনপ্রিয়তা না পেলেও রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রয়াস কিন্তু কোথাও থেমে থাকেনি। তাঁর অভিনয়ও হয়েছে তাঁর নিজের নির্দেশনা, প্রযোজনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে। নানা বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সেখানে প্রতিনিয়ত নিজেকে ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন। কোথাও তা স্থবিরতায় পঙ্ককুণ্ডে আবদ্ধ হয়নি। জন মনোরঞ্জনের তাগিদ নেই, সস্তায় বাজিমাতের প্রতিযোগিতা নেই। গতানুগতিক, প্রথা শাসিত সাধারণ রঙ্গালয়ের ধারার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের এক ও অদ্বিতীয় Experimental Theatre – বাংলা থিয়েটারের প্রথম থেকেই চলল এই দুটি ধারা —

> "বাংলা থিয়েটারে বরবারই দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যাবে। এক সাধারণ মানুষের বোধবুদ্ধিকে সমীহ করে একটি ধারা — সেখানে দর্শকের বোধশক্তিই মাপকাঠি। অন্য একটি ধারা যেখানে লোকপ্রিয় হবার তাগিদ নেই - আত্মপ্রকাশের একটা পরিচ্ছন্ন ধারা। রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চা এই পথেই চলেছিল।"[৯]

তাই বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ধারায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক অভিনব ঘটনা। পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে তাঁর নাট্যভাবনার কোনো মিল নেই। সমস্ত বিধি বিধান, বন্ধন অতিক্রম করে তা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। সেখানে

রয়েছে দেশকাল নিরপেক্ষ মানুষের জয়গান; চেতনার মেলবন্ধন —

> "রবীন্দ্রনাথের নাট্য-বৈশিষ্ট্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সীমানার মেলবন্ধন, চেতনার মেলবন্ধন, মানুষের জীবনের জয়গান এবং সমাজের আকাঙ্ক্ষিত প্রতিচ্ছবি।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চভাবনায় সাধারণভাবে তিনটি পর্যায় (Phase) লক্ষ করা যায়, (P_1) কলকাতা পর্ব (১৮৮১-১৯০১) : মোটামুটিভাবে উনিশ শতকেই সীমাবদ্ধ। জোড়াসাঁকো বাড়ি ও সংগীত সমাজে অনুষ্ঠিত নাটকগুলি প্রধানত এই পর্যায়ের অন্তর্গত। (P_2) শান্তিনিকেতন পর্ব (১৯০১-১৯১৫) এবং (P_3) মিশ্রপর্ব অর্থাৎ কলকাতা-শান্তিনিকেতন পর্ব (১৯১৫-১৯৪১)। অনেকে আবার একে 'ফাল্গুনী' পূর্ববর্তী এবং 'ফাল্গুনী' পরবর্তী — এই দুটি ধারায় ভাগ করেন।

প্রথম পর্বের অভিনয়গুলি সংগঠিত হয়েছে প্রধানত কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে — তিনতলার ছাদে, প্রাঙ্গণে, বিচিত্রাভবনে এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্কস্ট্রিটের বিরজিতলার বাড়িতে (সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের সংলগ্ন জমিতে সে সময় একখানা বড়ো পুকুর ছিল। তারই নাম ছিল বির্জিতলাও। এর থেকেই বিরজিতলা। এই অঞ্চলেই সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ি ছিল।) সব নাটকই রবীন্দ্রনাথের রচনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান চরিত্রে তিনিই অভিনয় করেছেন। এছাড়া অভিনয় করেছেন ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়ে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। দর্শকও ছিলেন সীমিত সংখ্যক, আমন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথের লেখা নয় এমন তিনটি নাটকে রবীন্দ্রনাথ এসময় অভিনয় করেছেন। যথা — জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'মানময়ী' (মদন চরিত্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ) ও 'এমন কর্ম আর করব না' (অলীকবাবুর ভূমিকায়) এবং দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা 'বিবাহ উৎসব' (জনৈকা নারীর ভূমিকায়)।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনা, পরিচালনা ও সুর সংযোজনায় প্রথম অভিনীত নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা' (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১)। রবীন্দ্রনাথ নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। এ নাটকের বাস্তবধর্মী দৃশ্যসজ্জা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

> "মহা সমারোহে স্টেজ বানানো হল। নিতুদা নিলেন স্টেজ সাজাবার ভার। অনেক কারিকুরি করলেন তিনি স্টেজে। মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা অর্ধচন্দ্রাকারে ভরাট করলেন। .... বনজঙ্গল বানালেন সেই মাটিতে। স্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, দো-তলার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা চলে গেছে স্টেজের ভিতরে। নানারকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সিন বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। পদ্মবন, শোলার পদ্মফুল, পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের মতো পাতলা গজের পর্দা পরপর চার-পাঁচটা স্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথমটা বেশ ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাবে, পরে এক-একটা পর্দা উঠে যাবে। ওপাশ থেকে আস্তে আস্তে আলো ফুটবে আর একটু একটু করে পদ্মবনে সরস্বতী ক্রমশ প্রকাশ

পাবে। তখন এরকম ইলেকট্রিক বাতি ছিল না; গ্যাস বাতি, কার্বন লাইটের ব্যবস্থা হল। ..... আমদের সাজসজ্জা তৈরি, কাবুলি ইজের পরা, কোথায়ও না গা দেখা যায়, একেবারে নতুন সাজ। লম্বা জোব্বা-টোব্বা পরে রবিকাকাও তৈরি, গলায় চেনে বেঁধে শঙ্খ ঝুলছে, শৃঙ্গাবাদন করে ডাকাত ডাকবেন। ...... পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি। ...... ঘোড়ার পিঠে আমাদের লুটের মাল বোঝাই করে দিনু স্টেজে এল।"[১১]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাব কল্পনার প্রতিফলন ঘটেছে। এর দৃশ্যপট, সাজসজ্জা সকলই উচ্চ প্রশংসিত। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'রবীন্দ্র স্মৃতি' গ্রন্থে এর গানেরও প্রশংসা করেছেন, বাল্মীকির সাজে রবীন্দ্রনাথ যখন তার সুকণ্ঠে তার সপ্তকে গাইতেন তখন রঙ্গমঞ্চে অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হত। এই নাটকের পোশাক ব্যবহারেও ছিল অভিনবত্বের ছাপ। বনবাসী বাল্মীকির পরনে লম্বা জোব্বা ও পায়ে চটিজুতো - ভাবনার এই নতুনত্বে দর্শক হিসাবে উপস্থিত বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ মুগ্ধ হন। অর্থাৎ প্রথম থেকেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন প্রথাগত পথ তাঁর বিচরণক্ষেত্র নয় —

"রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি তাঁর নিজস্ব ভাব পরিকল্পনায় রূপায়িত। অনেকটা নিজস্ব সত্তার প্রতিফলন, রূপসজ্জাতেও তিনি বনবাসী মুনি বাল্মীকির বেশবাস ও রূপসজ্জা গ্রহণ করেননি। তাই বাল্মীকির গায়ে জোব্বা ও পরনে চটি জুতো।"[১২]

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনীত অন্যান্য নাটকগুলি হল — 'কালমৃগয়া' (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৮২ / রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির ভূমিকায়), 'মায়ার খেলা' (৩০ ডিসেম্বর, ১৮৮২) ইত্যাদি। বিরজিতলার বাড়িতে অভিনীত হল — 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯/রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেবের ভূমিকায়), 'বিসর্জন' (১৮৯০ / রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায়) ইত্যাদি; এবং সংগীত সমাজে অভিনীত হল — 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭ / রবীন্দ্রনাথ কেদারের ভূমিকায়) ইত্যাদি।

এই পর্যায়ের অভিনয়ে আমরা দেখেছি ইউরোপের বাস্তববাদী (Realistic) প্রকৃতিবাদী (Naturelistic) দৃষ্টিভঙ্গির ছায়াপাত ঘটেছে। ইন্দিরাদেবীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' থেকে জানা যায়, এই সময় ঠাকুরবাড়ির মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে হ. চ. হ. অর্থাৎ হরিশচন্দ্র হালদার। তবে বিলিতি অনুকরণের সেই মঞ্চসজ্জা অতি নিকৃষ্টমানের। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ড ভ্রমণ করে আসেন। 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'-এ পেলাম শেক্সপিরীয় ভাবনার প্রতিফলন।

কাহিনি নির্মাণ, বিষয় বিন্যাস, চরিত্র সৃজন ইত্যাদিতে ছিল শেক্সপিরীয় কলাকৌশলের স্পষ্ট ছাপ। এর অভিনয়েও প্রকাশ পায় চরিত্রের পশ্চিমী রীতি প্রবৃত্তি, ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাত, আবেগের বলিষ্ঠতা, উত্তেজনার পূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, এই নাটকের দুর্ধর্ষ অভিনয় পদ্ধতি এমারেল্ড থিয়েটারের কলাকুশলী গোপনে এসে দেখে গিয়ে নিজেদের থিয়েটারে প্রয়োগ করেন —

> "আমাদের যখন 'রাজা ও রানী' অভিনয় হয় সে সময়ে একদিন কি করে পাবলিক অ্যাকট্রেসরা ভদ্রলোক সেজে অভিনয় দেখতে ঢুকে পড়ে। আমরা কেউ কিছু জানিনে। আমরা তো তখন সব ছোকরা, বুঝতেই পারিনি কিছু। তারা তো সব দেখেশুনে গেল। এখন পাবলিক স্টেজে 'রাজা ও রানী' অভিনয় করবে, আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। আমি তো গেছি, রানী সুমিত্রা স্টেজে এল, একেবারে মেজ জ্যাঠাইমা। গলার সুর, অভিনয়, সাজসজ্জা, ধরন-ধারন হুবহু মেজ জ্যাঠাইমাকে নকল করেছে। আমাদের আরও অনেকের নকল করেছিল। রবিকাকাদের নকল করতে পারবে কি করে। ছেলেদের পার্ট ততটা নিতে পারেনি, কিন্তু মেজ জ্যাঠাইমার সুমিত্রাকে যেন সশরীরে এনে বসিয়ে দিল।"[১৩]

'বিসর্জন' নাটক থেকে তাঁর মঞ্চভাবনায় মোড় ফিরতে শুরু করে। দৃশ্যপট, পোশাক, অভিনয় ইত্যাদি সমস্ত কিছুতে নতুন ভাবনার আমদানি ঘটতে শুরু করে। ধীরে ধীরে আঁকা সিন তুলে দেবার দিকে এগোলেন। 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি চরিত্রে অভিনয় তাঁর অভিনয় জীবনের একটা মাইলফলক স্বরূপ। কারোর মতে, এটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিনয় — হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ডতা, তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর, বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, ভাবপ্রকাশের অনায়াস দক্ষতা, মঞ্চে পদচারণা, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন বা স্বরক্ষেপণ ভাব অনুসারী অভিব্যক্তি তাঁকে এক মহান অভিনেতায় পরিণত করে তোলে। 'সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ও তাঁর 'অঙ্গবিন্যাস, স্বরবিন্যাস ও আবৃত্তিকৌশলের' ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শিশিরকুমারও তাঁকে 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা' রূপে অভিহিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও মঞ্চভাবনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় শান্তিনিকেতনে বসবাসের সময় থেকে। শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, তার দেখভাল, পরিচালনা ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম উপলক্ষে বিশ শতকের গোড়া থেকে তিনি অধিকাংশ সময় শান্তিনিকেতনে থাকতে শুরু করেন। এই সময় থেকেই তাঁর নাটক ও মঞ্চশৈলীতে এক স্বতন্ত্র ও ভিন্নমাত্রা সংযোজিত হল। পুরোনো পথ বা ধারা বর্জন করে আবিষ্কার করলেন একেবারে নিজস্ব পথ। নাট্যভাবনা, বিষয়, প্রযোজনা সমস্ত কিছুই পরিবর্তিত হতে থাকল —

> "প্রচলিত মঞ্চব্যবস্থাকে জেনে নিয়েই তিনিও শুরু করেছেন — কিন্তু অচিরেই

নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে চেয়েছেন এবং সে সব প্রযোজনায়, অবশ্যই নিজের লেখা নাটকের প্রযোজনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শান্তিনিকেতনের পর্বে 'বিসর্জন' নাটকের প্রযোজনায় তাঁকে নতুন রূপে দেখা দেবে। ইঙ্গিত, সংকেত, বাহুল্যবর্জন এবং সঠিক এক ছন্দোময় উপস্থাপনায় সেসব নাটক অন্য মাত্রা পাবে।"[১৪]

শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রা, পরিবেশ পরিস্থিতি, সুযোগ সুবিধা সমস্তই ছিল কলকাতার থেকে ভিন্ন ধরনের। সেখানকার বাস্তবকে স্বীকার করেই অনিবার্যভাবে নাটক ও মঞ্চভাবনা বিবর্তিত হল। পরিস্থিতির চাপে বদলে নিলেন নিজেকে। সেখানে মঞ্চ নেই, মঞ্চ নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সংগতি নেই, সাজপোশাক উপকরণের অভাব। অভিনেতা বলতে আশ্রমের বালক, শিক্ষক, তিনি স্বয়ং এবং কিছু সংখ্যক শুভানুধ্যায়ী। প্রথমাবস্থার তো বিদ্যালয়ে ছাত্রীও ছিল না অর্থাৎ নারী চরিত্রের জন্য স্ত্রীলোকও নেই। তবু দমে গেলেন না; সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে উন্মুক্ত করলেন পরীক্ষা নিরীক্ষার নতুন গবেষণাগার। অপর্যাপ্ত উপকরণ মঞ্চভাবনাকে করে তুলল অনাড়ম্বর, বাহুল্যবর্জিত। ব্যয়বহুল দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চবিন্যাস পরিত্যক্ত হয়ে এল ইঙ্গিতধর্মিতার প্রয়োগ। উদারমুক্ত পরিবেশে প্রকৃতিও যেন এক অলিখিত চরিত্র হয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল নাটককে —

> "শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালীন নাটক অভিনয় করতে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতিতে তাকে সাদামাটা এবং প্রায়শই খোলা মঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। উপকরণের অভাব, উদ্যোগের অভাব এবং দৃশ্যপট রচনা করায় কুশলী ব্যক্তিত্বের অভাব — তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করেছে। মঞ্চ নেই, মঞ্চ তৈরি করা কিংবা দৃশ্যসজ্জার মতো অর্থ নেই। কলকাতার মতো কোনো দিকের সুবিধেই নেই এখানে। তাই এই পর্বের নাট্য পরিকল্পনা, রচনা ও প্রযোজনা পরিবর্তিত হয়ে গেল। মঞ্চবাহুল্যহীন যাত্রাঙ্গিকের অভিনয়, আড়ম্বরহীন সাজসজ্জা, দৃশ্য পরিকল্পনা নেই, থাকলেও ইঙ্গিতবহ, বাস্তবানুযায়ী নয়। উন্মুক্ত পরিবেশে অভিনয়ের ফলে এইসব নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যেও প্রকৃতি যেন একটা ভূমিকা পালন করে চলেছে।"[১৫]

শান্তিনিকেতনের উদারমুক্ত অনাবিল প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরও যেন মানসমুক্তি ঘটল। কোনোরকম বাহ্যিক চাপের কাছে নতিস্বীকার নেই। নিজেকে নিয়োজিত করলেন নাট্য গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্রে। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উদ্‌গত সমস্ত ভাবনাকে উজাড় করে দিলেন সে পরীক্ষাগারে। নিঃশেষ করে দিলেন নিজের সমস্ত সঞ্চয়। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে রয়েছে এমনিই অভিনব তথ্য —

> "....... সেই সময় থেকেই বোধহয় ওর মনে মনে ছিল যে নিজেদের একটা কিছু করতে হবে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে রবিকাকা নিজের মনের মতো ফ্রি স্কোপ পেলেন। জমিজমা, পুরীর বাড়ি, এমনকি কাকিমার গায়ের গয়না বিক্রি করে শান্তিনিকেতনে সব ঢেলে দিয়ে কাজ শুরু করলেন।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য নাটক লিখলেও নাটক বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা খুবই কম। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিজের নাট্য ও থিয়েটার ভাবনাগুলিকেও একত্রিত করেননি। যাইহোক, এ পর্ব শুরু হওয়ার কাছাকাছি সময়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৩০৯ পৌষ সংখ্যায় তিনি 'রঙ্গমঞ্চ' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যেই তাঁর মঞ্চভাবনার চিত্রটা প্রতিফলিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন পর্বে আমরা দেখি তিনি দৃশ্যপটের গুরুত্ব ক্রমে কমিয়ে দিচ্ছেন। কারণ দৃশ্যপট অক্ষমতারই নামান্তর; তা দর্শকের কল্পনাশক্তিকেও খর্ব করে। এই প্রবন্ধে আমরা দেখি তিনি দৃশ্যপটের অনাবশ্যকতা বিষয়ে সোচ্চার —

> "..... নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন। তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকা মাত্র; আমার মতে, তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।"[১৭]

জীবনের প্রথম পর্বে তাঁর নাট্যভাবনায় ইউরোপের বাস্তববাদী মঞ্চসজ্জার প্রভাব পড়েছিল, এখানে এসে দেখি সেই ভাবনার বিরোধিতা। এই পর্বে বাস্তবের দাসত্ব করা দৃশ্যপটকে তাঁর 'ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ' মনে হল। তার অভাব প্রকৃত সমঝদারের কাছে কখনোই পীড়াদায়ক হয় না; দর্শক তার কল্পনায় সেই দৃশ্যপট নির্মাণ করে নেয় তার চিত্তপটে। কারণ 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে।' শুধু তাই নয়, ১৯ ভাদ্র ১৩৩৬, 'তপতী'র ভূমিকা লিখতে বসে তিনি দৃশ্যপটের উপর আরো খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। এখানে তিনি ওটাকে 'উপদ্রব' ও ' 'ছেলেমানুষি' বলে অভিহিত করলেন —

> "আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। ..... নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়; স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে।"[১৮]

শান্তিনিকেতনে প্রাথমিক পর্যায়ে আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিল না। তাই স্ত্রী

চরিত্রে পুরুষদের অভিনয়ের স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাই বলেছেন 'বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।' (পৃষ্ঠা-৭৮) এই সময়ে রচিত 'শারদোৎসব', 'মুকুট', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী' নাটকে কোনো স্ত্রী ভূমিকা নেই। আবার, কালক্রমে যখন আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সমাগম হতে থাকে, নাটকগুলিতেও নারী চরিত্রের আমদানি ঘটে। আবার এও দেখি শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে যে রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যপট বর্জন করেছেন, তিনিই যখন কলকাতায় এসে একই সময়ে অভিনয় করছেন, পরিস্থিতির চাপে সেখানে দৃশ্যপট মেনে নিচ্ছেন -

> "..... আবার পুরানো ভাবনায় ফিরে গিয়ে পরিস্থিতিগতভাবে দৃশ্যপট ব্যবহারের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। দেখছি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ যেখানে তিনিই শেষ কথা, সেখানে নিজের ভাবনার প্রতিফলন অতি সহজেই নাট্য প্রযোজনায় প্রয়োগ করতে পেরেছেন। কিন্তু কলকাতায় এসে, সেখানকার মানুষজন, নাট্য পরিবেশ এবং দর্শকমণ্ডলীর কথা ভেবে প্রচলিত নাট্য প্রয়োগের ধারায় দৃশ্যপট ব্যবহার করেছেন।"[১৪]

শান্তিনিকেতন পর্বে এসেই তাঁর নাট্যভাবনা ও মঞ্চপ্রয়োগ রীতিতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হল। পূর্ববর্তী কালে রোমান্টিক নাটক শেক্সপিয়র বা গ্রিক আদর্শের ট্রাজেডি, কাব্য নাট্য বা নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য, রঙ্গপ্রধান প্রহসন বা কমেডি জাতীয় নাটকই লিখেছেন। এই পর্যায় থেকে রচিত নাটকগুলি রূপক ও সংকেতের আবরণ পরিধান করল। বস্তুসত্য অপেক্ষা ভাবসত্য প্রাধান্য পেল। বহির্বাস্তব (Surface / outer reality) থেকে অন্তর্বাস্তবের (Inner reality) দিকে ধাবিত হল বিষয়বস্তু। কাহিনি, চরিত্র, ঘটনার প্রত্যক্ষরূপ গৌণ হয়ে প্রাধান্য পেল দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিতময়তা। প্রথাগত অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজন বর্জিত হল; রচিত হল দৃশ্যের পর দৃশ্য। ফলে বাংলা নাটকে বাস্তবতার স্থূল, ক্লান্ত পথ পরিক্রমা শেষ হল। বক্তব্যও পেল আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া। পুরাণ, ইতিহাসের পানসে স্বাদের বাংলা নাটকে এল ধনতান্ত্রিক সমস্যা, যন্ত্র ও মানুষের সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সর্বহারার সংগ্রাম ইত্যাদি। ত্রিশ বছরের অধিক অনলস, নিবিড় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পৌঁছলেন নিজস্ব নাট্যশৈলীর কাঙ্ক্ষিত ভুবনে। 'শারদোৎসব' (১৯০৮) থেকে যে অন্বেষণের সূত্রপাত, 'রাজা'-য় ঘটল তারই স্বীকৃতি। নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কথায় বলা যায় —

> "রবীন্দ্র নাটকের পালাপদল ঘটল তাঁর উত্তরপর্বের নাটকে। 'শারদোৎসব' নাটকে তাঁর সুচনার সঙ্কেত এবং 'রাজা' থেকে 'রক্তকরবী' হয়ে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত তার

বিস্তার। এসব নাটকে তিনি তাঁর নিজস্ব নাট্যভূমিতে বিচরণ করেছেন; নিজস্ব রীতি এবং নাট্যভাবনায় তিনি স্বতন্ত্র হয়ে উঠলেন এবং বিশ্বের একজন অন্যতম শক্তিমান নাট্যকারের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন। এই পর্যায়ের নাটকগুলি এক অভিনব নির্মাণ। এ ধরনের নাটকের সঙ্গে তাঁর সময়ের বা পূর্ববর্তী নাট্যরচনার কোনো সাদৃশ্য নেই, সমকালীন বিশ্ব নাটকের সঙ্গেও কোনো মিল নেই, এমনকি ২৯ বছর ধরে এর আগে তিনি যে নাটকগুলি লিখেছেন, তার সঙ্গেও তুল্যতা চলে না। তাঁর নাটক হয়ে উঠল প্রতীকী এবং বিমূর্ত প্রকাশে ব্যঞ্জনাময়। ফলে বাংলা নাটকে বাস্তবতা অনুসরণের প্রথায় ভাঙন ধরল। বিষয়বস্তুর বাইরেটা নয়, ভিতরের সত্য চিত্রায়িত হল তাঁর রচনায়। 'সারফেস রিয়ালিটি' পরিহার করে 'ইনার রিয়ালিটি' প্রকাশিত হল চরিত্র, ঘটনা এবং ভাববস্তুর বিন্যাসে। পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রথা ভেঙে দৃশ্যবিন্যাসে এল নতুন নতুন পরীক্ষা। এই প্রথম বাংলা নাটকের বিষয়বস্তুতে এল বিশ্ব সংকটের কথা। 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'কালের যাত্রা' নাটকের মধ্যে ধর্মীয় অন্ধ কুসংস্কার, মনুষ্যত্ববিরোধী যন্ত্রশক্তি, ধনশক্তির বৈনাশিক আধিপত্য, সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে উপেক্ষিত সর্বহারাদের আমন্ত্রণ ইত্যাদি সমস্যা ও তার থেকে মুক্তির বার্তা উচ্চারিত হল। বিষয় ও প্রকাশের গরিমায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে ঘরে বাইরে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় চিহ্নিত করলেন।"[২০]

যে ইঙ্গিতময়তা বা ব্যঞ্জনাধর্মিতা রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ের নাটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, মঞ্চভাবনায়ও রয়েছে তার বহু নিদর্শন। আর এই সকল নাটকের প্রধান ঘটনাস্থল পথঘাট, মাঠপ্রান্তর, প্রাঙ্গণ অর্থাৎ চার দেওয়ালের ভিতরে নয়। তাই উদারমুক্ত, উদাত্ত প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে ইঙ্গিতময়তা যেন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ভাবরাজ্য আরও নিখুঁতভাবে উদ্ভাসিত হল। যেমন 'ফাল্গুনী' নাটকে - নীলরঙের পর্দায় সবুজের আভা; রাস্তা দিয়ে পথিকের যাতায়াত; অন্ধ বাউলের পাখির মতো নাচতে নাচতে একতারা হাতে মঞ্চের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে যাওয়া; 'নদী আপন বেগে' গানের সময় দুজন বালকের দুপাশে দাঁড়িয়ে একটি নীল কাপড়কে ঢেউয়ের মতো নাড়ানো ইত্যাদি। 'ডাকঘর' নাটকের বাবুই পাখির বাসা; 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে খোলা দরজার এপাশে ফুলের সম্ভার; 'নটীর পূজা' নাটকে বুদ্ধ-স্তব করতে করতে গমন ইত্যাদি।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলেছে তাঁর থিয়েটার ভাবনার তৃতীয় পর্ব। এই পর্যায় ছিল মিশ্র অর্থাৎ শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় দু জায়গাতেই এই পর্বে অভিনয় সংঘটিত হয়েছে। এই পর্বেও তিনি ইঙ্গিতধর্মিতার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। বাহুল্যহীন মঞ্চসজ্জাতেও ফুটিয়ে তোলা হত ইঙ্গিতধর্মিতা। বাস্তব অনুকরণের বিরুদ্ধে দেখা দিল এক তীব্র অনীহা। সংস্কৃত নাটকের মতো তাঁর নাটকেও প্রাধান্য পেল ভাব বা অনুভবের অভিব্যক্তি; প্রত্যক্ষ ঘটনা সংঘাত অপেক্ষা রসের অবতারণা। অর্থাৎ বাস্তববাদ বা প্রকৃতিবাদের তুলনায়

ভাববাদের ওপরই তাঁর অধিক আস্থা স্থাপিত হল। বাস্তব একেবারে বর্জিত না হয়ে বাস্তবের মধ্যেই এল বাস্তবাতীতের ইঙ্গিত, বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে একটা বোঝাপড়া রচিত হল। ভাষা, সংলাপেও লাগলো ব্যঞ্জনার ছোঁয়া —

> "বাস্তব পরিমণ্ডলের জায়গায় নাটকে এসেছে ব্যঞ্জনা, মানসিকতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে প্রতীকের বিচ্ছুরণ, ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে নির্বিশেষ। নাটকে কাহিনি বড়ো কথা নয়, কাহিনি আশ্রয় করে বড়ো হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত দিব্যদৃষ্টি বা সত্যোপলব্ধি। আসবাববিরল পটহীন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় মানুষের অন্তর্জীবনের গূঢ়নাট্য। দেশ ও কাল অপসৃত হয়েছে যেমন, বিশেষ দেশ নেই পটভূমি হিসেবে, নেই অতীত থেকে ভবিষ্যতে বিন্যস্ত সময়, তেমনি নেই নিতান্ত প্রাকৃতিক হয়ে প্রকৃতি, নিতান্ত মানবিক হয়ে নরনারী। ভাষায় এসেছে অপূর্ব বর্তমান প্রতীকী প্রভা। আপাতত শুনতে যা সাধারণ কথা, তারই মধ্যে বেজে ওঠে অসামান্যের অনুরণন।"[২১]

এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, সমকালে পাশ্চাত্যেও বাস্তববাদ বা প্রকৃতিবাদ বা যথাস্থিতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সাহিত্য শিল্পে সাংকেতিকতার আবির্ভাব ঘটে। এই সময় সেখানে মেটারলিংক, স্ট্রিন্ডবার্গ, ইয়েটস, চেকভ, ইবসেন, প্রমুখ নাট্যকারদের লেখায়ও বাস্তবাতীত বর্ণনা, নির্বস্তুক ব্যাপার, রূপক, সংকেত, ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত ইত্যাদির প্রাধান্য দেখা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এমন কথা বলা যায় না।

যাইহোক এই সময়কালের বিখ্যাত অভিনয়গুলো হল - 'অচলায়তন' (১৯১৪ / রবীন্দ্রনাথ আদীনপুণ্য ভূমিকায়), 'ফাল্গুনী' (১৯১৫, ৪ঠা এপ্রিল / রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউল), 'ডাকঘর' (১৯১৭ / রবান্দ্রনাথ ঠাকুরদা), 'তপতী' (১৯২৯ / রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেব) ইত্যাদি। শান্তিনিকেতনে শেষবারের মতো তিনি অভিনয় করেন 'শারদোৎসব' নাটকে (১৯৩৫ / সন্ন্যাসী চরিত্রে) এবং কলকাতা তথা জীবনের শেষ অভিনয় 'অরূপরতন' নাটকে রাজার ভূমিকায়। এই পর্বের শেষ দিকে দেখি সংলাপ বা বাক্যের ওপর আর আস্থা না রাখতে পেরে ভাবের প্রকাশে নৃত্যাঙ্গিকের দিকে ঝোঁকেন।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যাদর্শ, মঞ্চভাবনা শেষ পর্যায়ে এসেই একটা সুস্পষ্ট বাঁক নিল। তাঁর মঞ্চচেতনার বিবর্তনের একেবারে শেষধাপেই আমরা পেলাম অসাধারণ কতকগুলি নৃত্যনাট্য। অভিনয় ও নাট্য প্রযোজনার একেবারে অন্তিমলগ্নে এসে রবীন্দ্রনাথ যেন আর বাক্যের ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হল, বাক্য যেন মানুষের অন্তর্গত নিবিড় ভাবকে যথাযথ রূপ দিতে পারছে না। ফলস্বরূপ শেষ বয়সে সংলাপ নির্ভর নাট্যরচনার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেললেন। আর এভাবেই

সংলাপক্লান্ত নাট্যকার, ভাব প্রকাশে বাক্যের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য শেষ পর্যন্ত দ্বারস্থ হলেন নৃত্যনাট্যের। বাক্যের সৃষ্টির ওপর তাঁর অনাস্থা বা সংশয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ একদা অমিয় চক্রবর্তীকে একটা চিঠিতে (১৪.২.৩৯) জানিয়েও দিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বাঙালি তার একটা নিজস্ব নৃত্যশৈলীরও সন্ধান পেল —

> "...... বাচিক অভিনয়ের আর বিশেষ গুরুত্ব রইল না, ভাবের অভিব্যক্তি আর আঙ্গিক অভিনয়ের বদলে এল নাচ — তাল, লয় আর অঙ্গ ভঙ্গিমার প্রাক-পরিকল্পনায় বাঁধা। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন এক নতুন আঙ্গিক — নৃত্যনাট্য। 'নটরাজ' আর 'ঋতুরঙ্গ' দিয়ে যার শুরু আর 'শাপমোচন', 'চিত্রাঙ্গদা' পেরিয়ে 'চণ্ডালিকা' আর 'শ্যামা'-তে যার পরিণতি। বাংলাদেশ জুড়ে নানান অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ লোকনৃত্যের প্রচলন থাকলেও বাঙালির কোনো নিজস্ব ঘরানার নাচ ছিল না। নৃত্যনাটের মাধ্যমে বাঙালি যেন এক নতুন নৃত্যাঙ্গিক খুঁজে পেল। পরে উদয়শংকর থেকে শুরু করে আরও অনেক নৃত্য প্রতিভা এটিকে ফুলে ফলে পল্লবিত করে তুললেন। নাট্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এইটাই রবীন্দ্রনাথের এক সুপরিণত অবদান।"[২২]

থিয়েটার জীবনের গোড়া থেকেই তাঁর নাচের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় সেখানকার ব্যালে, বলনাচ ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসার পর। সেসময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'মানময়ী' নাটকের জন্য 'আয় তবে সহচরী' গানটি লিখে দেন এবং বিদেশি নৃত্যশৈলীতে তা পরিবেশন করান। ক্রমে স্বরচিত বিভিন্ন নাটকে নৃত্য সংযোজন করেন এবং নিজেও নৃত্যে অংশ নেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' ইত্যাদিতে রয়েছে ব্যালে বা অপেরাধর্মী নৃত্য পরিবেশন। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'ফাল্গুনী', 'বসন্ত' ইত্যাদি নাটকে তিনিও নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। ক্রমে নৃত্য এবং নাটক ও থিয়েটারে নৃত্য প্রয়োগ বিষয়ে সুনিবিড় ভাবনা চিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার সূত্রপাত ঘটে। ধীরে ধীরে জ্ঞানলাভ করতে থাকেন দেশ-বিদেশের নানা নৃত্যাঙ্গিকের নব নব ধারার সঙ্গে। বাদ যায় না আমাদের লোকনৃত্যের ধারাটিও। উপেক্ষিত লোকনৃত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার খনন করে তুলে আনলেন অসংখ্য মণিমাণিক্য। তবে কোথাও প্রথার ডোবায় আটকে থাকলেন না। বিচিত্র ধারা, আঙ্গিক, কলাকৌশল আত্মস্থ করে প্রয়োগ করলেন নিজের নাটকের বিষয়, দর্শক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের উপযোগী করে। 'নিয়মবদ্ধ সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য ও অনুভূতিহীন অঙ্গচালনায়' তিনি কখনোই আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল নাচ, গান ও নাটকের সুসমন্বয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও রসের উৎসার ঘটানো। জনৈক

সমালোচকের কথায় —

> "একথাটি মনে রাখতে হবে যে কবি কিন্তু কোনো একটি নৃত্যশৈলীকে আঁকড়ে ধরে থাকেননি। যে নৃত্যভঙ্গি ও ছন্দ তাঁর ভাষা ও অনুভূতি ব্যক্ত করাতে সমর্থ হয়েছিল উনি প্রধানত শোভা ও সৌষ্ঠবের দিকে লক্ষ্য রেখে সেইভাবে নৃত্যরূপ স্থির করেছিলেন শিল্পী ও দর্শকদের জন্য। তিনি বর্জন করেছিলেন বিধিবদ্ধ আঙ্গিকের প্রয়োগ। যদিও তিনি ছাত্র ও ছাত্রীদের বিধিবদ্ধ আঙ্গিকাভিনয়ে শিক্ষায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি ভিত্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে। বাঁধা চলনে ও বলনে নিরুৎসাহ করেছিলেন শিল্পীদের।"[২৩]

কালক্রমে মণিপুর, কেরালা, উড়িষ্যা, সিংহল, জাভা, বালিদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের নৃত্যের সঙ্গো তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ঘটে। কখনো নিজে সশরীরে ওই সকল স্থানে গিয়ে শিল্পীদের সঙ্গো পরিচিত হয়েছেন, শিক্ষা করেছেন উদ্দিষ্ট নৃত্যের নানা কলাকৌশলে; কখনো আবার আত্মীয়স্বজন, ছাত্র, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীদের প্রেরণ করেছেন তা রপ্ত করার জন্য। আবার কখনো ওই সকল নৃত্যের অভিজ্ঞ শিক্ষক, শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে এনেছেন শান্তিনিকেতনে। শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের। এইভাবে মণিপুরী, কথক, ভরতনাট্যম্, কথাকলি, সিংহলি ইত্যাদি নৃত্যের প্রচলন ঘটে আশ্রমের শিক্ষা ব্যবস্থায়। শান্তিদেব ঘোষ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ শ্রীমতী ঠাকুর প্রমুখ হলেন এই প্রচেষ্টারই উৎকৃষ্ট ফসল।

এদের মধ্যে মণিপুরী ও কথাকলিই রবীন্দ্রনাথকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করেছিল। মণিপুরী নাচের কোমল ও ললিত ভঙ্গিমা এবং কথাকলির সাবলীল ও উদ্ধত ভঙ্গিমায় তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রধানত এই দুটি নাচের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি। থিয়েটারে নিখুঁত প্রয়োগের জন্য প্রত্যেকটি নাচের তাল, লয়, বোল, দেহ ছন্দ, হস্তমুদ্রা, পদ সঞ্চালন, কোমল-ললিত কিংবা পুরুষালি ভঙ্গিমা, চোখের ভাষা ইত্যাদির উপর সর্বদাই থাকত তাঁর সজাগ দৃষ্টি। নাটক ও থিয়েটারের হাত ধরে এভাবেই তিনি বঙ্গাসংস্কৃতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন —

> "কবিগুরুর ভারতীয় নৃত্যধারায় বিশেষ অবদান একটি মৌলিক নতুন ধারার সৃষ্টি। বহু শত বছর পরে এই নতুন সৃষ্টি সর্বপ্রথম একটি আধুনিকতার দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। প্রথমত উনি হৃতপ্রায় ভারতীয় মার্গ নৃত্যধারা পুনরুজ্জীবিত করে ভারতীয় কৃষ্টিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। এরপর তাঁর নিজস্ব অভিনব সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় বিদেশি ব্যালে, অপেরা ও আধুনিক নৃত্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় নৃত্য এবং ভারতীয় মার্গ ও দেশি নৃত্যের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত মণিপুরীর ললিত ও কথাকলির উদ্ধত এবং দেশীয় নৃত্যের সম্মিলিত ছন্দবহুল নৃত্য রবীন্দ্রনৃত্যের ক্রমবিকাশে সহায়তা করেছে।"[২৪]

নাচ সম্পর্কে তাঁর এই বিপুল আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক্রমে তাঁর নাটক ও থিয়েটার ভাবনাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ গানের স্কুলের পাশাপাশি নাচের স্কুলও গড়ে উঠতে থাকল শান্তিনিকেতনে। নিযুক্ত হল উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা। ক্রমে ছাত্রীদের আগমন ঘটতে থাকল। নাটকগুলিতেও নারীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। কতকগুলিতে পুরুষ চরিত্রই নেই। 'নটীর পূজা', 'তাসের দেশ', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শাপমোচন' ইত্যাদি নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্র মঞ্চভাবনার এক অনন্য স্মারক। নাচ, গান ও নাটকের এক অপূর্ব ত্রিবেণী সংগম হয়ে উঠেছে এগুলি। সূক্ষ্মরুচি, আভিজাত্য, মর্যাদা, সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টিতে তা আজও দেদীপ্যমান। যদিও এই ধারার বিশেষ অনুসরণ পরবর্তীকালে লক্ষিত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন জাতীয় বা দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পারিবারিক সূত্রেই এই গুণ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা কিংবা জোড়াসাঁকো থিয়েটারে 'নবনাটক'-এর অভিনয়ের সময়কাল থেকে আমরা ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যপ্রীতির প্রমাণ পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথে এসে তা যেন তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করে। আর এর প্রতিফলন আমরা তাঁর থিয়েটার ভাবনাতেও দেখি যখন তিনি আমাদের দেশীয় যাত্রার প্রতি আগ্রহী হন। চিত্রিত দৃশ্যপট, তার বাহুল্য ও কৃত্রিমতার প্রতি তাঁর অনীহার কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। তাঁর মতে, দৃশ্যপট অভিনেতা-অভিনেত্রীর অক্ষমতারই স্মারক। কিন্তু দেশীয় যাত্রায় বিলাতি থিয়েটারের মতো কৃত্রিম, অনাবশ্যক দৃশ্যপটের অত্যাচার নেই; নটনটী ও দর্শক সেখানে একই সমতলে অবস্থান করেন। আসরের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সেখানে উচ্চগ্রামের অভিনয় সুসম্পন্ন হয়। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তাই যাত্রার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা সরাসরি স্বীকার করেছেন -- 'আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকুল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।' (পৃষ্ঠা - ৭৫)। মঞ্চ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার নিদর্শন স্বরূপ তিনি তাঁর 'তপতী' নাটকটা সম্পূর্ণ আভরণহীন মঞ্চে উপস্থাপিত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে ১৯ ভাদ্র, ১৩৩৬, 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় তাঁর এই মত প্রকাশে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি --

> "আমাদের দেশে চির প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার

কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে।"[২৫]

দেশের জনসধারণের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চায় প্রাচীন এই লোকজ নাট্যকলার অপরিসীম ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেই তিনি যাত্রার পুনর্জাগরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন দেশজ শিক্ষা, সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র বিদেশি শিল্প, সংস্কৃতি শিক্ষাচর্চার দ্বারা আমজনতার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। দেশীয় শিল্পকলার মূল দেশের মাটির গভীরে প্রোথিত। দেশের জল-হাওয়া-মাটি থেকে রস নিয়েই তাঁর বেঁচে থাকা। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ দেশজ নাট্য কলার প্রতি এত যত্নবান ছিলেন। বিদেশি থিয়েটারকে দেশীয় যাত্রার দ্বারা মার্জিত করে নিয়েছিলেন —

> "মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রভাবপুষ্ট ইংরাজি শিক্ষাচর্চার প্রতি আকর্ষণ উপেক্ষা করে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির অনুকরণে দেশজ লোকশিক্ষার মাধ্যমে, তথা যাত্রা ও কথকতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। যাত্রা বিষয়ে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন তা তার কাছে সাধারণ ঐতিহ্যবিলাস মাত্র ছিল না, তার মূল ছিল আরও গভীরে। নিজের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যে অভিনবত্ব সম্পাদন করার প্রয়াসী হয়েছিলেন, তার জোর তিনি অর্জন করেছিলেন এই দেশজ নাট্যকলার প্রতি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধা থেকে।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন জাতির নাড়ির যোগ না থাকলে কোনো কলাবিদ্যাই জনসাধারণের কাছে চিরস্থায়ী শ্রদ্ধার আসন পায় না; জাতির সঙ্গে আত্মিক যোগ না থাকলে তার আকর্ষণী ক্ষমতাও দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। সেইজন্য তিনি দেশজ নাট্যকলা বা যাত্রার প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুধু আকৃষ্টই হলেন না, তার সমস্ত মালিন্য, বাহুল্য, বিকৃতিকে বর্জন করে তাকে করে তুললেন যুগোপযোগী। খনি থেকে আকরিক তুলে নানা প্রক্রিয়ায় শোধন করে তাকে বহুমূল্য অলংকারে পরিণত করার মতো তিনি লোকজ যাত্রারীতিকে পরিশুদ্ধ করে নিজের থিয়েটার ভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে নিলেন। প্রকৃতপক্ষে দেশজ নাট্যকলার তিনিই ছিলেন যথার্থ উদ্ধারকর্তা —

> "রবীন্দ্রনাথই দেশীয় রীতির যথার্থ উদ্ধারকর্তা। রবীন্দ্রনাথ যাত্রার সারসত্তাকে আত্মসাৎ করলেন, তার স্থূলতাকে নয়, তার বিকৃতিকে নয়। দেশীয় আঙ্গিক তিনি ব্যবহার করলেন, তার অধোগতিকে এড়িয়ে। এইভাবে ঐতিহ্যই তাঁর হাতে হয়ে উঠল আধুনিক।"[২৭]

একজন মহান শিল্পীর হাতে এমনি করেই একটা দেশীয় শিল্পকলা কালের অতলে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল। তিনি শুধু তার পুনরুদ্ধারই করলেন না, তাকে আধুনিকও করে তুললেন। তাঁর থিয়েটারের পরীক্ষা নিরীক্ষায় নৃত্যাঙ্গিকের পাশাপাশি

আমন্ত্রিত হল যাত্রারীতিও। এছাড়া সিংহলি ক্যান্ডিনাচ, জাপানি নোওকাবুকি নাট্য, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত থিয়েটার, মেয়ার হোলদ, ব্রেশট প্রমুখের আধুনিক ইউরোপীয় থিয়েটার ইত্যাদির ছোঁয়াও লেগেছে তাঁর মঞ্চকলায়। সবকিছুকে আত্মসাৎ করেই যেন গড়ে উঠেছে তাঁর অভিনব মঞ্চপ্রতিমা। এইজন্য তাঁর থিয়েটারকে অনেকেই বলেন 'Experimental Theatre', কেউ বলেন 'Reportory Theatre' , কারোর মতে 'The Other Theatre'. আবার কারোর মতে, 'Parallel Theatre'. অনেক প্রভাব স্বীকার করেও তা যেন একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিপ্রতীপে এক অভিনব, প্রতিস্পর্ধী থিয়েটার —

> "............ শুধু নাটকে নয়, নাট্যপ্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য অনুসারী থিয়েটার থেকে সরে এসে একটা মুক্ত আশ্রয় খুঁজছিলেন দেশি যাত্রা, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র, ভারতীয় নৃত্যকলা, জাপানের নোওকাবুকি নাট্য, সিংহলের ক্যান্ডি নাচ এই সবের মধ্যে। 'শারদোৎসব' ও তার পরে রচিত অধিকাংশ নাটকে নাট্যক্রিয়া ঘটছে মুক্ত জায়গায় — মাঠ, ঘাট, পথ, প্রাঙ্গণ ইত্যাদি। যেন 'বাহির'টাই মঞ্চে উঠে এল ঘরটা চলে গেল নেপথ্যে। এই পর্বের নাটকে খেলা, মেলা, উৎসব এই শব্দগুলো বারে বারে ব্যবহৃত হচ্ছে এক বৈচিত্র্যময় গভীরতায়। যেন অভিনয় কলাকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন — প্রসেনিয়ামের চার কাঠির মধ্যে এই বৃহৎকে তুমি কি করে ধরবে ধরো।"[২৮]

দেশীয় নাট্যকলা বা যাত্রারীতিকে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ছিলেন কৃত্রিমতার বিরোধী। অভিনয়কে সমস্ত প্রকার কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার দুঃসাহসিক কাজেই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর মতে 'কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।' তাই বিলাতের অন্ধ অনুকরণে নিজের থিয়েটারকে তিনি কখনোই 'ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ' করে তুলতে চাননি। তাকে করে তুলেছেন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। কারণ তাঁর মতে, 'জটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়।' আয়োজনের ভারে ভিতরের সারবস্তু কখনোই চাপা পড়ে যায় না সেখানে। সমস্ত রকম অতিবাস্তবতা বা অতিরঞ্জন বর্জন করে অভিনেতার সৃজনশক্তি আর দর্শকের কল্পনা শক্তির ওপর আস্থা রেখেছেন। রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য অমিতা ঠাকুরের কথায় —

> "মঞ্চকে নানা সাজসজ্জা দিয়ে ভারাক্রান্ত করা বা দৃশ্য পরিবর্তন করা পছন্দ করতেন না — বার বার ড্রপসিন তোলা ও ফেলা একেবারেই চলত না — পাত্রপাত্রীদের সাজপোশাকে গতানুগতিকতা চলত না; কোনো ঝকমকে সাজপোশাক বা ঝকমকে মুকুট বা গহনা মাথায় দিতে দিতেন না, মুখের ভাব ঢাকা পড়ে না যায় তার দ্যুতিতে, এইজন্যে।"[২৯]

জীবিতকালে তাঁর ইচ্ছানুসারে এমনিভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর নাটক।

তবে পাত্রপাত্রীদের পোশাক আশাক, সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি সম্পর্কে ভাবীকালের জন্য কোনো কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। সেখানে আগামী দিনের শিল্পীদের হাতে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া আছে। আর একটা কথাও এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, এই বাহুল্যবর্জন শুধু তাঁর রঙ্গমঞ্চ ভাবনায়ই নয়, তাঁর সমস্ত জীবনযাপন, চিন্তাচেতনা, শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মাচরণ সর্বত্রই প্রতিফলিত। কোনোরকম উৎকট, বিসদৃশ উপায়ে নয়, সুন্দরের পরিশীলিত, রুচিশীল সংযত ও পরিমিত প্রকাশেই তিনি ছিলেন আজীবন যত্নবান। আর এখানেই ছিল তাঁর থিয়েটার ভাবনার অভিনবত্ব। তিনি চেয়েছিলেন নাট্যচর্চাই হয়ে উঠুক আশ্রমিকদের জীবনচর্চা; শুধুমাত্র অবসর বিনোদন, মনোরঞ্জন ও সুখবিলাসেই তা থেমে না যায়। তাই তার মঞ্চপ্রতিমা শুধুমাত্র বিমূর্ত ভাবের প্রতিমা হয়েই থাকেনি —

> "শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সকলের জীবনে নাট্যচর্চা হয়ে উঠুক তাদের অন্যতম জীবনচর্চা, এটা তিনি চেয়েছিলেন — চেয়েছিলেন নাচে-গানে-পাঠে অভিনয়ে সকলেরই থাকুক একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চপ্রতিমা তাই মাটির প্রতিমা নয়। চালচিত্র সমেত একটা আদ্যন্ত জীবনের প্রতিমা।"[৩০]

শুধু আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের কাছেই নয়, অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের জীবন সম্পর্কিত মহান ভাবনা সাধারণ দর্শকেরও স্পর্শ করে যেত। তাদেরও ভাবনার বৃত্তেও আলোড়ন উঠত। প্রতিমা দেবী 'ফাল্গুনী' নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে লেখেন, গুরুদেবের লেখনি যেমন abstract idea-র মধ্যে ক্রমবিকাশ লাভ করল, তেমনি রঙ্গামঞ্চের আঙ্গিক বাইরের দিক পরিত্যাগ করে মনের গভীরতম ভাবরাজ্যে কাব্যলোক সৃষ্টি করার উপযোগী সহায় হল। শম্ভু মিত্র কর্তৃক অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের অভিনয়ে রানি সুদর্শনার আত্মোপলব্ধি কীভাবে মঞ্চস্থ সকল দর্শককে প্রভাবিত করত তার অপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন শাঁওলী মিত্র তাঁর 'রবীন্দ্র নাটক ও শম্ভু মিত্র' প্রবন্ধে —

> "'রাজা'-র সম্পাদনা তো এই নাট্যকর্মীর কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় এক দৃষ্টান্ত। এই সম্পাদনায় সুদর্শনার রাজা এক অ-বাস্তব অস্তিত্ব হয়ে থাকেননি। তিনি সত্যি সত্যি মিশে ছিলেন সমস্ত সাধারণের সঙ্গে। তার রাজত্বে সবাই রাজা। রাজার কুঞ্জবনের দক্ষিণ হাওয়ার উৎসবে তাই কারোর প্রবেশেরই কোনো বাধা নেই। সেই সত্যেই নাটকের রানি সুদর্শনার যাত্রা প্রতিটি মানুষের আত্মোপলব্ধির যাত্রা হয়ে উঠেছিল, ঈশ্বর বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকেনি।"[৩১]

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারের দর্শক সম্পর্কেও এক উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি চাইতেন, দর্শকরা তাদের আবেগ, অনুভব, উপলব্ধির সমস্ত দুয়ার খুলে বসেই অভিনয় দেখুক। কল্পনায় নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করুক; মঞ্চ

বাস্তবতার বহু অভাব নিজের কল্পনায় পূর্ণ করে নিক। অনুভূতির রাজ্যে দেউলিয়া দর্শকের, তাঁর মতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার পাওয়া উচিত নয়। পূর্বোক্ত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে বলেছেন, '... যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানা কড়াও নাই। বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়ে নির্ভর করিবার জো নাই। যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল দাম দিলেও এমন সকল লোককে টিকিট বেচিতে নাই। এ তো আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নয় যে প্রত্যেক কথাটাকে হলফ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য, আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছেন, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন। তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বুঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপসের সম্বন্ধ।' (পৃষ্ঠা-৭৫)।

তবু সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের শিল্পচেতনার অভাব তাকে ভীষণভাবে পীড়িত করেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিলাতি থিয়েটারের অনুকরণে দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা, সাজপোশাক ইত্যাদির বাহুল্য সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে নিছক মনোরঞ্জনের জন্য আগত এই সকল স্থূল রুচির দর্শকদের চাহিদার কাছে মঞ্চমালিকরা আত্মসমর্পণ করে বসেন। নাট্যকলা নিয়ে উন্নত, রুচিশীল, সংস্কৃতিমনস্ক, মননশীল কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই সকল থিয়েটারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল না। এই রঙ্গালয়গুলি সম্পর্কে তাই রবীন্দ্রনাথ 'নাচঘর' পত্রিকায় ৩ জুন, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে লেখেন 'যার মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে তার কাছে সাধারণ রঙ্গালয় অগম্য।'

রবীন্দ্রনাথ নিজের থিয়েটারকে কখনোই এতটা অধোগামী করেননি। মনন ও রুচির একটা ন্যূনতম সীমা সর্বদাই রক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ। তাই সাধারণ দর্শকের মোটা রুচি ও চাহিদার কাছে নত মস্তক হয়ে নাট্যকলাকে কখনোই এক অগভীর, স্থূল, জন মনোরঞ্জন বিষয়ে পর্যবসিত করেননি। সস্তা জনপ্রিয়তার স্রোতে তাকে ভাসিয়ে দেননি। প্রথাগত থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর ব্যতিক্রমী, সমান্তরাল থিয়েটারের প্রভেদ এখানেই —

> "সাধারণ রঙ্গালয়ের আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট কখনোই এক বিন্দুতে এসে মেলেনি। বিশেষত সমকালীন দর্শক রুচির কাছে রবীন্দ্র মননের গভীরতা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও কাব্যরস ছিল অনধিগম্য। তাছাড়া যে যুগসংকট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জগতে আশংকার ছায়া বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে তখনকার সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত ছিলেন মূলত্য অজ্ঞ ও নিস্পৃহ। অথচ সমকালীন বাংলা নাট্য সাহিত্যের

মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্র নাটকেই তার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু বাঙালি দর্শকের কাছে তা বিশেষ কোনো আবেদন জাগাতে সক্ষম হয়নি।''[৩২]

আধুনিক ভারতীয় নাট্যকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম থিয়েটারে দর্শকদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হন। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর মতো মঞ্চের কাঠগড়ায় অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করে যাবেন আর দর্শক বিচারকের আসনে বসে থাকবেন — এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আধুনিক ইউরোপীয় প্রয়োগকর্তাদের মতো তিনিও সোচ্চার হয়েছিলেন। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে দূরত্ব ঘোচাবার জন্য তিনিও সরব হয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র ভাবাদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মতে —

> ''আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের মতো আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মতো অভিনয় করবে — এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে যে বেড়া সেকালের যাত্রায়, গ্রিক ট্রাজেডির অভিনয়ে, এমনকি শেক্সপিয়ারের থিয়েটারে ছিল না, যে বেড়া তুলে দেবার জন্য বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুজন প্রয়োগাচার্য (মায়ার হোল ও রাইনহার্ট) চেষ্টা করে আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন, সেই বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও নিজস্ব দল নিয়ে দু'একবার করেছেন।''[৩৩]

বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের দুর্ভাগ্য, সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল না। থিয়েটার নিয়ে এরকম নানা দুঃসাহসিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য তিনি কোনো স্পেস পেলেন না যাতে থিয়েটারের নাট্য প্রয়োগ ভাবনার নানা সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে যেতে পারে। যে বন্ধন অসহিষ্ণু, মুক্তিপিয়াসী মন নিয়ে সর্বপ্রকার প্রথাগত পথ পরিহার করে নাট্য রচনার ধারা শুরু করেছিলেন তিনি, মঞ্চ প্রয়োগের স্বর্ণশিখর তা স্পর্শ করতে পারল না। অর্থলিপ্সু মঞ্চমালিক, মাঝারি মানের নাট্যকার, অপরিণামদর্শী প্রয়োগকর্তা স্থূলরুচির দর্শক প্রভৃতি সকলেই সে আসর ভিড় করেছিল। তাদের দাপাদাপি, হৈ-হুল্লোড়, আস্ফালন, ঘোমটার তলায় খেমটা নাচের সস্তার বিনোদনের মধ্যে দিয়ে নাট্যকলা তখন এক অগভীর খাদের মধ্য দিয়ে চলছিল; স্তব্ধ হয়ে যায় সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষার দুয়ার। স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুরবাড়ির অভিজাত, রুচি ও প্রগতিশীল মননের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ সেই পঙ্কিল প্রবাহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিজের স্বতন্ত্র ভাবনা-চিন্তা, সামর্থ্য প্রয়োগ করেই তিনি এগিয়ে চললেন নিজের খনন করা পথ ধরে; গা ভাসালেন না প্রথার স্রোতে। শুধু তাই নয়, সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ের ব্যভিচার দেখে সেই সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চে 'লিটল্ থিয়েটার' আন্দোলনের চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন —

" ...... তিনি নিজেও জানতেন যে প্রয়োজনের কষ্টি পাথরেই নাটকের নাটকত্ব যাচাই হয়, না হলে সারাজীবন তিনি নাট্য প্রযোজনা নিয়ে অত চিন্তা ও পরিশ্রম করতেন না। তবে তাঁর লক্ষ্য থাকত শিল্পরসের প্রতি, সাধারণ দর্শকের রুচি ও চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে নাট্যকলাকে তিনি অগভীর ও লোকরঞ্জক করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। শুধু তাই নয়, সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ে শিল্পরীতির ব্যভিচার দেখে তিনি সেকালেই 'লিটল থিয়েটার' আন্দোলন এদেশে চালু করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন।"[৩৪]

সাধারণ রঙ্গালয়ের 'ললিতকলার সূক্ষ্ম-সৌন্দর্যবিহীন' নাটকগুলোর উপস্থাপনে বিরক্ত হয়েই তিনি ইউরোপীয় নাট্যান্দোলনের মতন এক নতুন নাট্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। 'নাচঘর' পত্রিকায় (১৯২৭, ৩ জুন) তিনি তাঁর এই অভিনব থিয়েটার ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন। এর মূল কথাগুলো হল — থিয়েটার বিষয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য গড়ে উঠবে এই স্বতন্ত্র মঞ্চ (যা বিশেষ বড়ো আকারের হতে হবে এমন নয়), কমপক্ষে দুইশত কলারসিক এর সভ্য হবেন, প্রত্যেক সদস্যের জন্য ধার্য মাসিক দশ টাকার চাঁদায় সমস্ত কার্য সম্পন্ন হবে (সর্বসাধারণের কাছ থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য নয়), দর্শক হবে সুনির্বাচিত, নাটক হবে অত্যন্ত উঁচুদরের (যা সাধারণ রঙ্গালয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে), অভিনয় অবশ্যই কলারসিকের অন্তরে ভাবের রেখাপাত ঘটাবে ইত্যাদি। যেহেতু এই থিয়েটার হবে পরীক্ষামূলক, তাই একই নাটক সুদীর্ঘকাল সেখানে অভিনীত হবে না।

রবীন্দ্রনাথ একে অভিহিত করেছিলেন 'অতিরিক্ত রঙ্গালয়' হিসাবে। তাঁর মতে, দর্শকের মুখ চেয়ে বা কৃপাভিক্ষা করে তা চলবে না। তার মানে এই নয় যে, তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের উচ্ছেদের পক্ষে। তাঁর মতে, 'সাধারণ রঙ্গালয় দর্শকের মুখ চেয়ে যেমন চলবে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না।' রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর স্নেহধন্য নাট্যাচার্য শিশিরকুমার পেশাদারি থিয়েটারের সমস্ত দায়দায়িত্ব অপর কারোর ওপর ন্যস্ত করে নিজে এই 'অতিরিক্ত থিয়েটার'-এ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন থাকুক। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর সে স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে, বাস্তবায়িত হয়নি। কোনো স্বতন্ত্র মঞ্চও তিনি পাননি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য। তবু এদেশের থিয়েটারে তাঁর অবদান ফরাসি থিয়েটারে রমা রোঁলা, জার্মান থিয়েটারে বের্টোল্ট ব্রেশট, আইরিশ থিয়েটারে ডবলু বি ইয়েটস্ কিংবা নরওয়ে থিয়েটারে হেনরিক ইবসেনের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। ভারতীয় থিয়েটারে তিনিই প্রথম স্বতন্ত্র ধারার মঞ্চভাষার প্রথম সার্থক প্রবর্তক। সমালোচকের ভাষায় —

"গিরিশ-অর্ধেন্দু-অমরেন্দ্র থেকে শুরু করে অপরেশচন্দ্র শিশিরকুমার অহীন্দ্র চৌধুরী

পর্যন্ত বিস্তৃত পেশাদারি থিয়েটারের সমান্তরে নাট্য প্রযোজনার অক্লান্ত কর্মী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল বাঙালির যথার্থ নাট্য আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারই আমাদের প্যারালাল থিয়েটার।"[৩৩]

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিল্প চেতনার মূলে ছিল তাঁর অনুভব-উপলব্ধির সুগভীর মানসভূমি। সে মানসভূমির গঙ্গোত্রী থেকেই প্রবাহিত হয়েছে তাঁর শিল্পগঙ্গা। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নব নব ধারায় তা সমৃদ্ধ করেছে শিল্প সংস্কৃতির বিস্তৃত প্রান্তর। ভারতীয় সভ্যতার অজস্র ঊষর ভূমিকে সে প্রবাহ শস্য-শ্যামলা, সুজলা-সুফলা করে তুলেছে। নাট্য সাহিত্যেও তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বর্ণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি। বাংলা নাট্য সাহিত্যকেও তিনি নতুন নতুন ধারায় সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু নাট্যকলা বা থিয়েটারের বিবর্তনে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হবার অনুকূল পরিবেশ পেল না। অভিনয়কলা বা প্রয়োগচর্চার যে ব্যতিক্রমী প্রয়াস তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, সমকালে তার কোনো সর্বাত্মক প্রসার ঘটল না। প্রসার ঘটলে হয়ত আমাদের নাট্যসাহিত্য বা থিয়েটার চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর এগিয়ে যেত। বর্তমান কালের এক বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বের ভাষায় —

"পৃথিবীর তাবৎ দেশে নাটকে যখনই নতুন চিন্তা এসেছে, তা এসেছে গভীর অনুভূতি থেকে, অন্তরের বাধ্য করা তাগিদে। সেটাই আধুনিক বলে স্বীকৃত হয়েছে সে সব সমাজে, সে সব দেশে। স্বভাববাদই বলুন, প্রকাশবাদ বলুন, কিংবা রিয়ালিজম বলুন বা একেবারে অতি আধুনিক অস্তিত্ববাদ বা কিমিতিবাদই বলুন — বাধ্য করা তাগিদটা সত্য সর্বক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে সত্য সেইসব নাট্যকাররা সকলেই থিয়েটার পেয়েছিলেন বা বলা যায় থিয়েটারকে কেন্দ্র করেই তাদের নাট্যচিন্তা মুক্তি পেয়েছিল — প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এবং তারা সবাই সঙ্গী পেয়েছিলেন — নিজের মনের তারের সঙ্গে অন্য মনের সুরকে মেলাতে পেরেছিলেন। যেমন গঁকুর, এমিল জোলা, আঁতোয়া কিংবা গিয়র্গ-কাইজার, আর্নস্ট টলার অথবা টলস্টয়, গোর্কি, চেখভ, ইবসেন, ট্রিন্ডবার্গ। আবার আইরিশ থিয়েটার মুভমেন্ট ইয়েটস, সিঙ, শন ও' কেসি। একেবারে হালে কাম্যু, সার্ত্র, বেকেট, ইওনেসকো ইত্যাদি। সবাই মিলেমিশে একই কাজ করেছেন এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু চিন্তার একটা সাযুজ্য অবশ্যই তাদের থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছে। এমনকি যে গ্যয়েটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের নৈকট্যের কথা বলা হয়ে থাকে, তিনিও ভাইমারের থিয়েটারের অধিকার পেয়েছিলেন। ফাউস্ট রচিত এবং অভিনীতও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নাট্য ভাবনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে থিয়েটারের কাজে কেউ যুক্ত হলেন না। থিয়েটারও তিনি পেলেন না। অথচ অন্য এক থিয়েটারের সাধ তিনি অপ্রকাশ রাখেননি। কেননা তাঁর নাট্যচর্চা থিয়েটারচর্চার অভিজ্ঞতা তাঁকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে বাধ্য করেছিল। তাঁর সমস্ত শিল্প সম্ভারকে সরিয়ে রেখেও বলা যায় নাট্যচর্চা, অভিনয়চর্চা, ও প্রয়োগচর্চায় রবীন্দ্রনাথ এক

বিরল ব্যতিক্রম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে আধুনিকতার লক্ষণ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল — আমাদের বোধের সীমানার বাইরে।"[৩৬]

নাট্যকলার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অভিনয়। কোনো নাটকের সুষ্ঠু মঞ্চায়ন বহুলাংশেই অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল। অভিনয়ের ভালোমন্দের উপরই থিয়েটারের সাফল্য ব্যর্থতা নির্ণীত হয়। অতি উৎকৃষ্ট মানের নাটকও অনেক সময় ভালো অভিনেতার অভাবে ব্যর্থ হয়। আবার বহুক্ষেত্রে নিম্নমানের নাটকও অভিনয়ের গুণে উতরে যায়। তাই অভিনয়ও একটা উচ্চমানের আর্ট। জাত অভিনেতার অন্তর্গত চেতনা থেকেই তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়। অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি, হস্ত পদ সঞ্চালন, কণ্ঠস্বর বা শব্দক্ষেপন, ইশারা ইত্যাদির সুযম সমন্বয়েই অভিনয় সাফল্যের চূড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করে; দর্শকের করতালি মুখরিত হয় রঙ্গমঞ্চ। রবীন্দ্রনাথ অভিনেতা হিসাবেও ছিলেন একজন জাত শিল্পী। শিশিরকুমারের মতে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শারীরিক গঠন, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি সকলই ছিল অতি উচ্চমানের অভিনেতার সমতুল্য। অমিতা ঠাকুরের ভাষায় —

> "কী আশ্চর্য ছিল তাঁর অভিনয় করার শক্তি! তাঁর কণ্ঠস্বর ও তাঁর অভিব্যক্তি! কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন — মুখের ভাবের নানা অভিব্যক্তির আশ্চর্য ক্ষমতাই তাকে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা করে তুলেছিল।"[৩৭]

আর একটি বর্ণনা থেকে পাচ্ছি —

> "রবীন্দ্রনাথের মুখ ছিল খুব অভিব্যক্তিপূর্ণ। চেহারা খুবই সুন্দর, আকর্ষণীয়, কণ্ঠস্বর যেমন অপূর্ব, তেমনি নিখুঁত ছিল স্বর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। খুবই লীলায়িত ছন্দে হাত পা নাড়তেন।"[৩৭এ]

পরবর্তীকালের বাংলা রঙ্গমঞ্চের আর একজন প্রখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁরও মতে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, সমুজ্জ্বল আঁখির অধিকারী। তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ঠ। অভিনয়ের সময় সমুজ্জ্বল আঁখি প্রতি মুহূর্তে দীপ্তি ছড়াত বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায়।

ষাট বছরের অধিক নাট্যজীবনের বহু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন (প্রাথমিক পর্যায়ের গুটি কয়েক বাদে সবই স্বরচিত)। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ষোলো বছর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' নাটকের অলীকবাবুর চরিত্রেই তাঁর জীবনের প্রথম স্মরণীয় অভিনয়। এছাড়া রয়েছে 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র বাল্মীকি, 'কালমৃগয়া'-র অন্ধমুনি, 'মায়ার খেলা'-র বসন্ত, 'রাজা ও রাণী'-র বিক্রমদেব, 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি, 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-র কেদার, 'শারদোৎসব'-এর সন্ন্যাসী ইত্যাদি অসংখ্য চরিত্রে রয়েছে তাঁর অভিনয় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। অধিকাংশ

সমালোচকের মতে, 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতি চরিত্রই ছিল রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। প্রাজ্ঞ সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁর অভিনয় ('রাজা ও রাণী' নাটকে) প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "অভিনেতারূপে রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রবৃত্তিময়, বলিষ্ঠ ভাবাভিব্যক্তিমূলক এবং বেগবান ক্রিয়াচঞ্চল এই প্রথম দেখা দিল। শেক্সপিরীয় নাটকের অভিনয়ের হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের যে উত্তেজনাজনক ক্রিয়া এবং প্রবল ভাবাবেগের যে লীলা বিদেশি রঙ্গমঞ্চে দেখা যেত তার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের।"[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সকল প্রকার অভিনয়ে সমান পারদর্শী। গুরুগম্ভীর, হাস্যরসাত্মক, ট্রাজিক ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের সময় তিনি একেবারে একাত্ম হয়ে যেতেন। বোঝাই যেত না এত বড়ো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ রয়েছেন ওই চরিত্রের অন্তরালে। অভিনয়ের সময় শুধু তাঁর মুখ নয়; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠত। দর্শকরা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতেন। নাট্যকার অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার খনন করে মহান অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে এক টুকরো তুলে ধরেছেন তাঁর 'রবীন্দ্র স্মরণে' প্রবন্ধে —

> "রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্বন্ধে কিছু না বললে কথা অসম্পূর্ণ থাকে। দুঃখের বিষয়, বেশি তাঁর অভিনয় দেখার সুযোগ আমি পাইনি। বোধহয় একবার 'ডাকঘর', একবার 'ফাল্গুনী' দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রযোজনার সৌকুমার্য ও শালীনতা মনোমুগ্ধকর। তিনি নিজের চরিত্রানুগ ভূমিকা গ্রহণ করে সহজেই ভূমিকার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। অভিনেতার যাবতীয় সম্পদে তাঁর মতো সম্পন্ন পুরুষ কল্পনাও করতে পারি না। ঐ দীর্ঘ দেবদেহ, তাঁর চক্ষুর ভাষা, হস্তের ভাষা খুব কম অভিনেতার ভাগ্যে জোটে। সবার ওপর তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব। কোনো বিশেষ চরিত্রের অন্তরালে এত বড়ো ব্যক্তিত্বকে লুকিয়ে ফেলা খুব শক্তির পরিচায়ক। তাঁর 'রঘুপতি' কিংবা 'জয়সিংহ' দেখলে হয়তো সে শক্তির কিছু আভাস পেতাম। কিন্তু তা দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেনি।"[৩৯]

প্রখ্যাত কথাকার ও রবীন্দ্রজীবনী রচয়িতা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের অভিনয় প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'ফাল্গুনী' নাটকে কবিশেখর ও অন্ধ বাউল — এই দ্বৈত অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। একই সঙ্গে যুবক ও বৃদ্ধ চরিত্রে তাঁর অভিনয় ছিল অনবদ্য। প্রভাত কুমারের ভাষায় — ত্রিশ বছর পূর্বের যুবক রবীন্দ্রনাথ যেন নবকলেবরে উপস্থিত। সে কি চঞ্চল জীবন্ত মূর্তি। তারপর এলেন বৃদ্ধ অন্ধ বাউলের রূপে। তখন সে আবার কী শান্ত সমাহিত মূর্তি। অন্যদিকে চটুল হালকা চালের চরিত্রের অভিনয়েও তিনি ছিলেন সমানভাবে সফল। সেখানেও অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের অভিনবত্বে হাস্যরসের হিল্লোল উঠত দর্শক মনে। 'বৈকুণ্ঠের

খাতা'-র কেদার চরিত্রে এমনই ছিল অবিস্মরণীয় অভিনয় যেখানে 'মুখের বক্ররেখায় চোখের তির্যকভঙ্গিতে চরিত্রটির কুটিলতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন।' হেমেন্দ্রকুমার রায়ও তাঁর 'সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের চটুল অভিনয় প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন কীভাবে তাঁর কণ্ঠস্বর লঘুচপল অভিনয়ের সময় চটুল হয়ে উঠত এবং চোখে মুখে ফুটে উঠত 'তরল ভাবের লীলা।' আবার চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিস্ফুটনেও ছিল তাঁর প্রশ্নাতীত দক্ষতা।

আবার সাহিত্যের নানা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবিও ফুটে উঠত তাঁর অভিনয় কলার মধ্যে দিয়ে - "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ধ্বংসের তাণ্ডবে সভ্যতার অন্তর্গত দুই শ্রেণির দ্বন্দ্বে মানুষের প্রতিবাদী অন্তররূপটি ধরা পড়েছিল সে যুগের সব দেশের কবি, লেখক, নাট্যকার, প্রয়োগশিল্পীদের সৃষ্টিতে। রোমান্টিসিজম, ন্যাচারালিজম, রিয়ালিজম, সোশ্যালিজমের সমকালেই এসেছিল এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারে রোমান্টিসিজমের সূত্র ধরে রিয়ালিজম, সোশ্যালিজম ও এক্সপ্রেশনিজম এক সঙ্গেই এসেছিল। ৬২ বছরের জয়সিংহরূপী রবীন্দ্রনাথের যে আলোকচিত্রটি আজ আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে, তার মঞ্চসজ্জায় সোশ্যালিস্টিক ভাবনার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট হয়েছে অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব। 'রক্তকরবী' নাট্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে গগনেন্দ্রনাথ যে মঞ্চভাবনার আভাস দেন, তাতে কিউবিস্ট চিত্রকলার প্রত্যক্ষ প্রেরণা অনুভূত হয়, এবং ১৯৫৪-য় শম্ভু মিত্রের সৃজনশীল শিল্পসৃষ্টিতে যে 'রক্তকরবী' বাংলার অন্যধারার থিয়েটারের প্রতীক হয়ে ওঠে, তাতে মঞ্চশিল্পী খালেদ চৌধুরী স্তরবিন্যস্ত যে বহুমাত্রিক মঞ্চসজ্জা রচনা করেন, তাতে 'বিসর্জনের' ওই অবিস্মরণীয় ছবি ও 'রক্তকরবী' মলাটের প্রেরণাকে অস্বীকার করা যায় না।"[৪০]

তবে একটা কথা এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, এ সমস্ত অভিনয়ই ছিল তাঁর নিজের নাটকে। সাধারণ রঙ্গালয়ে বা পেশাদারি থিয়েটারে কিংবা ঠাকুর বাড়ির বাইরের কোনো নাট্যকারের লেখা নাটকে তাঁর অভিনয় দক্ষতা কখনোই পরীক্ষিত হয়নি —

> "রবীন্দ্রনাথকে খুব বড়ো অভিনেতা বলে শিশিরকুমার মনে করতেন। তবে শিশিরকুমারের মতে, রবীন্দ্রনাথেরও সীমাবদ্ধতা ছিল। নিজের নাটক ছাড়া অন্য কারুর নাটকে কখনও অভিনয় করেননি রবীন্দ্রনাথ। সেইজন্যে অন্য ধরনের চরিত্রে কতখানি সফল হতেন, তার পরিমাপ হয়নি।"[৪১]

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র একজন অসাধারণ অভিনেতাই ছিলেন না, তিনি একজন প্রথম শ্রেণির অভিনয় শিক্ষকও ছিলেন। অভিনয় শিক্ষক হিসাবেও ছিলেন তিনি সমভাবে সার্থক। অভিনয়ের প্রত্যেকটা দিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সংলাপ কণ্ঠস্থ করা, যথার্থ

উচ্চারণ, অঙ্গাভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার ওপর জোর দিতেন —

> "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থাপিত 'ভারত সঙ্গীত সমাজ'-এ যখন তিনি অভিনয় শিক্ষা দিতেন তখন সংলাপ মুখস্থ করা, শুদ্ধ উচ্চারণ, অভিনয়ে ওজস্বিতা ইত্যাদি প্রাথমিক ব্যাপারগুলো শেখাতেই তাঁর বেশিরভাগ সময় চলে যেত — নাটকের আর চরিত্রে অন্তর্নিহিত রূপটি তখন অনেক দূরে।"[৪২]

চরিত্রের সংলাপ নিক্ষেপণের ওপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। সংলাপ উচ্চারণের সময় কোথায় বিশেষ্য, কোথায় বিশেষণ, কোথায়ই বা ক্রিয়া কিংবা অব্যয়ের জোর পড়বে তাও বুঝিয়ে দিতেন। সর্বদাই সজাগ থাকতেন যাতে চরিত্রের সংলাপ ও মঞ্চস্থ সমস্ত কার্যকলাপের একটা সুসমন্বয় তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় শিক্ষা প্রসঙ্গে আর এক নাট্য ব্যক্তিত্বের মতটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য —

> "কেবলমাত্র মঞ্চসজ্জা নয়, প্রযোজনার সামগ্রিক রূপের পরিবর্তন যা অনেকাংশেই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষায় নিয়ন্ত্রিত ও উদ্ভাবিত। কিন্তু ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় অভিনয় শিক্ষার ব্যাপারে। সে জোড়াসাঁকো পর্বেই হোক, বা শান্তিনিকেতন পর্বেই হোক। অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত নিষ্ঠ, অত্যন্ত কঠোর সেখানে রবীন্দ্রনাথ। বরাবরই মহলায় জোর দিতেন রবীন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে পারিপার্শ্বিক বাস্তবকে মেনে নেবার মতো ঔদার্য।"[৪৩]

নাটকের মহলার ওপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। এরজন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করা হত। মহলায় তিনি প্রতিটা খুঁটিনাটি ব্যাপারের ওপর জোর দিতেন। সেখানে বড়ো ছোটো সব পাঠই সমান গুরুত্ব পেত। সব ভূমিকার পাঠ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত কোনো নাটকই মঞ্চায়িত হতে পারত না। সাধারণত প্রতিদিন সন্ধ্যায় উপাসনার পর প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে মহলা চলত। প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপ ধরে ধরে বোঝাতেন, নিজে অভিনয় করে নেচে দেখাতেন। নটনটীদের অঙ্গাভঙ্গির ওপরও ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি, বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের স্মৃতি থেকে জানা যায় —

> "দু'মাসের কমে কোনো নাটকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হত না। কার কোনখানে ত্রুটি হচ্ছে, কেন ত্রুটি হচ্ছে তা তন্ন তন্ন করে দেখতেন আর যতক্ষণ না সংশোধন হচ্ছে ততক্ষণ চলত অভ্যাস। সে অভ্যাস পাঠাভ্যাসের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। কোনো গান কোনো সংলাপের একটি শব্দও ছাড় পড়লে তাঁকে বিরক্ত হতে দেখেছি। তাঁর অভিনয়ে তন্ত্রধারণের বালাই ছিল না। অভিনয়ের সময়ে রঙ্গামঞ্চে বসে থাকতেন। কেউ কাউকে প্রম্পট করার উপায় নেই। রঙ্গামঞ্চে প্রবেশের সময় দুর্বল স্মৃতির দুর্ভাবনায় যতই হৃৎকম্প হোক না কেন মধুসূদন ছাড়া আর কারুর শরণ নেওয়া যেত না।"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য অমিতা ঠাকুরও তাঁর তত্ত্বাবধানে নানা নাটকে অংশ নিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকথা থেকেও আমরা জানতে পারি, মহলার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কেমন সিরিয়াস ছিলেন; সামান্য ভুলও শুধরে দেবার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়ে পড়তেন —

> "আগের দিনের সন্ধ্যার মহড়ায় একটি জায়গায় আমার অভিনয় তাঁর মনমতো হয়নি। তিনি যে ভাবটি আমায় ফুটিয়ে তুলতে বলেছেন ঠিক তেমনটি আমি ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। তাই অভিনয়ের সেই ত্রুটিটুকু রাত্রে তাঁর মনকে শান্ত হতে দেয়নি। ভোর না হতেই ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে। 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না' গানে এক জায়গায় আমার ভাবটি ঠিক মতো ফুটে ওঠেনি। সেই জায়গাটি দেখাতে তিনি নিজে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি গাইলেন —
>
> 'ঝর ঝর নীরে নিবিড় তিমিরে
> সজল সমীরে গো।'
>
> গাইতে গাইতে স্বপ্নের ঘোরে যেন এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছেন। তারপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'মঞ্চের স্তম্ভে মাথা হেলিয়ে রেখে তুই যেন দূর থেকে ভেসে আসা কারও বাণী শুনতে পাচ্ছিস, গাইছিস -
>
> 'যেন কার বাণী কভু কানে আনে - '
>
> এই বলে তিনি নিজের মাথাটি এক জায়গায় হেলিয়ে সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে গাইতে লাগলেন, 'যেন কার বাণী কভু কানে আনে —' কান পেতে যেন শুনতে পান সুদূর থেকে ভেসে আসা সুরের রেশ। তারপরই হতাশভাবে চৌকিতে বসে পড়ে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ে -- 'কভু আনে না -' ভোরের স্নিগ্ধ আলোর আভায় এক স্বর্গীয় আলোর জ্যোতি দেখতে পেলাম তাঁর মুখে।"[৪৫]

সাজসজ্জা, অঙ্গভঙ্গি, সংলাপ উচ্চারণ, মঞ্চবিন্যাস ইত্যাদির পাশাপাশি নাটকে আলোক ক্ষেপণের ওপরও থাকত তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আলো শুধু মঞ্চ আলোকিত করার জন্যই নয়; আলোরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। চরিত্রের অন্তর্লোককে তা পরিস্ফুট করে তুলবে, চরিত্রের মুড, মেজাজ কিংবা পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই আলোকক্ষেপনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে রঙ্গমঞ্চে। বহুক্ষেত্রে চরিত্রের নৈঃশব্দের মধ্যে আলোকই যেন বাঙ্ময় চরিত্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চপ্রয়োগবিদ্যায় আলোর এই বিশেষ ভূমিকার কথাও স্বীকৃত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় এমনি এক টুকরো আভাস রয়েছে —

> " .... একদিন ড্রেস রিহার্সেল হবে, কোন সিনে কোন লাইট আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে, কোন লাইট আবার ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে রথী আর কনক সব লিখে নিলে।"[৪৬]

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চভাবনা এমনি করে ঠাকুরবাড়ির চার দেওয়াল অতিক্রম করে

গেছে। পৌঁছে গেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। আজও তাঁর নাটক সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নাটক বা থিয়েটারেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী ভাবনার পথের পথিক। তবুও বাংলা নাটক ও থিয়েটারের দুর্ভাগ্য, যে প্রত্যাশার পথ তিনি দেখিয়েছেন তা থেকে শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি আজও আমাদের ঘটেনি। তিনি ছিলেন কালের থেকে অগ্রগামী এক শিল্পী কিন্তু ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন সময়ের হাতে। তাই তাঁর নাট্যকলা সম্পর্কিত ভাবনাগুলি সুসংহত রূপ পায়নি। পেলে হয়তো আমরা স্তানিশ্লাভস্কি বা ব্রেশটের মতো এক প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্বকে পেয়ে যেতাম —

> "একটা ইনস্টিটিউশন হিসাবে দেখতে গেলে তাঁর ও বিশ্বভারতীর সেই সময়কার কর্মকাণ্ড পশ্চিমের ওল্ড ভিক কিংবা বার্লিনার আঁসম্বল থেকে কম কিছু নয়। শুধু নাট্য প্রযোজনাই নয়, সেই সংক্রান্ত নানাবিষয়ে তাঁর নানা সময়ের ভাবনাচিন্তা নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে সেই সময়ের ও পরবর্তীকালের নাট্যজনের সামনে। সেইসব চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রেখে কবি যদি আরও অভিনিবেশ সহকারে সেগুলিকে সুসমঞ্জস রূপ দিয়ে সুগ্রথিত বা গ্রন্থিত করে যেতে পারতেন, তা হলে কে বলতে পারে, হয়তো বা পশ্চিমের স্তানিশ্লাভস্কি কিংবা ব্রেখট সাহেবের মতো এক আধুনিক ভারতীয় নাট্যচিন্তাবিদকে আমরাও পেয়ে যেতে পারতাম।"[৪৭]

তথ্যঋণ :

১। রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা, শ্রী অশোক সেন, ১৩৮২, এ মুখার্জী এন্ড কোং, পৃষ্ঠা ১-২।

২। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খন্ড), ১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৪৮৪।

৩। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার, নৃপেন্দ্র সাহা, পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা ১৩৯৭, বর্ষ-২৩, সংখ্যা ৪২ ও ৪৩, সম্পাদক - দিব্যজ্যোতি মজুমদার, পৃষ্ঠা-১০৫৫।

৪। পেশাদার রঙ্গামঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথের নাটক, মণি বাগচি, গন্ধর্ব, রবীন্দ্র নাট্য সংখ্যা ১৯৬১, পৃষ্ঠা-৮২।

৫। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার, নৃপেন্দ্র সাহা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৫৫।

৬। রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ, প্রমথনাথ বিশি, ১৯৬৬, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, পৃষ্ঠা-৫০৬।

৭। রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫০৬।

৮। রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ রঙ্গালয় (১৮৮৬-১৯৪১) ড. অপূর্ব কুমার দে, সংবাদ একদিন, ১৫ই মে, ২০১০, সম্পাদক - সুমন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৪।

৯। নাট্যদর্পণে দুশো বছর, কুমার রায়, দেশ (৬৫ বর্ষ ২ সংখ্যা), ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৭, সম্পাদক - অমিতাভ চৌধুরী, পৃষ্ঠা-৩৫।

১০। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে শিশিরকুমার, সঞ্জীব সেন, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৪৮।

১১। ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯২ প্রকাশ ভবন, পৃষ্ঠা : ১৪৯-১৫১

১২। বাংলা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটক, অজিত কুমার ঘোষ, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১২৫তম জন্ম শতবার্ষিকী সংকলন), সম্পাদনা - অরুণ কুমার বসু, ১৯৯৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃষ্ঠা-২৭০।

১৩। ঘরোয়া, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১৩৯-৪০।

১৪। দেশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৫।

১৫। রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ভাবনা, দর্শন চৌধুরী, তবু একলব্য, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪১৭, সম্পাদক - দীপঙ্কর মল্লিক, পৃষ্ঠা - ১৯৬।

১৬। ঘরোয়া, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬০।

১৭। রঙ্গমঞ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্র প্রবন্ধ, ১৪০১, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ৭৪

১৮। তপতী (ভূমিকা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খন্ড, ১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা - ১৫৭।

১৯। রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ভাবনা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০১।

২০। মঞ্চে উপেক্ষিত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, আজকাল (দৈনিক পত্রিকা), ৯ মে, ২০১০, সম্পাদক - অশোক দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ৬ (রবীন্দ্রনাথের দেড়শো বছর উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র)

২১। রবীন্দ্রমঞ্চ ও নাট্যাদর্শ, বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ, অশ্রুকুমার সিকদার, ১৩৮৮, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা - ১৩০।

২২। দৃশ্যসজ্জা : ঠাকুরবাড়ির প্রযোজনা : রবীন্দ্রনাথ, কৌশিক সান্যাল, গ্রুপ থিয়েটার, ১৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, সম্পাদক - রমণ মহেশ্বরী, পৃষ্ঠা - ৩৪২।

২৩। নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতির নূতন দিগন্ত, মন্দাক্রান্তা বসু, বলাকা, বর্ষ-১৯, সংখ্যা-২৯, নভেম্বর ২০১০, সম্পাদক - ধনঞ্জয় ঘোষাল, পৃষ্ঠা - ৬০।

২৪। নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতির নূতন দিগন্ত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৬।

২৫। তপতী (ভূমিকা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৭।

২৬। যাত্রা-থিয়েটার পারস্পরিকতা : বিনিময় ও বিরোধিতা, প্রভাতকুমার দাস, স্যাস নাট্যপত্র : ২০০০, সম্পাদক - সত্য ভাদুড়ী, পৃষ্ঠা-১৭।

২৭। রবীন্দ্রমঞ্চ ও নাট্যাদর্শ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৫।

২৮। বাঁধন ছেঁড়া বাঁধন, অসীম চট্টরাজ, নীললোহিত, পঞ্চমবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৯) ও ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি-জুন ২০১০), সম্পাদক - বাসব দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা : ৪৭৬।

২৯। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে : নাটক ও অভিনয়, অমিতা ঠাকুর (পুনর্মুদ্রিত) রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৮৪।

৩০। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চপ্রতিমা, কুমার রায়, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৩।

৩১। রবীন্দ্র নাটক ও শম্ভুমিত্র, শাঁওলি মিত্র, দ্য সানডে ইন্ডিয়ান, Vol-4, Issue 26, 4 Oct – 17 Oct. 2010, সম্পাদনা – এ. সন্দীপ, পৃষ্ঠা-৪২।

৩২। বাংলা নাট্যরীতি, বিষ্ণু বসু, ১৯৯৬, পুনশ্চ, পৃষ্ঠা-৫৩।

৩৩। বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ১৯৯১, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, পৃষ্ঠা-৯৫।

৩৪। বাংলা নাট্যরীতি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩।

৩৫। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার, বিষ্ণু বসু, ১৯৮৭, প্রতিভাস, পৃষ্ঠা-২৬।

৩৬। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক চেতনা, কুমার রায়, নীললোহিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫৫-৫৬।

৩৭। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে : নাটক ও অভিনয়, অমিতা ঠাকুর, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৮৫।

৩৭এ। রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী, চিরকুমার ভাদুড়ী, কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪১৫ সম্পাদক : তাপস ভৌমিক, পৃষ্ঠা ৩৯০।

৩৮। বাংলা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র নাটক, অজিত কুমার ঘোষ, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭১।

৩৯। থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ('রবীন্দ্র স্মরণে' নামক প্রবন্ধ), সম্পাদনা-দিব্য নারায়ণ ভট্টাচার্য, ১৯৮৭, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা-১১৬।

৪০। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৫৮-৫৯।

৪১। রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী, চিরকুমার ভাদুড়ী, কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪১৫, সম্পাদক : তাপস ভৌমিক, পৃষ্ঠা - ৩৯০।

৪২। দৃশ্যসজ্জা : ঠাকুরবাড়ির প্রয়োজনা : রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৪০।

৪৩। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চপ্রতিমা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৮০।

৪৪। রবীন্দ্রনাথের মহলা, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, বলাকা, বর্ষ-১৯, সংখ্যা - ২৯, নভেম্বর, ২০১০ (পুনর্মুদ্রিত), সম্পাদক - ধনঞ্জয় ঘোষাল, পৃষ্ঠা ১৪-১৫।

৪৫। আনন্দ সর্বকাজে, অমিতা সেন, বলাকা, পূর্বোক্ত (পুনর্মুদ্রিত), পৃষ্ঠা - ২২।

৪৬। ঘরোয়া, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬৩।

৪৭। রবীন্দ্র নাটক : হুজুগ, না পুনরাবিষ্কার? বিভাস চক্রবর্তী, দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, শারদীয় ১৪১৭, সম্পাদক - মানস ঘোষ, পৃষ্ঠা - ১০৭।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বাংলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক ড. বিমলচন্দ্র বণিক বর্তমানে জঙ্গিপুর কলেজে কর্মরত।

রবি ঠাকুরের ফুলবাগানে

ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

আমি থাকি মালঞ্চেতে রাজবাগানের মালী,
সেইখানেতে যূথীর বনে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালি।
রাজকুমারীর তরে সাজাই কনকচাঁপার ডালা,
বেণীর বাঁধন-তরে গাঁথি শ্বেতকরবীর মালা।
মাধবীতে ধরল কুঁড়ি আর হবে না দেরি ...
তুমি যদি এসো তবে ফুটবে তোমার ঘেরি।
উঠবে জেগে রঙনগুচ্ছ পায়ের আসনটিতে,
সামনে তোমার করবে নৃত্য ময়ূর-ময়ূরীতে।
বনের পথে সারি সারি রজনীগন্ধায়
বাতাস দেবে আকুল করে ফাগুনি সন্ধ্যায়।

(আরো সত্য / গল্প-স্বল্প)

কবিতা পড়লেই টের পাওয়া যায় পুষ্পিত এই রাজবাগানটির আসল মালিক ছিলেন কালিদাস। তাঁর অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ সেজে বসেছেন এই মালঞ্চের মালী। অবিশ্বাস হলে তাঁর ক্ষণিকা থেকে আর একটু পাঠ করি —

রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বসত সন্ধ্যা হলে ....,
অশোক-কুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে
বকুল হত ফুল্ল, প্রিয়ার
.... মুখের মদিরাতে।
কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল বইত হাতে
কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে,

শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নবনীপের মালা।

(সেকাল / ক্ষণিকা)

এই ফল এই সাজ এই মেয়ের দেখা মেলে সংস্কৃত কাব্যের অলিন্দে অলিন্দে। সেকালের পুষ্পিত স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ একালের জন্যে নতুন করে জাগিয়ে দিয়েছেন সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি তো শুধু পুনর্জাগরণের কবি নন নব জাগরণের কবিও। যা ছিল প্রকৃতির আভরণ বা মেয়েদের সাজের উপাদান মাত্র সেই ফুলকে তিনি বিস্ময়কর ও অচিন্তিতপূর্ব বহু মাত্রিকতা দান করেছেন ফুলের ফুলত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখে।

ফুল। প্রকৃতিবিশ্বের বিপুল চলমানতায় কোথায় ঠাঁই তার? শিকড় থেকে শিখরের পঞ্চাঙ্ক বৃক্ষনাট্যে ফুল থাকে চতুর্থ অঙ্কে। শিকড়-কাণ্ড-পাতা-ফুল-ফল। মাটির ভিতর থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে গাছ অঙ্ক থেকে অঙ্কান্তর পেরিয়ে পৌঁছোয় ফলে। ফলের ঠিক পূর্বাঙ্কে ঘটে তার পুষ্পল প্রকাশ। জ্যামিতি-ভাঙা সৌন্দর্যের সুরভিত উদ্ভাসনের দিক থেকে দেখতে গেলে ফুলেই তার চরমোৎকর্ষ। তার পশ্চাতে থাকে উৎস, সামর্থ্য ও বিস্তারের নির্ভুল প্রেক্ষিত আর সামনে থাকে পূর্ণতার নিশ্চিত আহ্বান। ফুল দাঁড়িয়ে থাকে অচিরস্থায়ী কিন্তু দুর্লভ সন্ধিক্ষণে। সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে বর্ণময়, সবচেয়ে সুরভিত অথচ সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এই রূপল মুহূর্তটি তাই কবিদের কাছে বরাবর একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব পেয়ে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি-সুন্দরের সাধক-সুন্দরের স্রষ্টা। সুন্দরের ডালি সাজিয়ে তিনি জীবনকে বরণ করতে চান। সুন্দরের অভাব বা বিনাশ দিয়ে তিনি আমাদের বিষণ্ণ করেন, সুন্দরের স্বপ্ন ও নির্মাণ দিয়ে তিনি আমাদের হ্লাদিত করেন। মানবিক ভুবনের নিকটতম প্রতিবেশী বৃক্ষের সমকল্পে জীবনকে দেখতে গিয়ে তিনি ফুলের কথা বারংবার এনেছেন তাঁর সৃজন প্রকল্পে। জীবনের বহুমাত্রিক বিস্ময়করতা যাঁর প্রধান এজেন্ডা, এবং আমৃত্যু যিনি বহন করেছেন বসন্ত এবং যৌবনের জয়পতাকা ফুল যে তাঁর বিশেষ মনোযোগের সামগ্রী হবে তাতে সন্দেহ কী!

আমাদের নিত্য ঘটমান জীবেন কোথায় লাগে না ফুল? ভালোবাসায়, বিবাহে-বরণে-বিদায়ে-শোকজ্ঞাপনে-পূজায় ফুল দিয়ে ঘেরা এক জীবনে আমরা সদাস্থিত। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে যায়। ফুল নানা রকম। তুষারের মতো সাদা, আকাশের মতো নীল, হৃৎপিণ্ডের মতো রক্তাভ, সূর্যের মতো সোনালি, বৈরাগ্যের মতো গৈরিক, কাঁচা হলুদের মতো উজ্জ্বল। ফুল ফোটে অন্ধকার রাত্রে তার সৌরভ এসে লাগে আমাদের ঘ্রাণে, ফুল ফোটে প্রত্যুষে, শিশির ভেজা সকালে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায়। গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা আসে, শরৎ যায়, বসন্ত আসে। রাজ পারিষদ বা রাজকুমারীর সখীদের মতো এক এক ঋতুর

সঙ্গে আসে এক এক ঝাঁক ফুল। 'বিষণ্ণ যখন বিশ্ব / নির্মল গ্রীষ্মের পদানত' তখন সাহসিকা অপ্সরার মতো এসে হাজির হয় স্বর্ণচাঁপা। 'বাদলের বিষণ্ণ ছায়াতে / গীত হারা প্রাতে' রৌদ্রের স্বপ্নছবি কেশরে কেশরে রোমাঞ্চিত করে ফুটে ওঠে কদম্ব। আশ্বিনের শিশির ভেজা ভোরে টুপ টুপ করে ঝরে পড়ে শিউলি। বসন্ত আসে 'আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে / দাড়িম্বে পলাশ গুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে'।

মনের সব কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না তখন লাগে সুর। গানও তো সকলের অধিকারে থাকে না। তখন ফুল।

কোনো কথা নাহি বলে
সুন্দরী ফিরায়ে মুখ দ্রুত গেল চলে।
পরদিন বটের পাতায়
গুটিকতক সদ্যফোটা বেলফুল রেখে গেল পায়।

(তর্ক / আকাশ প্রদীপ)

যে শুচিস্মিত শুভ্র সমর্পণ সম্ভব হল না জীবনে, শেষ বিদায়ের সময় তা জানিয়ে যেতে চেয়েছিল সুন্দরী। উচ্চারণ দিয়ে সেই অনুরাগকে কলুষিত করা যায় না, ভাষায় ঘোমটা খুলে অনাবৃত করা যায় না সেই বেদনা, তাই 'সদ্য ফোটা বেলফুল রেখে গেল পায়'। মানবিক অনুভবের এই শব্দহীন ব্যঞ্জনা ফুল দিয়ে ফুলের ব্যবহার দিয়ে সম্পন্ন করতে পারেন ক'জন কবি?

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার। ......
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা
ম্লান মল্লিকার মালাখানি
সেই হবে স্পর্শ তব,
সেই হবে বিদায়ের বাণী।

(শেষ বসন্ত/ পূরবী)

ভোরে গাঁথা হয়েছিল যে বরণ মাল্য রাত্রির অন্ধকারে তাই হয়ে উঠল বিদায়ের বাণী। ফেলে দেওয়া ম্লান মল্লিকার মালায় যে বিষণ্ণতা ঘনিয়ে তোলা হয়েছে তার তুলনা কোথায়! প্রথমে উল্লেখিত কবিতায় ছিল বেলফুল দ্বিতীয় কবিতায় মল্লিকা। দুটিই সাদা। একটি ছিল সদ্য ফোটা, অন্যটি ম্লান। একটিতে ব্যর্থ নায়িকার বিদায়, অন্যটিতে নায়িকায় আরোপিত নায়কের বিদায় ব্যথা। বেলফুল রাখা হয়েছিল প্রিয়জনের পায়ের পরে। আর মল্লিকার মালা বাতায়নস্থিত নায়িকার হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়বে সেই পথের পরে যে পথ দিয়ে ব্যথাহত নায়কের চলে যাওয়া। 'সেই হব স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।'

ফুল রবীন্দ্রনাথের কবিতার শুধু সাজের উপকরণ নয়, দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক সামগ্রী

নয়, ফুল তার ভাষা। প্রকৃতির ভাষা নয়, জীবনের ভাষা। মানব অনুভবের গহীন ভুবনের ভাষা। অথচ আশ্চর্যের কথা প্রতিটি ফুলের নিজস্ব সময়, বর্ণ, প্রস্ফুটন, সৌরভ, তার প্রাকৃতিক প্রেক্ষিত একচুল ক্ষুণ্ণ না করে তার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন মানব অনুভবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পনরেখা। এত সহজ এত স্বাভাবিক সেই মিশ্রণ যে জোড়মুখের লেশমাত্র থাকে না।

মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া,
বনের বক্ষ উঠেছে আজ দুলে
চামেলী ওই কার যেন পথ-চাওয়া।

(বিস্মরণ / পূরবী)

মাঘ শেষ। বসন্ত এল বলে। দক্ষিণ হাওয়ায় খুলে যাচ্ছে মনের দরজা। বুকে এসে লাগছে মিলনের স্পন্দন। কার যেন আসার অপেক্ষা। এমন সময় ফুটেছে নাগকেশর, চামেলী। তাদের পুষ্পল প্রকাশে ফুটে উঠেছে সেই বাসন্তিক অন্যমনস্কতা, মিলনের প্রতীক্ষা।

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।

(গীতিমাল্য-৪৯)

গোলাপ কি শুধু ফুল হয়ে রইল? সে হয়ে উঠল আমার সকল ব্যথার রঙিন প্রকাশ। ভিতরের রক্তক্ষরণ তো দৃশ্যমান করা যায় না। যদি দেখতেই চাও তাকাও গোলাপের দিকে। কাঁটার ভিতর সে কেমন রঙিন সৌন্দর্যে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। আমার ভিতরের ব্যথা এতটাই রক্তরঙিন, এতটাই কমনীয় এবং শিল্প সুন্দর।

এই বিপুল বৈশ্য রাজক তন্ত্রে যে কোনো উত্তরণের জন্য সম্পদ মূল্য লাগে। অন্ধকার পার হতে লাগে আলোর পারানি, সমুদ্র পার হতে লাগে শক্ত পোক্ত জাহাজ। যাদের ছিল সে সব সম্পদ-সামগ্রী তারা পৌঁছেছে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে। আমি কবি। ভারতের মতো দুর্ভাগা দেশের মানুষ। আমার না আছে রতন, না আছে মানিক। তা হলে? জীবনের অন্ধকার সমুদ্র তিনি পার হবেন কোন্ পারানি মূল্যে?

একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার
সেইটি হাতে আঁধার রাতে হবে আঁধার পার।

ফুলের সৌন্দর্যের কথাই জানা ছিল। ফুলের এই পারানি মূল্য ও শক্তির কথা কে জেনেছিল? বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে পরস্পরের দিকে তাক করা মেশিনগান। মেশিনগানের

মোকাবিলা অধিকতর শক্তিশালী, অস্ত্র দিয়েই সম্ভব। কী সেই অস্ত্র? কবি বললেন, গর্জনের চেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে সংগীত, বীভৎসতার প্রকৃত বিকল্প সুন্দর। যুদ্ধের শব্দে যার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে সেই ইউরোপ অবাক হয়ে শুনল এক ভারতীয় কবি বলছেন —

সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান,
মেশিনগানের সম্মুখে গাই জুঁইফুলের এই গান।

(চিঠি / পূরবী)

পদ্ম। এই জলজ ফুলটির ভারতীয় রূপ মাধুর্যে মুগ্ধ হয়নি কে? স্বয়ং ভারতী এসে বসেছেন শতদলের আসনে। সমুদ্রজা লক্ষ্মী তাঁর রাঙা পা দুখানি রেখেছেন কমলের পরে। লীলাকমলের পত্র গণনা করতে করতে পার্বতী জানিয়েছেন তার ভালোবাসার অনুক্ত স্পৃহা। অজন্তার সুন্দরী আনত গ্রীবা হয়ে দাঁড়িয়েছেন লীলাপদ্ম হাতে। রবীন্দ্রনাথ জল-স্থল অতিক্রম করে পদ্ম-কে নিয়ে গেছেন সূর্যস্নাত আকাশে দৈগন্তিক ঊর্ধ্বায়নে—যেখানে কমল পাপড়ি মুড়লে আঁধার রাত্রি নামে, পাপড়ি খুললে শুরু হয় নবপ্রভাত।

মুদ্রিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে

(গীতালি-১০৭)

'কসমিক ইমাজিনেশন' কোন উচ্চতায় পৌঁছুলে সমগ্র বিশ্বলোক হয়ে যায় একটি ফুল আর কবি হয়ে যান তার অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় চরিত্র তা কল্পানাতেও আনা যায় না। সেখানে কোথায় ঈশ্বর, কোথায় তাব সৃষ্টি?

মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই আছি বসে,
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল। (গীতাঞ্জলি-৪৮)

যাবার দিনে যে কথাটি তিনি জানিয়ে যেতে চেয়েছেন —

এই জ্যোতি: সমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই। (গীতাঞ্জলি-১৪২)

এ শুধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। ফুলের সৌন্দর্য দর্শন নয়, ফুলের সৌরভ আঘ্রান নয়, ফুলের মাধুর্য আস্বাদ করে তিনি ধন্য। ফুল তো বিশ্বের আধেয় মাত্র। রবীন্দ্র চেতনায় ফুল হয়ে উঠেছে বিশ্বলোকের আধার। সেই পুষ্পিত পূর্ণতার মদ্য পান করেছেন তিনি। পুষ্পের আধারে সৌন্দর্য চেতনার এবং মাধুর্য আস্বাদনের এমন সংহত সম্পূর্ণতা আর কেউ রচনা করেছেন? করতে পারবেন?

বিশিষ্ট গবেষক ও বাংলা ভাষাসাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় বর্তমানে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর সহ-সভাপতি।

রবীন্দ্রভুবনে : ছবি ও গান

ড. শীলা ভট্টাচার্য

এই টলমলে অবস্থায় এখনো দুটি পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বাণপ্রস্থের — গান ও ছবি। (প্রবাসী কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা ১৩৪৫, মুদ্রিত পত্র)।

মৃত্যুর ঠিক আড়াই বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিলোকের যে দুটি মহলের 'পাকা ঠিকানা'র আভাস দিয়েছিলেন, তার সন্ধান কিছুটা দুরূহ। তবু প্রকৃত সমঝদার না হয়েও অনধিকার চর্চার মতোই এই দুটি শিল্প সম্পর্কে কিছু বলবার আগ্রহ পেয়ে বসে। 'ছবি ও গান' এই দুটি শিল্প কবির বাণপ্রস্থ পর্বে সৃষ্টিলীলার বঁধু হয়ে উঠেছিল। বাণী চন্দের সঙ্গে আলাপচারিতায় সরসভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন —

> .... লেখাটা যেন আমার বড়োগিন্নি, আটপৌরে। সে সবসময়ে সকলের সামনেই বের হয়। কোনো দ্বিধা-সংকোচ নেই। ছবি হল আমার ছোটোগিন্নি, তাকে একটু তোয়াজ করলেই সে ভোলে। কিন্তু আমার মেজো গিন্নি - আমার গান, সে যখন আমার কাছে আসে তখন কাউকেই সে সইতে পারে না। (গুরুদেব-বাণীচন্দ)

কবিতা, ছবি ও গান তিনটি শিল্পের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের অন্তরের অনুরাগ ছিল সমান। মনের অনুভব প্রকাশের ক্ষেত্রে সময় বিশেষে কোনো একটি বা দুটি শিল্পের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃত গীতিকবিতায় ছবি ও গানের সার্থক সমন্বয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন :

> বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়)

রূপ ও রস ব্যতিরেকে তো সাহিত্য অনুপম হয় না। এ সত্য উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছিলেন :

> অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।

পরবর্তীকালে চিত্রকলা ও সংগীতই স্বতন্ত্র শিল্পরূপে রবীন্দ্রনাথকে খ্যাতির শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে।

প্রথমেই আসা যাক ছবির কথায়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছিলেন 'ছবি ও

গান' বাণপ্রস্থের এই দুই লীলাসঙ্গিনীর মধ্যে 'মাতনের মাত্রা অনুসারে' গানের চেয়েও ছবির বেগ ছিল অধিক। প্রকৃত রসবোদ্ধা না হয়েও ছবির ভুবনে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা জাগে। জীবনের গোধূলিবেলায় রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় মগ্ন হয়েছিলেন। সাবলীল গতিতে বেরিয়ে এসেছিল রেখা ও রঙের ঝরনাধারা। সেই অভ্যুদয়ের পশ্চাতে ছিল কিছু সূত্র বা তথ্য যা শিল্পরসিক মহলে অবিদিত নয়, রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠার নেপথ্যে আছে কিছু ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এক অদৃশ্য চিত্রকরের অবিরাম চিত্র অঙ্কনের কথা বলেছেন। কবির অন্তর্লোকে অবস্থান করে যে চিত্রকর ভাষার তুলিকায় এঁকেছেন রবির কবি হয়ে ওঠার কাহিনিচিত্র। রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে দেখেছেন ছেলেবেলার বিচিত্র ছবি। কোনোটা স্পষ্ট, কোনোটা বা অস্পষ্ট।

> আমি অনেক সময়েই দোতলার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। ...... এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। .... তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না।

ছবির প্রতি এই অনুরাগ ('জীবনস্মৃতির' 'ছবি ও গান' ও 'বর্ষা ও শরৎ' প্রবন্ধে চিত্রচর্চার উল্লেখ আছে।) কবির কৈশোরেই সূচিত হয়েছিল। তখন কবিতায়, সংগীতে, অভিনয়, চিত্রাঙ্কনে স্বাদেশিকতায়, ঠাকুরবাড়ির মধ্যে সংস্কৃতির আবহাওয়া বিরাজ করতো। শিল্পচর্চায় দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্র ও গুণেন্দ্রনাথদের অবদান কম ছিল না। বাড়ির এই পরিবেশের প্রভাবেই অঙ্কনের প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে থাকবে।

যৌবনে কবি পদ্মাপারে এসে প্রকৃতির অপরূপ শ্যামল সজীব চিত্র দর্শনে বিমুগ্ধ। কর্ম কর্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে নানা বই নাড়াচাড়া করেন। ছিন্নপত্রাবলীর একটি পত্রে ছবি দেখা ও আঁকার প্রসঙ্গে ইন্দিরাদেবী জানান—

> রবি বর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকালবেলাটা গেল। আমার সত্যি বেশ লাগে। ..... কল্পনার মতো অমন একটা নিয়ত পরিবর্তমান জিনিসকে প্রত্যক্ষের কঠিন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে -- সে কি সামান্য ব্যাপার!

সাহিত্যরচনার মতো চিত্ররচনাও শিল্পীর ক্ষমতার অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্রনাথ সেইসময় প্রাকৃতিক অপরূপ অনুভূতিকে ভাষা ও ছন্দে রূপ দেওয়ার পাশাপাশি রঙ ও রেখায় মূর্ত করবার প্রচেষ্টায় মগ্ন ছিলেন।

> .... আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের খেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা Sketch Book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছি।

রবীন্দ্রনাথ চারু ও কারু শিল্পের দেশ জাপান যান ১৯১৬ সালে। ১৯১৩ সালে ওই দেশের খ্যাতনামা শিল্পী ওকাকুরা মারা যান। তাঁর সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে তাঁর গৃহ পরিদর্শন করেন। আধুনিক আর্ট আন্দোলনের দুই সেরা শিল্পী তাইক্কান ও খানজান শিমোমুরার কথাও জানতে পারেন।

> 'তাহারা প্রথার বন্ধন হইতে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েছিলেন।
>
> (রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়)

এই ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করে। তিনি ২৪ আগস্ট, ১৯১৬ সালে অবনীন্দ্রনাথকে জাপানের চিত্রচর্চা সম্পর্কে জানান :

> The more I travel and see Japan .... How vital it is to get into close contact with the living art of this country in order to infure life into our own art ..... Our country has no artistic atmosphere.

যে কোনো সৃষ্টির পিছনেই তো স্রষ্টার সাধনা দরকার। সেই বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে কন্যা মীরাকে জানান —

> চিত্রবিদ্যা তো আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তা হলে একবার দেখাতুম আমি কী করতে পারতুম। (চিঠিপত্র-৪)

১৯২৪ সালে আর্জেন্টিনা গিয়ে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার স্ফূর্তি ঘটে। তখন 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি রচনা করার সময় পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় মেতে উঠতেন। সুদূর আর্জেন্টিনার লেখিকা ভিকতোরিয়া ওকাম্পো (যার আতিথ্যে রবীন্দ্রনাথ বুয়েনাস এয়ারসের রমনীয় পরিবেশে সময় অতিবাহিত করেছেন) স্মৃতিচারণায় লিখেছেন —

> ওঁর একটি ছোটো খাতা টেবিলে পড়ে থাকত। ওরই মধ্যে কবিতা লিখতেন বাংলায়। .... এই খাতা আমায় বিস্মিত করল। লেখার মধ্যে কাটাকুটিকে একত্র জুড়ে দিয়ে তার ওপর কলমের আঁচড় কাটতে যেন মজা পেতেন কবি। এই ছোটো খাতাটাই হল শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সূচনাপর্ব। ..... তাঁর এই আঁকিবুঁকিতে (ইংরেজরা যাকে বলে doodles) আমি তো মেতে গেলাম।
>
> (ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, শঙ্খ ঘোষ)

নাতনি নন্দিনী দেবী 'আমার দাদামশায়' স্মৃতিচারণায় (দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৪) জানিয়েছেন আর্জেন্টিনায় পাঠানো তার চিঠিগুলির কাটাকুটি অংশগুলি নিয়ে রবিন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন।

> "আমার মনে হয় সেই আমার চিঠিতে আঁকিবুঁকি করে যে ছবি তিনি এঁকেছিলেন সেই ছবি থেকেই তাঁর ছবি আঁকার সূত্রপাত।"

সত্তর উপান্তে পৌঁছে কবি মগ্ন হলেন ছবি আঁকায়। কবি যখন চিত্রকর তখন চিত্রকলায়

নতুন ব্যঞ্জনা বা মাত্রা সঞ্চারিত হয় এবং তা নিরর্থক তো নয়ই বরং অর্থবহ হয়ে ওঠে। ছবি মনের ভাবকে রূপের সৌন্দর্যে বিভূষিত করে। কাজেই সাহিত্যে যেমন ভাষা সমৃদ্ধ হয় চিত্রকল্পের ব্যবহারে, সেইরকম চিত্রের মাধ্যমেও গভীর ভাব রেখায় রেখায় ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। যদিও তিনি 'শেষ সপ্তক'-এর একটি কবিতায় বলেছেন :

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনী ঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।

রবীন্দ্রনাথের রেখার সাধনা নিরর্থক হয়নি, চিত্রকররূপে স্বদেশে নয় বিদেশেই খ্যাতি অর্জন করলেন। ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর ব্যবস্থাপনায় প্যারিস নগরীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর শুভ সূচনা ঘটে। তারপর ইউরোপের অনেক শহরেই এই পরিচয় ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভিকতোরিয়াকে (বিজয়াকে) লেখেন —

Dear Vijaya,

I do not know what to say to you. About my reputation as an artist it is too sudden for me to take it seriously but your own association with this exhibition and my pictures has a very deep hold upon my mind.

কালক্রমে বিদেশে সমাদৃত রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার মর্যাদা এদেশের মানুষও দিতে শুরু করেন। অবশ্য ইতিপূর্বেই তাঁর স্বপ্নের বিশ্বভারতীতে নানা বিদ্যাশিক্ষার আয়োজনের সাথে সাথে চিত্রবিদ্যাচর্চার জন্য ১৯২৩ সালে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশ প্রত্যাগত চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপাতে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আগ্রহী হয়েছিলেন। এইসময় সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দে'র উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ক্ষমতা লোপ পেলেও রবীন্দ্রনাথের মন ছিল সজীব ও সচল। সরসভঙ্গিতে নাতনিসমা মৈত্রেয়ী দেবীকে জানান :

ভাগ্যে চিত্রকলা আমার শেষদশায় আমাকে বরণ করেছিল। তাই আমার দিনান্ত কালটা নিরর্থক হচ্ছে না। (স্বর্গের কাছাকাছি / মৈত্রেয়ী দেবী)

পকৃতপক্ষেই তাঁর শেষবেলাকার সঙ্গিনী চিত্রলেখার সঙ্গে বোঝাপড়া হয়েছে গোধূলি লগ্নে। রবীন্দ্রভাষায় 'যাকে বলে হানিমুন .... নির্জনতায় সম্ভোগ'। রবীন্দ্রনাথ জীবনের আসন্ন রাত্রির মুখে এই লীলা সঙ্গিনীর সঙ্গে একান্ত লীলায় মগ্ন হয়েছিলেন বলেই তাকে

লোকসমক্ষে নিয়ে আসতে দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন। ছবি প্রদর্শনী সম্পর্কে কুন্ঠা প্রকাশ করে অমিয় চক্রবর্তীকে বলেন :

> আমার মৃত্যুর পর আবরণ উন্মোচন কোরো — তখন ওর মূল্য হবে ঐতিহাসিক দিক থেকে।

চিত্রশিল্পী যামিনী রায় জানিয়েছেন :

> রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যথোপযুক্ত আলোচনা এখনও হয়নি সে কাজ করতে হ'লে ইউরোপীয় শিল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তির প্রয়োজন। (শনিবারের চিঠি ১৩৪৮-১৩৪৯)

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার স্বরূপ উন্মোচনের প্রচেষ্টা অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথের চৈতন্য অন্তঃপুরের জাদু নর্তকীরা একদিন পর্দানশীন ছিল আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে যোগ্য চিত্র রসিকদের দ্বারা সমাদৃত হবার অপেক্ষায়।

শেষ বয়সে চিত্রকলার মতো সংগীতও রবীন্দ্রমনের আনন্দ বিধায়ক সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। নিজের অন্যান্য রচনা অপেক্ষা সংগীতের স্বতন্ত্রমূল্য স্বীকার করে আলাপচারিতায় বাণীচন্দকে জানান : "এক হিসাবে আমার মনে হয় গানটা একটু বেশি স্থায়ী।"

চিত্রলেখার সঙ্গে জীবন গোধূলিতে গভীর পরিচয় ঘটলেও গীতলেখার সঙ্গে অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের ছিল জীবনভোর, হৃদ্যতার সূচনা প্রভাতীবেলায়। বাল্য ও কৈশোরে জ্যোতিদাদার প্রভাবে সুরের প্রতি আগ্রহী হন, জ্যোতিদাদা সুর সৃষ্টি করতেন। রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে কথা বসাতেন, সুর ও বাণীর যথার্থ সংযোগেই সৃষ্টি হয় সংগীতের মায়াজাল। জীবনস্মৃতির 'গান' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> "গানের কথাকে সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণির সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন গান অন্তরের ঐশ্বর্য।

> '..... সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটি দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত।' (বিলাতী সংগীত, জীবনস্মৃতি)

এই তাগিদ থেকেই রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করে গেছেন। 'গীতাঞ্জলি'র তর্জমা বিদেশের জ্ঞানী ও গুনী ও রসবোদ্ধা কেন গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কে তিনি লন্ডন থেকে লেখাপত্রে (৬ মে, ১৯১৩, চিঠিপত্র ৫ম) জানান :

> "এ আমার জীবনের ভিতরকার জিনিস — এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন - এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে।"

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান কেবল গীতসাহিত্য হিসাবেই নয়, তার অনুপম সাহিত্যমূল্য আছে। যেমন সুর সম্পর্কে ধারণা না থাকলেও রসবোদ্ধা 'গীতবিতান' পাঠে আনন্দ

পান। এর সুর অপেক্ষা ভাবের গৌরব বেশি। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সচেতন হয়ে গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখেছিলেন।

> ...... ভাবের অনুসঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।

গানের বাণীর গুরুত্ব স্বীকার করে কখনো নিজ রচিত সংগীতের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করেছেন। 'রবিরশ্মি'র রচয়িতা চারুচন্দ্রকে 'ধীরে ধীরে বও উতলা হাওয়া'– গানটিতে 'প্রদীপ শিখা' ও 'আমি' এই দুয়ের সম্পর্কটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন :

> .... সে গানে প্রদীপ শিখায় ও করিব চিত্তে কোনো প্রভেদ আছে বলে মনে করিনে। ... প্রদীপ শিখার সঙ্গে ভোরবেলাকার তারার স্বাভাবিক সখিত্ব। .... অন্তিম মুহূর্তের জানাশোনা হবে দুজনের। সেই যে তাদের বাণী মরণ দূতের জন্য অপেক্ষা করছে উতল হাওয়ার কানে কানে সেই কথাটি দেবার ইচ্ছা আছে শ্রীমতী দীপশিখার। অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অকথিত বাণীর বেদনা-গান একে বলা যায়। এ গান কত বার কত কুণ্ঠিত হৃদয়ে বসন্ত নিশীথে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে — কবি তাকেই সুর দিয়ে দিয়েচে।

এভাবেই অনেক অকথিত বাণীই ভাবের আকার পেয়ে সুরের রসে সিক্ত হয়ে উঠেছে। কর্ম কর্তব্যের জালে জড়িয়ে পড়লেও অনবকাশের মাঝে ছোটো ছোটো মুহূর্তগুলি ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়ে ওঠে গানের কথা ও সুরে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের ভিতর দিয়েই বিশ্বভুবনকে নতুনরূপে অনুভব করেছিলেন। তাঁর লিখিত গান সুরারোপিত হবার পর স্বরলিপি রচনা করে বিশ্ববাসীর প্রাণের সামগ্রী করে তুলতে যিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন তিনি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে (২ পৌষ, ১৩৩৯) আশীর্বাদ করেছিলেন কাব্যিক ভাষায় :

> রবির সম্পদ হত নিরর্থক, তুমি যদি তারে
> না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।
> সুরে সুরে রূপ নিল তোমা-'পরে স্নেহ সুগভীর,
> রবির সংগীতগুলি আশীর্বাদ রহিল রবির। ('পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থ)

রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি রচনায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। সুরের পূজারি দিনেন্দ্রনাথের হাতে 'আশ্রমের আনন্দভাণ্ডারের চাবিটি' তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আনন্দে ছিলেন। ১৯১৬ সালে জাপান যাত্রাপথে তোসামারু জাহাজ থেকে লেখা পত্রে দিনেন্দ্রকে বলেন :

> তোর বেণুকুঞ্জের সভাতে এসরাজে মেঘমল্লারের সুর লেগেচে। আমিও কিছুকালের জন্য চলে এলুম, আমাদের আশ্রমের আনন্দ ভাণ্ডারের চাবিটি তোর কাছেই রইল,

সকলে বিকালে শিশুগুলিকে সুরের সুধা বণ্টন করে দিস। (দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯০)

এই জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শন করে গান রচনা করে চলেছেন। তিনি বলছেন :

> কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টি শুরু হল। .... দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।' — তারপরে বীণা বাজাও তার পরে পূর্ণ আনন্দ।'

এর পরেই তিনি লেখেন 'ভুবনজোড়া আসনখানি।'

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন তাঁর গান অনাগত কালের বড়ো সম্পদ হয়ে উঠবে। তাই তা যথাযথভাবে যাতে রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে ছিলেন সচেতন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের কর্মী ও ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কিশোরীমোহন সাঁতরাকে বলেন :

> "আমার রচিত গানের সুরগুলি রক্ষা করার যোগ্য বলেই আমি কল্পনা করি — আমার কাব্যের কোনোকালে অনাদর হতেও পারে কিন্তু বাংলাদেশের লোককে সুখে দুঃখে আমার গান গাইতেই হবে — সেই গানের সুরগুলি যদি বিকৃত বা লুপ্ত হয় তবে দেশের ক্ষতি — এ আমি অহংকার করেই বলতে পারি। (আকাদেমি পত্রিকা, ১৪০০)

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সুযোগ্য কিছু মানুষ তাঁর গান শিখে নিক। এর জন্য চাই নিষ্ঠা আন্তরিকতা। রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। ১৯৩৫ সালে 'সুরের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী সুগায়িকা অমিতা সেনকে সংগীত ভবনের ভারগ্রহণে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর সংগীতকে চিরকালীন সম্পদ করে তুলতে হলে চাই নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলন। এক্ষেত্রে সুযোগ্য গায়ক গায়িকার ভূমিকা আছে। ভালো শিক্ষক হিসেবে শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষ সেই সময় সংগীত ভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবি বুদ্ধদেব বসুর পত্নী, কবি প্রতিভা বসু রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বলেন —

> যদি বিশুদ্ধ করে শিখতে চাও তবে মাঝে মাঝে এখানে এসে যথারীতি অভ্যেস করে যেয়ো।

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে আনন্দ বিধায়ক সৃষ্টি তার গান। গদ্য-পদ্য প্রবন্ধ নাটকে বিচিত্র ভাবনা রূপায়িত তারই ব্যঞ্জনা বা মর্মবাণী গানে শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনুভব করেছিলেন সংগীতই তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, জীবনের চলার পথের পাথেয় তাই বুঝি গেয়েছেন :

> কণ্ঠে নিলেম গান, শেষ পারানির কড়ি ....।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বাংলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপিকা ড. শীলা ভট্টাচার্য বর্তমানে মুর্শিদাবাদের কান্দিরাজ কলেজে কর্মরতা।

ভারতীয় সংগীতের ধারায় রবীন্দ্রসংগীত

ড. শুচিস্মিতা সান্যাল

'আমাদের সংগীত একের গান, একলার গান — কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক।' রবীন্দ্রনাথের এই সুচিন্তিত মত থেকেই স্পষ্ট যে তিনি মনে করেন ভারতীয় সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য তার একাকীত্ব। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও কিন্তু তাঁর দার্শনিক চিন্তা ও সাধনায় সর্বদাই সঙ্গীহীন, একক। ফলে তাঁর একক সেই সত্তার সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের মিল সহজেই সংবেদী শ্রোতা খুঁজে পান। আমাদের স্বভাবতই মনে পড়বে মহাত্মা গান্ধির অত্যন্ত প্রিয় রবীন্দ্রসংগীতটি — 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে / তবে একলা চলো রে।'

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখি, রাগরাগিণী কত প্রাচীন তা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রাচীন ভারতীয় রাগসংগীত প্রাদেশিক সুরকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, তার সঙ্গে মিশেছে বিদেশি সংগীতের রেশ, ফারসি খেয়াল, ইরানি গজল। যদিও মধ্যযুগে অতি রক্ষণশীল সংগীত বিশেষজ্ঞদের কঠোর নিয়মে রাগসংগীত বদ্ধ জলাশয় হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কথা ও সুরের সমগুরুত্ব সৃষ্টি করলেন। এই গুণটি ভারতীয় রাগসংগীতে নেই — সেখানে সুরেরই আধিপত্য। যদিও রবীন্দ্রনাথ বহু গানে ব্যবহার করেছেন প্রচলিত রাগ-রাগিণীর সুর, তাঁর প্রিয় রাগ ছিল ভৈরবী, ইমন, টোড়ী, পুরবী, ললিত, খাম্বাজ, মল্লার। আমরা জানি ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র রাগ-রাগিণীর জন্য নির্দিষ্ট সময় স্থির করে দিয়েছে, যেমন ভোরে গাওয়া হবে ভৈরবী, গভীর রাত্রে টোড়ী। রবীন্দ্রনাথ সকল ক্ষেত্রে সেই বাঁধা ধরা নিয়মকে মেনে ব্যবহার করেননি, কখনো নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে সুরের চলনটি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র, একদা সচিব, সুপণ্ডিত কালিদাস নাগ বলেছেন — 'গীতাঞ্জলি পর্যন্ত স্বরলিপিকারদের তিনি কোনো বাধা দেননি রাগরাগিণী ও তালের নির্দেশ ছাপাতে। তারপর থেকে তিনি এসব নির্দেশ তুলে দিয়েছেন।' অর্থাৎ রাগরাগিণীর প্রথাগত ব্যবহার প্রথমযুগে রবীন্দ্রসংগীতে থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজস্বতার সঙ্গে রাগরাগিণীকে তাঁর গানে ব্যবহার শুরু করলেন। চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর - ''আজি বারি ঝরে ঝরঝর' গানটি শুদ্ধ ইমনে রচিত।

বর্ষার গানে ইমন ব্যবহার করে সমস্ত প্রচলিত রেওয়াজ ভাঙলেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ এই প্রয়োগের সার্থকতা গানটির ভাব থেকে সহজেই অনুভব করা যায়।"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানে ধ্রুপদের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশেষত ধ্রুপদের চারটি কলির প্রভাবেই রবীন্দ্রসংগীত চারকলি বিশিষ্ট - অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। যদিও রাগসংগীতে ধ্রুপদে যে লয়ের কৌশল দেখানো হয় - দ্বিগুণ, চতুর্গুণ লয়ের ব্যবহার সেটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুপস্থিত। যদিও ধ্রুপদের গাম্ভীর্য, পরিপূর্ণতা তিনি গ্রহণ করেছেন। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন ধ্রুপদের ভাবগম্ভীর গাম্ভীর্যে। ধ্রুপদে ব্যবহৃত তালও রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে চৌতাল বা তেওড়া তাল। আসলে রবীন্দ্রনাথের মেজাজ তেওড়ার ঝোঁককে ভালোভাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিল, তাঁর বহু গানে তেওড়া তাল ব্যবহার করেছেন।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গসংগীত বলতে উত্তর ভারতের গানকেই আমরা বোঝাই - যদিও দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতেরও এক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ধারা বহমান। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দক্ষিণ ভারতের এই সংগীতকেও অবহেলা করেননি, তাকে নিজের সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেন। কানাড়ী, মহীশূরী, মাদ্রাজী সুরেরও বেশ কিছু গান রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন। যেমন কানাড়ী সুরে রচিত — 'বড়ো আশা করে এসেছি গো', 'আজি শুভদিনে', মহীশূরী সুরে প্রভাবিত রবীন্দ্রসংগীত — 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ'। মাদ্রাজী সুরে রচিত 'বেদনা কী ভাষায়', 'বাজে করুণ সুরে'।

জীবনের মধ্যপর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোকসংগীতের যুগ যুগ ধরে বহমান ধারাকে তাঁর গানে বেশি ব্যবহার করেছেন। বিশেষত কীর্তন ও বাউল গানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাছাড়াও রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি, সারি গানের সুরও বহু রবীন্দ্রসংগীতে ছায়া ফেলেছে। কেবলমাত্র সুর নয়, তাঁর গানে কথার যে গুরুত্ব তিনি দিয়েছেন সেটিও বাংলার নিজস্ব কীর্তন ও বাউল গানেরও মূল বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সংগীতে রাগরাগিণীর সুরই মূল, কথা সেখানে অকিঞ্চিৎকর। রবীন্দ্রসংগীতে আমরা দেখি ঘনবদ্ধ নির্দিষ্ট সুরের রূপ, উচ্চাঙ্গসংগীতের আলাপ বা তানের বিস্তার সেখানে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপিবদ্ধভাবে প্রকাশিত। কারণ গানে কথার গুরুত্ব অনুসারে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছেন, প্রয়োজনে রাগ মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, কখনো বা বাউলের সুর দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কখনো কখনো মূল কোনো গানের কথা ও সুর তিনি হুবহু অনুসরণ করেছেন কিন্তু শেষে গানটি পরিণত হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতে। যেমন 'আজ বহুত সুগন্ধি পবন' গানটি হয়েছে 'আজি বহিছে বসন্ত পবন'। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের

সময় রবীন্দ্রসংগীতে আমরা দেখেছি লোকসংগীতের দৃপ্ত সুর ও মুক্ত ছন্দের প্রভাব। এই সময়পর্বের এক আশ্চর্য গান হল — 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' পরবর্তীকালে এই মধুর বঙ্গপ্রেমের গানটি হয়ে উঠল স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। মূল গানটি ছিল গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' – যে গানের বিষয় নিঃসঙ্গ বাউলের মনের মানুষের জন্য অনুসন্ধান। রবীন্দ্রনাথ সেই সুরটি অনেকাংশে গ্রহণ করলেও ভাবটি পরিবর্তিত হল, যা হয়ে উঠল স্বদেশপ্রেমের সকলের সমবেত সংযোগের গান।

প্রাচ্য সংগীতের পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতে আমরা দেখি পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব। জীবনের প্রথম পর্বে রচিত 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যে পাশ্চাত্যগানের প্রভাব স্পষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানোর সুরে সুরে কথা বসিয়ে গান রচনা করার কথা তো আমরা জানি। 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে', 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ' — গানে পাশ্চাত্য জার্মানি রীতিকে কাজে লাগানো হয়েছে। জীবনের শেষপর্বে রচিত চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, নৃত্যনাট্যেও পাশ্চাত্যরীতির অপেরার প্রভাব বর্তমান। যদিও বলতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীতকে আত্মীকরণ করেছেন। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রসংগীত হয়ে উঠেছে তাঁরই মৌলিক গান।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ, সারা জীবনে সাহিত্য, শিল্পের নানা শাখায় অনায়াস ছিল তাঁর বিচরণ। কিন্তু গান ছিল তাঁর বিশেষ ভালোবাসার। গান সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি, আশ্চর্যের বিষয় তাঁর রচনাগুলি অনুসরণ করলে আমরা দেখি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। জীবনের প্রথমপর্বে রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে গানের কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সমকালে প্রচলিত বাংলা গানের অকিঞ্চিৎকর কথা, অন্যদিকে ওস্তাদ গায়কদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের তানকর্তবের বাহুল্য তাঁকে বিরক্ত করেছিল। প্রথম জীবনের রবীন্দ্রগানেও তাই কাব্যের প্রাধান্য। মধ্যবয়সে কবির মনে হয়, কথা ও সুর উভয়ের সঠিক মিলনেই গড়ে ওঠে 'প্রকৃত গান'। তাই ১৩২৮ বঙ্গাব্দে রচিত 'আমার সংগীত' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন – 'গান রচনা অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলনসাধনাই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।' জীবনের শেষপর্বে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – 'কথা ও সুরের মিলে যদি সম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সেটা হয়েছে বলেই তার আদর, সেই হওয়ার গৌরবেই সৃষ্টির গৌরব।'

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল তাঁর গান যেভাবে রচিত হুবহু সেভাবেই তাকে গাওয়া হবে। সংগীতকার দ্বারা নির্দিষ্ট 'কম্পোজিশন' হিসাবে গানকে দেখা, এটি কিন্তু,

পাশ্চাত্যের ধরন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, পাশ্চাত্যসংগীত রসজ্ঞ সত্যজিৎ রায় মনে করেন — 'একটি গানের এই যে অবিকল্প রূপের ধারণা, এটা এদেশের নয়। .... রবীন্দ্রনাথের গীত রচনার ধারণাটা আসলে ইউরোপীয়।'

প্রকৃতপক্ষে কথা ও সুরের 'হরগৌরী মিলন' রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত ছিল বলেই সুরের প্রকৃত রূপটি অবিকৃত রাখার পক্ষে ছিলেন তিনি। কারণ তানকর্তব হলে কথা ও সুরের সমানুপাত বজায় থাকে না। বাংলা লোকসংগীতের যে আদর্শ তাতে কথা ও সুরের সঠিক মিলন ফুটে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের গানে তারই আধুনিক পরিশীলিত রূপটির যেন দেখা মেলে।

তাহলে রবীন্দ্রনাথের গানে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ভারতীয় উচ্চাঙ্গ মার্গসংগীত, ভারতের নানা প্রদেশের লোকসংগীত বিশেষত বাংলার গ্রামীণ সংগীত ও ইউরোপীয় সংগীতের প্রভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি, কখনোই অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। বাংলার নিজস্ব কীর্তন ও বাউল গানে চিরদিনই কথার অধিক গুরুত্ব; অন্যদিকে ভারতীয় মার্গসংগীতে সুরবৈচিত্র্য অসাধারণ কিন্তু গানের কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। রবীন্দ্রনাথ যেন সংগীতের এই দুই গঙ্গা-যমুনা মিলনে সৃষ্টি করলেন তাঁর নিজস্ব সংগীত। কথা ও সুরের সঠিক মিলনে তিনি রচনা করেছেন একটি পরিপূর্ণ গান - যা একটি নিটোল শিল্পসৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের দীর্ঘ সময়কাল ধরে, কৈশোর থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। তাঁর প্রথম গান সম্ভবত ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের অন্তর্গত 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'। জীবনের শেষ নববর্ষ ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ প্রায় আশি বছর বয়স্ক কবি রচনা করেন 'ঐ মহামানব আসে'। রবীন্দ্র সমালোচকদের মতে এটি সম্ভবত তাঁর শেষ গান। দীর্ঘ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গানের বিবর্তন ঘটেছে। জীবনের প্রথম পর্বে প্রচলিত ব্রাহ্মসংগীতের বাহুল্য, মধ্যপর্বে দেশপ্রেম ও পূজা পর্যায়ের গান অধিক, শেষপর্বে প্রেম ও প্রকৃতির গান অধিক। সুরের দিক থেকে দেখলে প্রথমপর্বে মার্গসংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব অধিক, দ্বিতীয়পর্বে লোকসংগীত ও রাগসংগীতের আত্মীকরণ, শেষপর্বে তিন প্রকার সুরেরই অনবদ্য মিশ্রণ। শেষপর্যন্ত বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের গান সুর, কথা মিলেমিশে হয়ে উঠেছে নিজস্ব সৃষ্টি; তাই ভারতীয় সংগীতের ধারায় এটি নিজস্ব পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রসংগীতে মগ্নপ্রাণা ড. শুচিস্মিতা সান্যাল বর্তমানে নদিয়ার শান্তিপুর কলেজে বাংলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপিকা।

গীতাঞ্জলি : শতবর্ষ পরে

সাধন দাস

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবর্ষে তাঁর রচিত একটি গ্রন্থেরও শতবর্ষ পালিত হচ্ছে মহা আড়ম্বরে। এই একটি বিষয়ে বাঙালি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। লেখক বা কালজয়ী গ্রন্থের শত বা দ্বিশত বা সার্ধশত বর্ষপূর্তির বিশেষ ক্ষণটিকে সে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মনে রাখে এবং সাড়ম্বরে তার জয়ন্তী উদ্‌যাপনও করে। কিন্তু লেখকের প্রতি বা তাঁর গ্রন্থটির প্রতি উদ্‌যাপকের আন্তরিক সম্পর্ক কতটা গভীর - সে ব্যাপারে বিতর্ক থেকেই যায়। গ্রন্থটি হল — 'গীতাঞ্জলি' — যার সঙ্গে বাঙালি তথা ভারতীয়ের প্রথম নোবেল পাওয়ার আবেগ ও অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। তারজন্যই বোধহয় কবির প্রায় অর্ধশত কাব্যগুচ্ছের মধ্যে একমাত্র গীতাঞ্জলির প্রকাশকালের প্রতি এই বিশেষ নজর।

তা, ভালো কথা। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় — ১০০ বছর পর গীতাঞ্জলির কবিতাকে কি আলাদা করে চিনতে পারেন পাঠক? গীতাঞ্জলি মূলত গানের বই নয়, কবিতার বই। গত ১০০ বছরে এই কবিতাগুলি কি বাঙালির 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'কে জাগাতে পেরেছে কিছুমাত্র? গীতাঞ্জলির যে ইংরাজি অনুবাদ Song offering-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়েছেন, তা যে বাংলা গীতাঞ্জলির সব কবিতার হুবহু অনুবাদ নয় — তাও আমরা অনেকে ভালো করে জানি না। বরং বলা ভালো, রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষ গ্রন্থটির জন্য নোবেল পুরস্কার পাননি — ইংরেজি গীতাঞ্জলি বাংলা গীতাঞ্জলি থেকে স্বরূপত পৃথক।

বাংলা গীতাঞ্জলি প্রথম প্রকাশিত হয় ২২নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯১০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর (বাংলা ২০ ভাদ্র ১৩১৭)। ২০০ পৃষ্ঠার বই ১ টাকা দামে ছেপেছিল ১০০০ কপি। গীতাঞ্জলির প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতা অন্য বইতে ছাপা হয়েছিল। শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ২০নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের কান্তিক প্রেস থেকে শ্রী হরিচরণ মান্না কর্তৃক মুদ্রিত গীতাঞ্জলিতে কাগজ ছিল হোয়াইট ওভ ক্রাউন ১৬ সাইজ। বাংলা গীতাঞ্জলিতে মোট ১৫৭টি কবিতা ছিল, কবিতাগুলির প্রতিটি ছিল স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায়। এই ১৫৭টি কবিতার মধ্যে ৮৫টি কবিতাকে সুর দিয়ে গানে রূপ দেওয়া হয়েছে। ৭২টি কবিতা সুরবিহীন

রয়ে গেছে। ভুল সুরে গাওয়ার অভিযোগে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড যখন দেবব্রত বিশ্বাসকে সাসপেন্ড করে, তখন তিনি হয়তো কিছুটা ক্ষোভেই পরিমল হোমের দেওয়া সুরে ৭২টি সুরবিহীন কবিতার মধ্যে ২টি কবিতাকে গান হিসেবে গেয়েছিলেন। গান দুটি হল : (১) *যাবার দিনে এই কথাটি*, (২) *সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।*

গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গানের মধ্যে ৭টি গান ১৯০৮-এ লেখা 'শারদোৎসব' এবং ১৯০৯ এ লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে নেওয়া। শারদোৎবের ৬টি গান হল — আজ *ধানের ক্ষেতে, আনন্দেরই সাগর থেকে, তোমার সোনার থালায়, আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, অমল ধবল পালে লেগেছে ও আমার নয়ন-ভুলানো এলে।* প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ১টি গান হল — *বাঁচান বাঁচি মারেন মরি*। এই ১৫৭টি কবিতার মধ্যে কয়েকটি কবিতা নামসহ ইতিপূর্বে কোনো না কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন 'আমার মাথা নত করে' কবিতাটি 'প্রার্থনা' নামে 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকায়, 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপনে চাই' কবিতাটি 'দয়া' নামে ওই একই পত্রিকায়, 'কত অজানারে জানাইলে তুমি' কবিতাটি 'তুমি' নামে 'সুপ্রভাত' পত্রিকায়, 'বিপদে মোরে রক্ষা কর' কবিতাটি 'কামনা' নামে 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকায়, 'অন্তর মম বিকশিত করো' কবিতাটি 'প্রার্থনা' নামেই সেই 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'গীতাঞ্জলি' নামটিও কি কবির দেওয়া মৌলিক নাম? সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় জানাচ্ছেন যে, শিলাইদহ সংলগ্ন কুমারখালির বিখ্যাত তান্ত্রিক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ১৮৮৮ সালে 'গীতাঞ্জলি' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এই শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর জন উডরফ-এর দীক্ষাগুরু। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তখন গোটা বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় ও আলোচিত নাম। কবিও নিশ্চয়ই তাঁর নাম এবং তাঁর এই গ্রন্থটির কথা শুনে থাকবেন, কেন না তিনি তখন জমিদারি দেখাশোনার কাজে শিলাইদহে অবস্থান করছিলেন। নামটি সুন্দর বলে সুন্দরের পূজারি রবীন্দ্রনাথের অবচেতন মনে হয়তো বা 'গীতাঞ্জলি' নামটি ছাপ ফেলেছিল।

বাংলা গীতাঞ্জলি প্রকাশের দু'বছর পর ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দাম ছিল ১০ শিলিং ৬ পেন্স। এই গ্রন্থের আখ্যানপত্রে রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের একটি স্কেচ আঁকেন। ৭৫০ কপি বই ছাপা হয়। কিন্তু দু'মাসের মধ্যে সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে গেলে লন্ডনের ম্যাকমিলন কোম্পানি ১৯১৩ সালে মার্চ মাসে ৪১/২ শিলিং দামে বইটির পুনর্মুদ্রণ বাজারে ছাড়ে। সম্পাদনায় সাহায্য করেন এবং এর ভূমিকা লিখে দেন কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস। অনূদিত হয় ১০৩টি কবিতা।

কিন্তু এই ১০৩টি কবিতার সবগুলিই বাংলা গীতাঞ্জলি থেকে গৃহীত নয়। বাংলা গীতাঞ্জলির ১৫৭টি কবিতার মধ্যে মাত্র ৫৩টি আছে ইংরাজি গীতাঞ্জলিতে। তাছাড়া

নৈবেদ্য থেকে ১৬টি, গীতিমাল্য থেকে ১৬টি, খেয়া থেকে ১১টি, শিশু থেকে ৩টি, চৈতালি থেকে ১টি, কল্পনা থেকে ১টি, উৎসর্গ থেকে ১টি, স্মরণ থেকে ১টি ও অচলায়তন থেকে ১টি কবিতা। কিন্তু এই সংখ্যাগুলিকে যোগ করলে ১০৪ হয়। Song offerings-এ আছে ১০৩টি গান। আসলে নৈবেদ্যর ৮৯নং কবিতার সম্পূর্ণ এবং ৯০ সংখ্যা কবিতার শেষাংশ মিলিয়ে অনুবাদে তিনি 'একটি' গানের রূপ দেন।

সম্প্রতি আমেরিকার শিল্পী মার্ক ডব্লিউ ম্যাকগিনিস গীতাঞ্জলির কিবতাগুলি নিয়ে ইলাসট্রেশন করেও ফেলেছেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী এই খ্যাতিমান শিল্পী ২০০৫ সালে গীতাঞ্জলির উপর একটি সচিত্র বই বের করেন। বইটির কভারে লেখা আছে - 'রবীন্দ্রনাথ লিখিত এবং ম্যাকগিনিস চিত্রিত।' এই বইটিতে ম্যাকগিনিসের জলরঙে আঁকা ছবিগুলির মধ্যে আছে - নদীতে অর্ধনিমজ্জিত অবগুণ্ঠনবতী নারী, অজস্র দীপশিখার প্রজ্জ্বলন, জানলা দিয়ে দেখা দূরের অস্পষ্ট দৃশ্যপট, আকাশে উড়ন্ত বলাকার দল ইত্যাদি। ছবি হিসেবে সেগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নেই। কিন্তু গীতাঞ্জলির উচ্চ আধ্যাত্মিক ধ্যানের জগৎ ছবিগুলির মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। অনুবাদের মাধ্যমে মূলের স্বাদ তার কাছে যেমন ঠিকমতো পৌঁছায়নি, তেমনি সংস্কার ও ঐতিহ্যগত একটা দূরত্ব থাকাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু একথা ঠিক — অবাঙালি হয়েও ম্যাকগিনিসের রবীন্দ্রানুরাগে কোনো ফাঁকি ছিল না।

আজকাল বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে গীতাঞ্জলির গানগুলির পিকচারাইজেশন করা হচ্ছে। এগুলি দেখলেই বোঝা যায় - একশো বছর পরেও গীতাঞ্জলির ধ্যানের জগৎ থেকে আমাদের কতখানি মারাত্মক দূরত্ব রয়ে গেছে। 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই' গানটির পিকচারাইজেশন করতে গিয়ে যদি পর্দায় বারবার মোমবাতি জ্বালানো ও তা নিভে যাওয়া দেখানো হয়, তাহলে হাস্যকর বালখিল্যপনা ছাড়া তাকে কিছু বলা যায় না। বৃহত্তর জীবনবোধের যে বিপুলতা ও পরম সত্তার কাছে আত্মনিবেদনের যে ঐকান্তিকতা গীতাঞ্জলির গানগুলিকে উদার ব্যাপ্তি দিয়েছে, তার 'ভিস্যুয়াল এফেক্ট' যত দক্ষতার সঙ্গেই করা হোক না কেন, মাঝখানে একটা দুরতিক্রমণীয় 'হাইফেন' থেকেই যাবে। তার উপর আবার এই অক্ষম চেষ্টা! গীতাঞ্জলির ১০০ বছরে এই যদি 'প্রাপ্তি' হয়, তাহলে এই উদ্‌যাপনের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমরা, যারা আজ গীতাঞ্জলির শতবর্ষ পালনের হুজুগে মেতেছি, তারা কি কোনওদিন নিভৃতে গীতাঞ্জলির পাতাগুলি একটার পর একটা উল্টে গেছি? রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে ইন্দিরা দেবীকে গীতাঞ্জলি সম্পর্কে লিখেছিলেন -

"এই কবিতাগুলি আমি লিখব বলে লিখিনি - এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিস, এ আমার সত্যকারের আত্মনিবেদন — এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আকার ধারণ করেছে।"

কত শতাংশ বাঙালি পাঠক আজ এই আত্মনিবেদনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে - তা সমীক্ষাসাপেক্ষ। এগুলি শুধু একেকটা কবিতা বা গানমাত্র নয়, মানুষের নিভৃত আকাশের নির্জন ধ্রুবতারার মতো। গীতাঞ্জলির বিস্তৃত তথ্যপুঞ্জের কূটকাচালি ঝেড়ে ফেললেও এর অবারিত রসাস্বাদনে কোথাও ব্যাঘাত ঘটে না। আমরা কি কোনোদিন শূন্য হাতে এই কাব্যটির 'আসনতলের মাটির পরে' লুটিয়ে প'ড়ে ধুলায় ধুলায় ধূসর হতে পেরেছি? আমরা কি কোনোদিন অরূপরতনের আশায় গীতাঞ্জলির রূপসাগরে ডুব দিয়েছি? উচ্ছৃঙ্খল সংস্কৃতির উন্মত্ত তাণ্ডবে আমাদের নিজস্ব ধ্যানের জগৎ আজ এমনই আচ্ছন্ন যে আমরা প্রায় সবাই ভুলে গেছি 'হেথা যে-গান গাইতে আসা, আমার হয়নি সে-গান গাওয়া।' নশ্বর জীবনেও কীভাবে আমরা বারেবারে অশেষ হয়ে উঠতে পারি - তার বীজমন্ত্র তো লুকিয়ে আছে গীতাঞ্জলিতেই। তাকে যদি আমরা আমাদের জীবনানুভবে প্রয়োগ করতে না পারি, তাহলে মিথ্যা হবে গীতাঞ্জলির শতবর্ষ পালনের যাবতীয় সমারোহ।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বাংলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক সাধন দাস বর্তমানে মুর্শিদাবাদের অরঙ্গাবাদে অবস্থিত দুখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজে কর্মরত।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা

ড. সুকান্ত পাল

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণে বাঙালির ভাবরাজ্য যেসব বর্ণাঢ্য ও দীপ্তিময় পুরুষের সৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৃষ্টিশীলতার প্রায় সব জায়গাতেই তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক। তাই এখনও, তাঁর জন্মের সার্ধশত বছর পরও সব তরি এসে দাঁড়ায়, আশ্রয় খোঁজে এ তীরে। তাই এ যুগের গবেষক লিখতে বাধ্য হন,

> "Tagore's multidisciplinary creativity is so obvious that, one needs heardly mention it. Throughout his long life he produced not a stream but a torrent of poems, short stories, novels, musical dramas, plays, songs, literary and critical essays, philosophical works, and social education and political tracts .... near the end of his life, he took up paintaining in a serious way ... perhaps most significantly, Tagore was the inventor creator of an entirely new profoundly consequential musical genre – Rabindra Sangeet." [১]

এমন সৃষ্টিশীল, প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদ্ নিজের দেশকাল সমাজ নিয়ে যেমন লেখনী ধরেছেন তেমনি তাঁর দেশের ইতিহাস, ইতিহাস চর্চার বিষয়ে নীরব থাকবেন তা হতে পারে না। হয়ওনি। এই মহান মণীষীরও নিজস্ব একটা স্বতন্ত্র ইতিহাসবোধ ছিল। এ ক্ষুদ্র লেখায় আমরা চেষ্টা করব তাঁর সেই ইতিহাসবোধ বা চেতনাকে বোঝার এবং আরও একটু সাহসী হয়ে তাঁর ইতিহাস চেতনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করার।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে বহুগুণান্বিত, বহুকৌণিক উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতো দ্যুতিমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরন্তন ভারতবর্ষের আধুনিক রূপ। নবজাগরণের প্রভাবে সেই সময়ে ইতিহাস চিন্তার ও চর্চার একটি পরিবেশ নূতনভাবে তৈরি হয়েছিল। তখনকার ইতিহাসচর্চার তিনটি ধারা আমরা লক্ষ করি। এর মধ্যে প্রাচ্যতত্ত্ববাদের ধারাটি বেগবতী হয়ে ওঠে উইলিয়াম জোন্‌স্‌, কোলব্রুক, প্রিন্সেপ প্রমুখের দ্বারা। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় ধারাটিকে পরিপুষ্ট করে তোলেন কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারিরা। মুখ্যত খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। এঁরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আন্তরিকভাবেই অবজ্ঞা করতেন এবং খ্রিস্টান ধর্ম ও সংস্কৃতি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে যে উন্নত – এই প্রেরণা তাদের বৌদ্ধিক চর্চায় মুখ্য

স্থান পায়। তৃতীয় ও শেষ ধারাটি ছিল সম্পূর্ণ ভারতায় প্রেরণায় সমৃদ্ধ।

> "পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে দীক্ষিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা সোৎসাহে আত্ম আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত ইতিহাসের চর্চা শুরু করেছিলেন।"(২)

এই ইতিহাস চর্চায় যুক্তি ও আবেগ যেমন ছিল তেমনি বুদ্ধি ও অহংও ছিল। পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চমন্যতা প্রমাণের একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসচর্চার এরকমই একটি পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনার জগৎ বিকশিত হয়। ইতিহাস চর্চার উপরিউক্ত ধারাগুলি বর্তমান থাকলেও মণীষীর বৌদ্ধিক জগতে গ্রহণ বর্জনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে জন্ম নেয় এক নিজস্ব ইতিহাসবোধ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে উপরের তিনটি ইতিহাসচর্চার ধারাই ছিল বুদ্ধির স্তরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু বুদ্ধির স্তরেই সীমায়িত রাখেননি তাঁর ইতিহাসবোধ বা চেতনাকে। ইতিহাসচর্চার এক নতুন দিগন্তের সন্ধানে তিনি প্রসারিত করেন তার অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গিকে। এখানেই তিনি বিশিষ্ট।

এই বিশিষ্টতার কারণ হিসাবে বলা যায়, তিনি তো আর পেশাদারি, প্রথাসিদ্ধ ঐতিহাসিক নন; তিনি সাহিত্যিক, কবি এবং সর্বোপরি দার্শনিক। সাহিত্যিকের প্রধান উপকরণ তো মানব হৃদয়! ফলে তার ইতিহাস চিন্তার মহলে, ভাবনার আঠারো মহলায় মানব হৃদয়ের আনন্দ বেদনা, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, প্রক্ষোভ-সংক্ষোভ, শত্রুতা-মিত্রতা, ঘৃণা-ভালোবাসার কাহিনিই শিক্ষা ও তত্ত্বের রসে জারিত হয়ে, মানবজাতির মহান সূত্র — ঐক্যের, সহনশীলতার, মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক অপূর্ব রূপময়তায় তা প্রকাশিত।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যাখ্যায় তিনি যে প্রধান সূত্রটির উপর সব থেকে বেশি জোর দিয়েছিলেন এবং নির্ভর করেছিলেন তা হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সূত্রটি। ভারতীয় ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তিই হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। এখানেই পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার ইতিহাস থেকে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের বিশিষ্টতা। ভারতীয় সভ্যতার এই মর্মবাণীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থাপন করে চিরকাল তাঁর লেখনী ও চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করেছেন।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মর্মবাণীকে তিনি প্রকাশ করেছেন একটি প্রবন্ধের মধ্যে। তিনি লেখেন,

> "হিন্দু সমাজ যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়েছে তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শক জাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী, দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার - সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দু সভ্যতা এত বিচিত্র লোককে

আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে কিন্তু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই — উচ্চনীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে; সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।"

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বাণীকেই ধ্বনিত হতে দেখেন। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার সাধনাই ভারতবর্ষের সভ্যতার ধারা, বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করাই হলো ভারতীয় ইতিহাসের প্রাণশক্তি। তাই তিনি লেখেন,

> "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা; নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে একক নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা — বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা। ... ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। ... ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।" ... পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। একককে বিশ্বের মধ্যেও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা — নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার এটিই হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু ইতিহাসবোধই নয়, এই চেতনাই তাকে আজীবন তাড়িত করেছে তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির জগতকে। চিরকাল তিনি মানুষের ঐক্যে বিশ্বাসী, সহনশীলতায় আস্থাশীল। বহুর মধ্যে ঐক্যের মন্ত্রকেই জীবনের ধ্রুবতারা করে এগিয়েছেন — কারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাস তিনি হারাননি।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি, তা হল ইতিহাসের বিবর্তনে রাষ্ট্রধারাকে গ্রহণ না করে ভারতীয় সমাজের ধারাবাহিক অভিব্যক্তিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। একটি দেশের সমাজ বিকাশের ধারার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সেই দেশ, সেই সভ্যতার, সেই সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দনকে। তার মধ্য থেকেই তৈরি হয় সেই দেশের প্রকৃত ইতিহাস। সমাজের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র, শাসক প্রভৃতি। রাষ্ট্রের বা শাসকের প্রয়োজনে সমাজ নয়। অতএব একটি দেশের, সভ্যতার মূল চালিকাশক্তির উৎস সমাজের মধ্যেই

নিহিত। তাই ইতিহাসে সামাজিক অভিব্যক্তি রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির থেকে অনেক অনেক বেশি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক অভিব্যক্তি দিয়ে একটি দেশ ও সমাজের সম্পূর্ণ ও প্রকৃত ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ আমরা দেখি ইউরোপীয় ইতিহাস চর্চায় এই রাষ্ট্রের প্রাধান্য সমধিক। ইউরোপে এই রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির প্রাধান্য লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাস চর্চার দুর্বলতার প্রতি দিকনির্দেশ করে কারণকে চিহ্নিত করেন। তিনি লেখেন,

> "যারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে তাহারা রাষ্ট্র গৌরব লাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; ..... য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক; ... য়ুরোপীয় পলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না।"[৫]

পাশ্চাত্যের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পার্থক্য এখানেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা যে রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা নয়, তা যে একটি সামাজিক ইতিহাসের ধারা — এই চেতনার দ্বারাই রবীন্দ্র মানস সমৃদ্ধ। রাষ্ট্রসত্তা অপেক্ষা সমাজসত্তা যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে তা তিনি স্পষ্ট করে দেন আমাদের কাছে। তিনি লেখেন,

> "আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন — প্রজাসাধরণ সামাজিক কর্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সে জন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না — সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে। ... বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এর জন্য য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এই জন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বোতভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমানকালে প্রাসঙ্গিকতারও ঊর্ধ্বে। আধুনিক যুগে নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চেতনা ও রচনা পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই ইতিহাস রচনা পদ্ধতি হল সাধারণ নিম্নবর্গীয় মানুষের যে ইতিহাস নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা — তারই বিশ্লেষণ। একটি দেশ ও সমাজের ইতিহাস শুধুমাত্র রাজরাজড়ার যেমন ইতিহাস নয়, তেমনি উচ্চবর্গেরও ইতিহাস নয়। সমগ্র মানুষের মধ্যে যার নিম্নবর্গের তাদের যে অবদান তাকে অস্বীকার করা যায় না। এতদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় এই এলিট বর্গের দিকেই ছিল দৃষ্টিক্ষেপ বা এলিট বর্গের ইতিহাসকে আমরা ভারতীয় ইতিহাস বলে বর্ণনা করে এসেছি। আধুনিক যুগের

নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার প্রবক্তা রণজিৎ গুহ লেখেন, "The historiography of Indian Nationalism has for a long time been dominated by eletism."

এই এলিট ইতিহাস চর্চায় একটি সমাজের সামগ্রিক চিত্র উঠে আসে না। সমাজের এক খণ্ড চিত্রই শুধু এর উদ্ভাস। কোনো সমাজে সমগ্র এবং অখণ্ড চিত্র আমাদের ইতিহাসে ধরা দেয় তখনই যখন আমরা একটি সমাজের উপরে যেমন আলো ফেলে দেখতে চাই তেমনি নীচের থেকেও আলো ফেলে দেখতে হবে। তা না হলে পিলসুজের নীচের অন্ধকার দূর হবে না। এই নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চা এখন পৃথিবীর সর্বত্র জনপ্রিয় একটি ইতিহাসচর্চা যা Subaltern Historiography নামে পরিচিত। সাধারণ, নিম্নবর্গীয় মানুষ যে ইতিহাস নির্মাণের মহাযজ্ঞে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যুগ থেকে যুগে নিয়ে চলেছে এই ইতিহাস চর্চা তারই বিশ্লেষণ। বিষয়টি অত্যাধুনিক যুগের হলেও রবীন্দ্রনাথ এই দিকটির প্রতি অনেক আগেই আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চেষ্টা করেছেন। গভীর ইতিহাস চেতনা ও বোধ না থাকলে, গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে এ সম্ভব নয়। ইতিহাস যে শুধু রাজরাজড়ার ইতিহাস নয়, ক্ষমতাবানদের নয় — তা তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই তিনি এ প্রসঙ্গে লেখেন,

> "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনি মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি, মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে -- পাঠান-মোগল-পোর্তুগিজ-ফরাসি-ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।
>
> কিন্তু রক্তবর্ণরঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপর্বের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।"[৭]

এখানে "ভারতবাসী কোথায়" বা "ভারতবাসী নাই" কথা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি ও অর্থবহ। তিনি ইতিহাসের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন মানুষকে — সাধারণ মানুষকে; মানুষের কীর্তিকে, শ্রমকে, যাপনকে এককথায় মানুষের সামগ্রিক সত্তাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন বা দেখতে চেয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। কারণ মানুষই তো সমাজ সভ্যতা, দেশ ও কালের একমাত্র নির্মাতা, একমাত্র বিশ্বকর্মা। সমাজের এক খণ্ড অংশকে নয়, অখণ্ড সত্তায় তাঁর বিশ্বাস।

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস বিদ্যা ও চর্চা রাজবৃত্তের দিক থেকে লোকবৃত্তের দিকে অগ্রসর হয়েছে। একথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বলেছেন। তার ইতিহাস চিন্তার এ বৈশিষ্ট্য আধুনিক ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে যেমন বিস্ময়ের বিষয় তেমনি

গৌরবেরও বটে। লোকসাহিত্য, লোকসম্পর্ক, লোককৃতি এককথায় লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে একটি জাতির প্রাণকেন্দ্রকে স্পর্শ করার ইঙ্গিত তিনিই প্রথম আমাদের দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য আমার মনে হয়েছে একটা সূক্ষ্ম অথচ গভীর ধর্মবোধ। এই ধর্ম আমাদের দৈনন্দিন আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে জাত এই বোধ। এই ভালোবাসার মধ্যে আছে এক মহৎ ও উদার আকাশের ঠিকানা। এক ধরনের গভীর মমত্ববোধ ও দার্শনিক ভাবনায় জড়িত এই চেতনা।

> "জনসাধারণের ইতিহাসকে আলোচনার প্রধান বিষয়রূপে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের মতে এই ইতিহাস-বিবর্তনের মূলে প্রধান শক্তি হচ্ছে মানুষের চিত্তবৃত্তির সংঘাত ও সমন্বয়। বস্তুবাদী ইতিহাস-ভাষ্যকারবৃন্দের সঙ্গে এখানে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। .... ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মুখ্যতঃ উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট কবির পক্ষে এই বস্তুবাদী আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।"[৯]

ভারতীয় ইতিহাসের এই দিকটি তিনি আমাদের কাছে নিজেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন 'ভারতবর্ষ' নামক গ্রন্থে 'ধম্মপদং' প্রবন্ধে। তিনি লেখেন,

> "ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত তাহা হইলে ইতিহাসের বেশ মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে; তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কি তাহা আজ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একা মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যেই নাড়ির যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।
>
> সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস। সেই যোগটি কী লইয়া? পূর্বেই বলিয়াছি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম লইয়া।"[১০]

ধর্ম নিয়ে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিক ঐতিহাসিকরা যেমন এককথায় অস্বীকার করতে পারেন না তেমনি দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণেও জড়তা। আসলে এই ইতিহাস বীক্ষা তো একজন প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস বেত্তার নয় — এ যে একজন যুগান্তকারী দার্শনিকের অন্তরের উপলব্ধি। তবে একেবারে অত্যাধুনিক ঐতিহাসিকরা রবীন্দ্রের ইতিহাস চেতনার বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন মর্যাদা সহকারেই। তাই তারা লেখেন, "His view of religion that ment a principle which united without enforcing uniformity is to be

seen definitely as a very subjective approach to history."

কিন্তু একটি সমস্যা থেকেই যায়। পাশ্চাত্য জগত Religion বলতে যা বোঝে প্রাচ্য তা বোঝে না। প্রাচ্যের কাছে, বিশেষত ভারতের কাছে Religion এর ব্যাপ্তি আরও বৃহৎ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাই তিনি একই প্রবন্ধে লেখেন,

> "পলিটিক্স এবং নেশন কথাটি যেমন য়ুরোপের কথা, ধর্ম কথাটাও তেমনি ভারতবর্ষের কথা। পলিটিকিস্ এবং নেশন কথাটার অনুবাদে যেমন আমাদের ভাষা সম্ভবে না তেমনি ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ য়ুরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এজন্য ধর্মকে ইংরেজি রিলিজিয়ন রূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেক সময় ভুল করিয়া বসি। এইজন্য ধর্মচেষ্টার ঐক্যই যে ভারতবর্ষের ঐক্য একথা বলিলে তাহা অস্পষ্ট শুনাইবে।"[১২]

অতএব রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনায় যে ধর্মবোধ - তা একজন ঐতিহাসিকের পক্ষেও নবতর অধ্যয়নের পর এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রের যে অতলান্তিক দার্শনিক চেতনার স্তর — তাকে সন্ধান করেই আলোচনায় প্রবেশ করা শ্রেয়।

রবীন্দ্র ইতিহাস চেতনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল স্বদেশ ভাবনা। তাঁর ইতিহাস চেতনায় এই স্বদেশ ভাবনা একটি অন্যতম বিষয়। ইতিহাসচর্চায় প্রথম পর্যায়ে তিনি ইউরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে পারেননি। আধুনিককালের গবেষক তাই লেখেন, "His early writings weedominated by nationalist impulse, strongly advocating against the Euro-Centric view of Indian history, but later he presented it very objectively and sought the voice of reason."[১৩] স্বদেশ চিন্তা তাঁর মধ্যে ছিল সদা জাগরুক তাই তিনি বলেন,

> "পলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশি হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে। দেশের হৃদয় লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্যকলাপে যে সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি সে সমস্তকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে।"[১৪]

পরবর্তীকালে তিনি ইউরোপের ভালোকে গ্রহণ করতে কখনোই দ্বিধা বোধ করেননি। কারণ তাঁর দর্শন ও চিন্তাভাবনার মূল উৎসই ছিল মিলনের ঐক্যের, গ্রহণের। যার ফলে ভারতের ইতিহাসে মিলনের সুরটিকেই তিনি ধরতে চেয়েছেন এবং তাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। সমাজের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও যে মিলনের সূত্রটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তা তাঁর থেকে আর কেই বা ভালো বুঝতেন। ভারত আত্মার চিরকালীন স্বরূপটি তিনি আবিষ্কার

করতে পেরেছিলেন ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করেই। তিনি ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছেন 'মহামানবের সাগরতীর' বলে। তাই চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তিনিই লিখতে পারেন —

"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন -
শক, হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।"

এরপরই আবার তিনি তাঁর উদার বক্ষে আহ্বান জানান উচ্চকিত কণ্ঠে —

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান -
এসো, এসো আজ, তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।"

উপরের সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ এমন এক ইতিহাস চেতনা দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন যাকে আমরা বর্তমানে 'সার্বিক ইতিহাস' বা 'সার্বিক ইতিহাসবোধ' বলে পরিচিতি দিই। আধুনিক যুগের ফ্রান্সের 'আনালস্ স্কুল' বা ইংলন্ডের 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' পত্রিকা গোষ্ঠীর ইতিহাসবেত্তারা যেই টোটাল হিস্ট্রির উপর জোর দেন — সেই টোটাল হিস্ট্রির চেতনাই আমরা লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। কখনো কখনো হয়তো বা দার্শনিক স্তরে এই 'টোটাল হিস্ট্রি'র সীমাকেও অতিক্রম করে যায় তাঁর ইতিহাসবোধ — এ এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। তাই এ যুগের ইতিহাসকার লেখেন,

> "ইতিহাস অনুরাগী রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ আশ্চর্যরকমের সজীব এবং সঠিক। এতটাই যে, আমরা যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাদার ইতিহাসচর্চা তথা -- পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণার সঙ্গে যুক্ত তারা অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।"[১৫]

সূত্র নির্দেশ :

১। Subrata Dasgupta, The Bengal Renaissance; Identity and Creativity from Rammohan Ray to Rabindra Nath Tagore. Permanent Book, 2007.

২। দিলীপ কুমার বিশ্বাস, 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা', শ্রী পুলিন বিহারী (বাক-সাহিত্য, কলকাতা, ২২ শ্রাবণ ১৩৬৮।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবমখন্ড, ক্যালকাটা পাবলিশিং সিন্ডিকেট, কলকাতা ১৪০৮।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "স্বদেশী সমাজ", আত্মশক্তি, রবীন্দ্ররচনাবলী, পূর্বোক্ত।

৭। Ranjit Guha (Ed.) Subaltern Studies Vol.-I, Oup, 1986.

করতে পেরেছিলেন ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করেই। তিনি ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছেন 'মহামানবের সাগরতীর' বলে। তাই চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তিনিই লিখতে পারেন —

"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন -
শক, হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।"

এরপরই আবার তিনি তাঁর উদার বক্ষে আহ্বান জানান উচ্চকিত কণ্ঠে —

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান -
এসো, এসো আজ, তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।"

উপরের সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ এমন এক ইতিহাস চেতনা দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন যাকে আমরা বর্তমানে 'সার্বিক ইতিহাস' বা 'সার্বিক ইতিহাসবোধ' বলে পরিচিতি দিই। আধুনিক যুগের ফ্রান্সের 'আনালস্ স্কুল' বা ইংলন্ডের 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' পত্রিকা গোষ্ঠীর ইতিহাসবেত্তারা যেই টোটাল হিস্ট্রির উপর জোর দেন — সেই টোটাল হিস্ট্রির চেতনাই আমরা লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। কখনো কখনো হয়তো বা দার্শনিক স্তরে এই 'টোটাল হিস্ট্রি'র সীমাকেও অতিক্রম করে যায় তাঁর ইতিহাসবোধ — এ এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। তাই এ যুগের ইতিহাসকার লেখেন,

> "ইতিহাস অনুরাগী রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ আশ্চর্যরকমের সজীব এবং সঠিক। এতটাই যে, আমরা যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাদার ইতিহাসচর্চা তথা -- পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণার সঙ্গে যুক্ত তারা অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।"[১৫]

সূত্র নির্দেশ :

১। Subrata Dasgupta, The Bengal Renaissance; Identity and Creativity from Rammohan Ray to Rabindra Nath Tagore. Permanent Book, 2007.

২। দিলীপ কুমার বিশ্বাস, 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা', শ্রী পুলিন বিহারী (বাক-সাহিত্য, কলকাতা, ২২ শ্রাবণ ১৩৬৮।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবমখন্ড, ক্যালকাটা পাবলিশিং সিন্ডিকেট, কলকাতা ১৪০৮।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "স্বদেশী সমাজ", আত্মশক্তি, রবীন্দ্ররচনাবলী, পূর্বোক্ত।

৭। Ranjit Guha (Ed.) Subaltern Studies Vol.-I, Oup, 1986.

ঔপনিবেশিকতার স্বৈরতান্ত্রিক চাপ ও রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা

ড. সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩ মার্চ, ১৯১৩ আর্বানা থেকে অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> "এ দেশে আমার এই লেখাগুলিকে কেউ অনুবাদ বলে স্বীকার করতে চায় না। বস্তুত নিজের লেখা তো ঠিক অনুবাদ করা যায় না। কারণ নিজের উপরে আমার অধিকার তো বাইরের অধিকার নয়; তা যদি হত তাহলে প্রত্যেক কথাটির কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হত কিন্তু আমি তা করিনে। ... বাংলায় প্রকাশ করার সময় কবিতা তার সমস্ত ভাষার লীলাপ্রাচুর্য নিয়ে দেখা দেয়। ... কিন্তু দূর দেশে যাত্রার সময় এই সমস্ত প্রচুর গহনা খুলে না ফেললে পদে পদে সেগুলো বিষম বোঝা হয়ে ওঠে। ... তার দিশি ঘোমটাটুকু যাবে কোথায় — কিন্তু জরিজহরৎ ঘুচিয়ে একেবারে নতুন বেশ পরানো হয়েছে। ... ইংরেজির একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য এবং গৌরব আছে। সেইদিক অধিকার করে নবজন্ম লাভ করতে পারবে, লেখাগুলি সার্থক হতে পারবে।"[১]

নিজের অনূদিত রচনাগুলিতে জন্মান্তর ঘটেছে বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। উইলিয়াম রোটেনস্টাইনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন অনুবাদে তার 'প্রবাসী জন্মান্তর ঘটেছে'।

১৯ অক্টোবর ১৯১৬, আমেরিকার 'The Christian Monitor' পত্রিকার সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

> "প্রত্যেক দেশের প্রকাশগুলির কিছু সংকেত থাকে। আমি যখন আমার লেখা অনুবাদ করি, আমি নতুনতর চিন্তার প্রয়োগ ঘটাই। ফলে শেষ পর্যন্ত সেই অনুবাদ নতুন লেখা হয়ে ওঠে। মূল চিন্তা থাকে এক, কেবল দেখবার চোখটা বদলে যায়।"

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা অনুবাদের দর্পণে রচনার প্রতিফলিত মুখচ্ছবি নয়, নতুন মুখ। তাঁর অনূদিত রচনা এনে দিয়েছিল বিশ্ববিজয়ের সম্মান, কিন্তু পরভাষায় অনুবাদের সময় কি বদলে যেত কবির মনোভাব? রবীন্দ্রনাথের নিজের ইংরেজি রচনা সম্বন্ধে ছিল দ্বিধা; ইন্দিরা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে সেই দুর্বলতার

কথা লিখেছেন। লিখেছেন তাঁর বিদেশি বন্ধু রোটেনস্টাইনকে —

> "তোমার নিশ্চয় মনে আছে কত বাধো বাধো ভাবে, কত অনিশ্চয়তার সঙ্গে তোমার হাতে আমার গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি তুলে দিয়েছিলাম, আমার ইংরেজি বড়োই অদ্ভুত যার জন্য ইস্কুলের ছেলেটা পর্যন্ত বকুনি খেতে পারে।"(২)

দ্বিধা থাকলেও সেগুলি যেহেতু তার নিজের রচনা সেজন্য সেগুলি প্রকাশের আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র নতুনতর সৃষ্টির আনন্দেই কি রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখার অনুবাদ করেছেন? খ্যাতির মোহ বা বিশ্বের দরবারে নিজের সৃষ্টিকে তুলে ধরবার আনন্দের সঙ্গেও ছিল দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথের প্রবাসী প্রিয়জনেরা বারবার তাঁর লেখার অনুবাদ প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে তাঁদের উৎসাহ দেখিয়েছেন, কিন্তু এঁদের অনুবাদ সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ নিয়ে পাশ্চাত্যের পাঠকমহলে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগে ও পরে, রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ করার পরে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া — যা অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথকে আহত করেছিল। ঔপনিবেশিক চাপ ও চক্রান্তের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে কবিকে আপোষ করতে বাধ্য হতে হচ্ছিল, সেই বেদনাও তাঁর অনূদিত রচনার মধ্যে পড়েছে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল বসু, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দকুমার স্বামী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের রবীন্দ্ররচনার যেসব অনুবাদ New India, The Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি রবীন্দ্রনাথকে খুব বেশি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ফলে নিজেই অনুবাদে উৎসাহিত হন। 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নিজ রচনার অনুবাদের সূচনা করেন। ১৯১২ নাগাদ রোটেনস্টাইন ও ইয়েটসের অনুরোধে তিনি গীতাঞ্জলির অনুবাদ 'India Socieity' থেকে প্রকাশ করলেন, তখন তাঁর অভাবনীয় সাফল্য খ্যাতির জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ ১৯১৩ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে ক্রমাগত অনুবাদ করলেন কবিতা, ছোটোগল্প ও নাটকগুলি। ম্যাকমিলান কোম্পানি গীতাঞ্জলির ব্যবসায়িক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে একের পর এক প্রকাশ করে চলল তাঁর অনূদিত রচনাগুলি। এমনকি যে গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ করা নয়, যেমন ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের অনূদিত 'রাজা' নাটকটিও প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের নামে। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে রোটেনস্টাইনকে চিঠি লিখলেন — "Everything which now bears your name is gold to macmillan." প্রকাশকের চাপের ফলে এবং খ্যাতির অমোঘ আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ অস্বাভাবিক দ্রুততায় করে চললেন তাঁর রচনার অনুবাদ। 'শারদোৎসব' নাটকের অনুবাদ করতে তাঁর পুরো দুদিনও লাগেনি। জাপান

কথা লিখেছেন। লিখেছেন তাঁর বিদেশি বন্ধু রোটেনস্টাইনকে —

> "তোমার নিশ্চয় মনে আছে কত বাধো বাধো ভাবে, কত অনিশ্চয়তার সঙ্গে তোমার হাতে আমার গীতাঞ্জলির পান্ডুলিপি তুলে দিয়েছিলাম, আমার ইংরেজি বড়োই অদ্ভুত যার জন্য ইস্কুলের ছেলেটা পর্যন্ত বকুনি খেতে পারে।"[২]

দ্বিধা থাকলেও সেগুলি যেহেতু তার নিজের রচনা সেজন্য সেগুলি প্রকাশের আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র নতুনতর সৃষ্টির আনন্দেই কি রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখার অনুবাদ করেছেন? খ্যাতির মোহ বা বিশ্বের দরবারে নিজের সৃষ্টিকে তুলে ধরবার আনন্দের সঙ্গেও ছিল দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথের প্রবাসী প্রিয়জনেরা বারবার তাঁর লেখার অনুবাদ প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে তাঁদের উৎসাহ দেখিয়েছেন, কিন্তু এঁদের অনুবাদ সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ নিয়ে পাশ্চাত্যের পাঠকমহলে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগে ও পরে, রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ করার পরে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া — যা অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথকে আহত করেছিল। ঔপনিবেশিক চাপ ও চক্রান্তের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে কবিকে আপোষ করতে বাধ্য হতে হচ্ছিল, সেই বেদনাও তাঁর অনূদিত রচনার মধ্যে পড়েছে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল বসু, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দকুমার স্বামী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের রবীন্দ্ররচনার যেসব অনুবাদ New India, The Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি রবীন্দ্রনাথকে খুব বেশি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ফলে নিজেই অনুবাদে উৎসাহিত হন। 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নিজ রচনার অনুবাদের সূচনা করেন। ১৯১২ নাগাদ রোটেনস্টাইন ও ইয়েটসের অনুরোধে তিনি গীতাঞ্জলির অনুবাদ 'India Socieity' থেকে প্রকাশ করলেন, তখন তাঁর অভাবনীয় সাফল্য খ্যাতির জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ ১৯১৩ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে ক্রমাগত অনুবাদ করলেন কবিতা, ছোটোগল্প ও নাটকগুলি। ম্যাকমিলান কোম্পানি গীতাঞ্জলির ব্যবসায়িক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে একের পর এক প্রকাশ করে চলল তাঁর অনূদিত রচনাগুলি। এমনকি যে গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ করা নয়, যেমন ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের অনূদিত 'রাজা' নাটকটিও প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের নামে। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে রোটেনস্টাইনকে চিঠি লিখলেন — "Everything which now bears your name is gold to macmillan." প্রকাশকের চাপের ফলে এবং খ্যাতির অমোঘ আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ অস্বাভাবিক দ্রুততায় করে চললেন তাঁর রচনার অনুবাদ। 'শারদোৎসব' নাটকের অনুবাদ করতে তাঁর পুরো দুদিনও লাগেনি। জাপান

হয়েছিল এবং জার্মানিতেও নোবেল পুরস্কার কে পাচ্ছেন এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

১ নভেম্বর, ১৯১২ ইন্ডিয়া সোসাইটি গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর আথেনিয়াম পত্রিকায় (১৬ নভেম্বর, ১৯১২), ডেলি নিউজ অ্যান্ড আ লিডার পত্রিকায় ২১ জানুয়ারি, ১৯১৩ দীর্ঘ আলোচনা হয়। এর মধ্যে গীতাঞ্জলি বেস্ট সেলার হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে ২১ মে ১৯১৩, ক্রিশ্চিয়ান, কমনওয়েলথ পত্রিকায় 'The Living voice of India' নাম দিয়ে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ছবিসহ ছাপানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস পাওয়া গেছে অক্টোবর ১৯১৩ পর্যন্ত। কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়ার পর থেকে এই পত্রিকাগুলির সুর বদলে গেছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সময় তাঁর জোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইংল্যান্ডের টমাস হার্ডি এবং ফ্রান্সের আনাতোল ফাঁস। Alex Arnson লিখেছেন — জার্মানির নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রার্থী ছিলেন Rosegger. এই Rosegger যাতে নোবেল না পান সেজন্য চেকোশ্লোভাকিয়ান association জোর সওয়াল করে। এর ফলে অনেকের মনে এই ধারণা হয়, তাঁকে প্রাইজ না দেওয়ার জন্যই বুঝি রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা মনোনীত করেছেন। Aronson লিখেছেন — "During the second half of February 1913 almost all the leading newspapers in England, on the confinent, and in America, published editorials dealing with Rabindranath and Nobel Prize."[৪]

জার্মানিতেও চেকশ্লোভাকিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর ভূমিকা সম্বন্ধে আর্নসন লিখছেন — "All though February 1913 the same story of Czech interference was told over and over again, and as one newspaper puts it, althrough only one national minority protested against Rosegger to the protest of all European nations will be raised against Rabindranath Tagore."[৫]

আর্নসন ইহুদি ছিলেন — ফলে তাঁর মতামতগুলি জার্মান সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত মতামত প্রভাবিত বলে অনেকে মনে করেছেন। কিন্তু আর্নসন তাঁর বই-এ যেসব সংবাদপত্রের কর্তিকা সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে মতামত দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট নভেম্বর, ১৯১৩-র আগে থেকেই ইউরোপ জুড়ে নোবেল পুরস্কার প্রসঙ্গে, গীতাঞ্জলি এবং রবীন্দ্রনাথের নাম সংবাদপত্রের পাতায় উঠে এসেছে।

৩

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রাথমিক উত্তেজনা কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন, তখন নিজের সেই আঘাতকে সামলাতে কখনো ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কখনো সচেষ্ট হয়েছেন প্রত্যাঘাতের উত্তরে নিজের রচনাসম্ভারকে

বিদেশি পাঠকদের কাছে নিজেই তুলে ধরতে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদেশি সমালোচক বা কলোনিয়াল বুরোক্র্যাটদের সমালোচনার মূল সুরটা ছিল রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ইংরেজি রচনা তাঁর নিজের অনুবাদ নয়। একথা অনস্বীকার্য যে নিজের ইংরেজি লেখা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অহেতুক দ্বিধা সংশোধন বা পরিমার্জনের জন্য তাঁর দেশি বা বিদেশি বন্ধুদের দিতেন এবং এ কারণেই তাঁর সম্বন্ধে এই ধরনের অপপ্রচার শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ নিয়ে এ দেশে তাঁর প্রথম যে বিদেশি বন্ধুটি শান্তিনিকেতনে আনন্দ-সাক্ষাৎকারে যান তিনি হলেন এডওয়ার্ড টমসন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক এই মানুষটির সঙ্গে সারাজীবন নানা ধরনের টানাপোড়েনের সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথের। ১৪ নভেম্বর ১৯১৩ শান্তিনিকেতনের শেফালিকুঞ্জেও রবীন্দ্রনাথ কাটিয়েছেন একটি সন্ধ্যা — সেদিন নোবেল প্রাপ্তি উপলক্ষে টমসন রবীন্দ্রনাথকে একটি কবিতা লিখে উপহার দেন। আবেগাপ্লুত রবীন্দ্রনাথ টমসনকে বলেন, তিনি অনুবাদে তেমন স্বচ্ছন্দ নন, তাই রবীন্দ্রনাথ সেগুলি শুধরে দিতে বলেন। এ প্রসঙ্গে টমসন লিখেছেন — "Next day I found I had made about 300 pencilings in nearly 150 poems including epigrams."[৬] আর তার পরেই হঠাৎ ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ টমসনকে চিঠি লিখে সংশোধন করতে বারণ করেন এবং দুজনের বিরোধিতার সূত্রপাত হয়।[৭] আবার কখনো বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে বলার জন্য টমসনকে লেখেন — "While you were minutely going over my ms. Your very kindness embarrassed me and prevented me from being frank with you – which was foolish on my part and absurdly oriental – and for which I have been feeling ashamed ever since".[৮]

ভ্যালেন্টাইন চিরোল, যাকে ই.এম.ফর্স্টার বলেছিলেন — "An old Anglo Indian reactionery hack." বাঙালি মুসলমানদের একটি সভায় মন্তব্য করেন গীতাঞ্জলি আদতে ইয়েটসের লেখা, এই মন্তব্য করলে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ স্টার্জ মুরকে লেখেন — "A report when in meeting of the leading Mahamedan gentleman of Bengal, Valentine Chirol told the audiance that the English "Gitanjali' was practically a product of Yeates."[৯] এই চিঠিটি লেখা হয়েছে ১৭ জানুয়ারি ১৯১৪। এই ধরনের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ একটা সময়ে তাঁর কোনো রচনা কাউকেই সংশোধনের অনুমতি দিতেন না। রবার্ট ব্রিজেস যখন 'The Spirit of man' নামে একটি সংকলনে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার সংশোধন করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজি হননি। ইয়েটস

প্রসঙ্গ এনে লিখেছেন, গীতাঞ্জলি অনুবাদের সময় "I was with him during the revisions.' পরে অবশ্য ব্রিজেসের অনুরোধে কবিতাটি প্রকাশের অনুমতি দেন। ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ — রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি প্রকাশনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শাসনের চাপ, বিরুদ্ধ সমালোচককে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়ে অনেক সময়ই নিজের ইংরেজি লেখায় ভারতীয়ত্বকে পরিহার করার চেষ্টা করেছেন।

এরই মধ্যে ঘটে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। আর রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগের পরে ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা খবরটির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ ছাড়া প্রায় নিস্তব্ধ। ১৯২০ নাগাদ রবীন্দ্রনাথ আবার বিদেশে; ১৯২০-র ১২ জুন রবীন্দ্রনাথ গাওয়ার স্ট্রিটের ছাত্রাবাসে বক্তৃতা দেন, কিন্তু এসব খবর কোনো বিদেশি পত্রিকা ছাপেনি। রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে থাকাকালীন পার্লামেন্টের তদন্ত কমিটি ডায়ারের কীর্তিকে মহান দেশসেবার নিদর্শন হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করে। বিচারের নামে এই প্রহসন দেখে রবীন্দ্রনাথ বিক্ষুব্ধ চিত্তে লন্ডন ত্যাগ করেন।[১০]

একইসঙ্গে অসম্ভব জনপ্রিয়তা, ঔপনিবেশিক চাপের কষ্ট, আঘাতের উত্তরে অন্তর্দাহ — রবীন্দ্রনাথকে এক বেদনাময় পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। অনূদিত রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমি পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। 'Song Offerings' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের সন্তসদৃশ প্রভাব পশ্চিমের পাঠকের কাছে একটা অন্য বার্তা বহন করে এনেছিল। বিশ্বযুদ্ধের অন্ধকারময় আবহে পশ্চিমের যন্ত্রসভ্যতার মাধ্যমে নিপীড়িত মানবসভ্যতার কাছে শান্তিময়, অমৃতময় বাণীর প্রয়োজন ছিল। পশ্চিমের লোভকাতর, ধনমত্ত, মদমত্ত যন্ত্রসভ্যতার কাছে প্রাণের নিবিড় বন্যাকে তিনি তুলে ধরে দিতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমের সঙ্গে প্রাচ্যের সেতুবন্ধের চেষ্টা, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ভাষায় — "not only stands for the east but it is like a bridge in the making East and West." রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনাগুলি যেন শিল্পীর হাতে তৈরি 'মননের মধু' দিয়ে ঘেরা এক চৈতন্যের সেতু।

পশ্চিমের পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথকে সন্ত বানিয়েছে, মরমিয়া সাধক হিসাবে দেখেছে, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা যা তাদের কাছে দুর্জ্ঞেয় ও কৌতূহলের বিষয় তার প্রবক্তা হিসাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে। অন্য দলের পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছে কিছুটা সংশয়ের দৃষ্টিতে। ভারতবর্ষ তৎকালে যা ইংরেজদের উপনিবেশমাত্র, সেই দেশ থেকে আগত মানুষেরা যা কিছু দেবে, সেগুলি যেন পাশ্চাত্যেরই উপহার! এই colonial legacy-র বেদনা, অবমাননার অনুভব মননশীল কবির হৃদয়বোধে

আঘাত হেনেছিল। রবীন্দ্রনাথ কলমকে তুলে নিয়েছিলেন প্রাচ্যের বার্তাকে পৌঁছে দেবেন পাশ্চাত্যের পাঠকদের কাছে, তাদেরই ভাষায়, তাদেরই মতো করে। যদিও তাঁর ইংরেজি রচনা থেকে সযত্নে বাদ দিয়েছেন ইংরেজদের কাছে অবোধ্য ভারতীয় অনুষঙ্গ, অনেক ক্ষেত্রে বর্জিত হয়েছে ভারতীয় মিথ বা পুরাণের প্রসঙ্গ, চরিত্র নাম বা কার্যাবলিতে বাদ পড়েছে ভারতীয়ত্ব। তবুও নিজের বিশেষ বক্তব্যবাহী রচনাগুলির মধ্যে তিনি নিজের মত, বিশ্বাস ও প্রাচ্যবার্তাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন পাশ্চাত্যের পাঠকের কাছে। 'রাজা ও রাণী' নাটকের অনুবাদ 'King and the Queen'-এর মধ্যে পতি-পত্নীর নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা, 'বিসর্জন' নাটকে মানবতাবাদ ও হিংসার বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদ', 'মালিনী' নাটকে শান্তি ও সৌহার্দ্যের বার্তা, 'শারদোৎসবে' অক্লান্ত আত্মত্যাগের সৌন্দর্য, 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটকে সততা ও দায়িত্ববোধের পুরস্কার, 'রক্তকরবী' নাটকে যন্ত্রের নিষ্পেষণে বিক্ষত মানবাত্মার ক্রন্দনকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই বার্তাগুলি যুদ্ধ ও রক্তাক্ত অবক্ষয়ে ক্লান্ত ও পীড়িত পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে ঋষিকল্প কবির অন্তরের সান্ত্বনা — বিদেশে প্রফেট হয়ে ওঠা কবির নিজ রচনাকে নতুনভাবে সৃষ্টির আনন্দে প্রাচ্যের হৃদয়বোধ ও মানবিকতার অনুভব পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদগুলি তাই রবীন্দ্রনাথের কলমে হয়েছে নতুন সৃষ্টি — trancreation.

সূত্র নির্দেশ :

১। ১৩ মার্চ, ১৯১৩, আর্বানা থেকে অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। দেশ, ১৯৭৭, কলকাতা।

২। Rothenstein William, Since Fifty, Oxford University Press, Delhi.

৩। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, চিঠিপত্র ২, বিশ্বভারতী।

৪। Aronson Alex, Rabindranath through Western eyes, Riddhi Edition, 1978.

৫। তদেব।

৬। Thompson E.P., Alien Homage, Edward Thompson and Rabindranath Tagore, Delhi, 1993

৭। Dasgupta Uma, A difficult, Friendship – Delhi 2003.

৮। এডওয়ার্ড টমসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 20 November, 1913, A difficult Friendship, Delhi, 2003.

৯। স্টার্জ মুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে, সৌরীন্দ্রমোহন মিত্র, কলকাতা।

১০। কুন্ডু কল্যাণ, ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, পূর্বা, কলকাতা।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বাংলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপিকা ড. সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে মুর্শিদাবাদের লালগোলা কলেজে কর্মরতা।

সাংকেতিক নাটক : রবীন্দ্রভাবনায় সাধারণ মানুষ

সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যকার হিসেবে যেখানে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি সেখানে তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথের এই সাংকেতিক নাটকে 'সাধারণ মানুষ'-এর সংজ্ঞা কি, 'সাধারণ মানুষ' বলতে রবীন্দ্রভাবনায় কোন বিশেষ বক্তব্যের ওপর আলোকপাত হয় তাই বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সাধারণ মানুষ বলতে চিরাচরিত ধারণায় যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথ কি শুধু সেটুকুই দেখেছেন, না দেখেছেন তার অতিরিক্ত কিছু? প্রশ্ন এখানেই। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলিতে দেখা যায় উচ্চ শ্রেণি, উচ্চ বর্ণের মধ্যে ইন্দ্রিয়সুখের সীমাতে, ক্ষুদ্র স্বার্থবৃদ্ধির ঘেরাটোপে, অহংবোধের দম্ভে, বর্বরতার প্রকাশে আবদ্ধ থাকা সাধারণ মানসিকতার মানুষকে। সমাজের মাথাতে থাকলেও সাধারণের মানদণ্ডে বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের। আবার শ্রেণি ও বর্ণের বিচারে যারা নিম্নকোটির তাদের মধ্যেও যেমন দেখেছেন ক্ষুদ্র বৈষয়িক লোভ, স্বার্থবুদ্ধির আতিশয্য, ক্ষমতাবানকে তোষণ — প্রভৃতি দিকগুলি তেমনি পাশাপাশি দেখেছেন এই শ্রেণি, বর্ণের মানুষের মধ্যে প্রাণের অনির্বচনীয় দীপ্তি। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তারা সাধারণ হয়েও আর সাধারণ থাকে না তখন।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলিতে 'সাধারণ মানুষ' কথাটির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। এই বিশেষ কথাটির ব্যাখ্যার দিকে নজর রেখেই তাঁর সংলাপ নির্মাণ, নাটকের দ্বন্দ্বের ও তার পরিণতির নির্মাণ। নাটকের মূল বক্তব্য তুলে ধরতে, সাংকেতিক ভাষা নির্মাণে নাটককে অনির্বচনীয়তার সীমায় পৌঁছে দিতে প্রয়োজন হয় এইসব চরিত্রের। যে সব মানুষ বর্ণ ও শ্রেণি বিচারে নিম্নকোটির, তাদের সাধারণ মানসিকতার মধ্যে দিয়ে নির্মাণ হয় নাটকে বাস্তবজীবনকে অনুসরণের দিকটি। নাটক যেহেতু ইন্দ্রিয়গোচর শিল্পরূপ তাই কিছু সাধারণ মাপের সাধারণ মানুষ নাটকের এই উদ্দেশ্য পূরণ করে। তাদের মাটির ভাষার সংলাপে নাটকের বিষয়বস্তু ও নাটকীয় গতির প্রতিও ঔৎসুক্য জাগে দর্শকের। আর এই তথাকথিত সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেন এমনকিছু মানুষকে যাদের মধ্যে 'ছোটো আমি'-কে ছাড়িয়ে 'বড়ো আমি' প্রকাশিত। এখানেই তারা

অনন্য। তাদের গানে, সংলাপে অভিব্যক্তিতে দর্শকমন পৌঁছে যায় জীবনরহস্যের গভীরে – আর এখানেই নাটকগুলি পায় সাংকেতিক নাটকের সার্থকতা।

'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' ও 'কালের যাত্রা' — এই সাংকেতিক নাটকগুলি এখানে আলোচিত হল।

'রাজা' নাটকের প্রকাশকাল ১৯১০। 'রাজা' নাটকে প্রথমেই যার কথা আসে সে রানি সুদর্শনার দাসী সুরঙ্গমা। নাটকের প্রথমেই রাজাকে নিয়ে রানি সুদর্শনার অতৃপ্তি, দ্বন্দ্ব যা রাজার প্রতি দর্শকের কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে তাকে ত্বরান্বিত করেছে সুরঙ্গমা। সুরঙ্গমাকে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন অতি সাধারণ স্তরের মাটির মানুষের মধ্যে থেকে — যার বাবা জুয়ো খেলত, রাজ্যের যত যুবক তার ঘরে জুটত মদ আর জুয়োর নেশায়। সুরঙ্গমার বাবা মেয়েকে ব্যবহার করেছিল নষ্ট করার কাজে। সুন্দর, সুপুরুষ মানুষের সঙ্গ ও উন্মাদনার আকর্ষণে সুরঙ্গমার যৌবনধর্ম যখন আকৃষ্ট তখন রাজা তার বাবাকে শাস্তি দিয়েছেন, সুরঙ্গমাকে নিযুক্ত করেছেন সুদর্শনার পরিচারিকার কাজে। নিজের বয়োধর্মে বাধাপ্রাপ্ত সুরঙ্গমা রাজার প্রতি ক্ষুব্ধ — সুরঙ্গমা বলে,

> 'আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম — সে পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মতো কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।'

সাধারণ মানুষের রিপু তাড়িত প্রবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই সুরঙ্গমার মুখের কথায় স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সেই সাথে দেখিয়েছেন তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা আত্ম-উত্তরণের ক্ষমতাকেও। রাজাকে যখন প্রথম দেখেছে সুরঙ্গমা তখন তার ভয়ানক কুৎসিত রূপে সে আতঙ্কিত। কিন্তু যাকে একদিন কুৎসিত, নিষ্ঠুর মনে হয়েছে তার কাছে যে নির্ভরতা, যে ভরসা সুরঙ্গমা পেয়েছে তাতেই সে উপলব্ধি করেছে তার নষ্ট হয়ে যাবার পথ থেকে সরিয়ে এনে রাজা তাকে কত বড়ো মাপের আশ্রয় দিয়েছেন — সুরঙ্গমা বলেছে, 'বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।' প্রবৃত্তির টানাপোড়েনের পথ ধরেই হয় মানুষের জীবনে সত্যকে দেখা। সেই সত্যকে দেখতে পেয়েই চিত্তের প্রশান্তিকে সুরঙ্গমা বলতে পারে 'আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।'

ছদ্ম রাজা ও প্রকৃত রাজাকে নাটকের নানা স্তর পেরিয়েও সুরঙ্গমার সান্নিধ্যে যে পথে অনুভব করেছে রানি সুদর্শনা। সেখানেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন সাধারণ এক নারীর হৃদয়যন্ত্রণার অস্থির আর্তিকে। এই তীব্র দাহের পথ পেরিয়ে তবেই সুদর্শনা সাধারণ নারীর থেকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে হৃদয় ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবতী রানি সুদর্শনায়, যখন সে রাজাকে প্রেমে অভিষিক্ত করে বলতে পেরেছে - 'তুমি সুন্দর নও প্রভু,

সুন্দর নও, তুমি অনুপম।'·

নাটকের শুরুতে দাসী সুরঙ্গমা রাজার সম্পর্কে কৌতূহলী সুদর্শনার কৌতূহল মেটাতে তাঁর অন্তর সৌন্দর্যের কথা বলে যা বোঝে না সুদর্শনা। দর্শক মনেও এখান থেকে শুরু হয় রাজাকে দেখবার, রাজাকে জানবার ঔৎসুক্য। এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন বিদেশি প্রজাদের যারা উৎসবে যাবার রাস্তা খোঁজে। প্রহরী তাদের বলে 'এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছাবে।' প্রহরীর কথার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন সাংকেতিকতা। মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটাতে চাইলে মানুষকে বেঁধে তা হয় না, মানুষের ওপর আস্থা রেখেই তা সম্ভব। রাজা সেই পথেরই পথিক। অন্য রাজার শাসনে, নিয়মে চিরবাঁধনে অভ্যস্ত বিদেশি প্রজাদের তাই এদেশের রাজার রকমসকমে বিভ্রান্তি জাগে। বিদেশি প্রজা জনার্দন, কৌণ্ডিল্য, ভবদত্তর সংলাপের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের প্রথাগত ধারণা ও রাজার এক ভিন্ন মাত্রা দর্শকের মনে গাঁথতে থাকেন। তারা কথা বলে সহজ স্বাভাবিক মাটির ভাষায় যা নাটকের গুরুগম্ভীর বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করে সহজ হাওয়া নাটকে এনে দেয় — দর্শককে একাত্ম হতে সাহায্য করে নাটকের সাথে।

নাগরিক দলের কথায় রাজার সম্বন্ধে ধারণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন রবীন্দ্রনাথ একইরকম সহজ মাটির ভাষায়। সমগ্র নাটকের মূল কেন্দ্রীয় বিষয় সাধারণ মানুষের মুখে বলান রবীন্দ্রনাথ। প্রজাদের আলোচনায় স্পষ্ট হয় রাজা কুৎসিত দর্শন বলে দেখা দেন না। প্রজারা দেখে ক্ষমতার দম্ভে রাজা মানুষকে পীড়ন করেন না, সর্বদা ত্রস্ত রাখেন না। তাই রাজা বলে মানতে কারোর কারোর অস্বস্তিও হয়। প্রথম জন বলে

> 'সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশশুদ্ধ লোকের আত্মপুরুষ বাঁশপাতার মতো হি হি করে কাঁপতে থাকে, আর আমাদেরই রাজাকে দেখা যায় না কেন। কিছু না হোক, একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে 'বেটার শির লেও' তা হলেও যে বুঝি রাজা বলে কিছু একটা আছে'।

অন্য দেশে প্রকাশ্যে রাজার নিন্দে করলে জিভ কেটে কুকরকে দিয়ে খাওয়াত, কিন্তু বিশ্ববসু জানে তার রাজা তা করে না। তাই তার রাজা বিকট দেখতে হয়ই বা কেমন করে। আর পাঁচজন যখন রাজাকে দেখতে না পেয়ে ফাঁকা বোধ করে ঠাকুরদার কথায় তখন বোঝা যায় সাধারণ দৃষ্টিতে যাকে ফাঁকা ঠেকে, বোধের চোখ দিয়ে তা দেখলে তা আর ফাঁকা থাকে না। ঠাকুরদা বলেন,

> 'আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা যায় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে — তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে!'

ঠাকুরদার 'আমরা সবাই রাজা' গানে রাজার উদার মানবধর্ম দর্শকচিত্তে সুস্পষ্ট প্রতীতি গড়ে দেয়। প্রজাদের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র ঠাকুরদা এভাবেই প্রজাদের দ্বন্দ্ব সংশয়ের আবহ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অনির্বচনীয়তার মধ্যে দিয়ে রাজার অপরূপ রূপকে দর্শকের সামনে উপস্থিত করেন। বিরূপাক্ষ যখন রটিয়ে বেড়ায় রাজা কুৎসিত তখন ঠাকুরদা বলেন বিরূপাক্ষ আয়নায় নিজের যে প্রতিফলন দেখে তারই রূপ ও রাজার মধ্যেও আরোপ করে। ঠাকুরদা রসের কারবারি, দর্শককে রসের জারকে জারিয়ে, কখনো ব্যঙ্গ, কখনো বা তীব্র শ্লেষে রাজাকে উপলব্ধি করতে দর্শককে সাহায্য করে। গুরুগম্ভীর বিষয়ের নাটক চরিত্রের উপস্থাপনার গুণে দর্শকের কাছে এভাবেই উপভোগ করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিদেশি প্রজাদের কেউ কেউ রাজার অস্তিত্বেই সংশয়াতুর। কৌণ্ডিল্য বলে,

> 'সত্যি বলছি ভাই, রাজা আমাদের এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে এখানে কোথাও রাজা না দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু পায়ের তলায় যেন মাটি নেই!'

কিন্তু জনার্দন বুঝেছে রাজা দেশের মানুষকে বেঁধে নিয়ম শেখান না, নিয়ম তাদের মধ্যে নিজের থেকেই তৈরি হয় বলেই রাজাকে ছাড়াই উৎসবের দিনে এত মানুষ একসঙ্গে এসে মিলেছে। রাজার নিয়ম জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে মানবআত্মাকে পীড়িত করে না। রাজা চান অন্তরের মানুষটিকে জাগিয়ে তুলতে। মানুষের ভেতর থেকে আত্মশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তার স্বাধীন বিচারবোধকে বিকাশ করতে চান তিনি। এই বোধে দর্শককে উদ্বুদ্ধ করেন রবীন্দ্রনাথ এইসব সাধারণ মানুষকে মঞ্চে এনে।

রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখানোর প্রসঙ্গে যে ছদ্ম রাজবেশধারী রাজাকে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে দিয়েও ঘটেছে জনসাধারণের মানসিকতার প্রতিফলন। রাজাকে চোখের দেখার মধ্যে দেখে যারা তুষ্ট। স্বার্থান্বেষী মানুষরা চিরকাল রাজতোষণেই অভ্যস্ত। কাঙালপনায় অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের ছা-পোষা স্বভাবটি কিছু মানুষের মধ্যে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। কৃত্রিম রাজভক্তি দেখিয়ে কে কত বেশি রাজার আনুগত্যলাভ করবে তারই প্রতিযোগিতা পড়ে যায় ছদ্ম রাজাকে ঘিরে। জনসাধারণের স্তাবকতা স্পর্শ করে রানি সুদর্শনাকেও। এই কারণেই এই ধরনের কিছু সাধারণ মানুষের চরিত্র এই পর্যায়ে সৃষ্টি করছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ঠাকুরদা অন্তরদৃষ্টি দিয়ে চেনেন রাজাকে, যে রাজা সস্তাদরের জনপ্রিয়তার লোভে জনসাধারণের সামনে নিজেকে মেলে ধরেন না। ঠাকুরদা বলেন,

> 'ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না পরে রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে, তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস!'

রাজা ভেবে ছদ্মবেশধারী রাজাকে ঘিরে সুদর্শনার কামনার উন্মাদনা ও প্রকৃত রাজার পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে নাটকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব দর্শকমনকে এখান থেকেই প্রবলভাবে নাড়া দিতে থাকে।

এইসব সাধারণ মানুষের বাইরেও রবীন্দ্রনাথ এনেছেন বাউলের দল আর পাগলকে। তাদের গানে কথার অতিরিক্ত ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই গানেই প্রকাশ পেয়েছে রাজা কেন অপরূপ, কেন অনির্বচনীয়। পাগলের 'তোরা যে যা বলিস ভাই' গানে যাকে ইন্দ্রিয়সুখের স্পর্শে ধরা যায় না, অন্তরের স্পর্শেই যার সন্ধান মেলে সেই কথাই উচ্চারিত। তাই পাগল যখন গায় —

'তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস
রাখিস ঘরে ভরে
যারে যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে।'

তখন দর্শক মনও কি আবেগ, আকাঙ্ক্ষায় কাঁপে না কখন রানি সুদর্শনাও এইভাবে ঋদ্ধ হবে অথবা আদৌ হবে কি না এই দ্বন্দ্বে?

'অচলায়তন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। জীবনের প্রাণস্পন্দন যে শিক্ষায় স্পন্দিত হয়ে, নন্দিত হয়ে ওঠে না সেই শিক্ষা অচল - সেই প্রতিষ্ঠানই অচলায়তন। নিয়ম ও নীতির দমবন্ধ করা কঠোর বিধিবিধানের নিগড়ে আটকে থাকে অচলায়তনের জীবনছন্দ। মানুষকে ভুলে হাজারো নিয়ম আর সংস্কারের বেড়াজালকেই সেখানে গুরুত্ব দেয় প্রধান কর্মকর্তারা। মানুষের পারলৌকিক জীবনের পাপ, পুণ্য, দেবত্বলাভের সংজ্ঞা ও তার ধরনধারণ সবই তারা মাপে শাস্ত্রবিধির আচার-অনুষ্ঠানের কঠোরতায় — ইহলোকের জীবনের মুক্তি সেখানে গৌণ। আর এই শৃঙ্খলিত জীবনপ্রণালীতে কেউ কেউ এতই অভ্যস্ত যে তার বাইরে পা রেখে নিয়মাবিধিগুলি পরীক্ষা করে, যাচাই করে দেখার সাহসটুকু তাদের হয় না — পাছে অমঙ্গল হয়, পাছে পাপ হয়, পাছে আসে কোনো অজানা বিপদ। সেসব তাদের কাছে মানসিক উদ্বেগের কারণ, ভয়ানক দুশ্চিন্তার বিষয়। বরঞ্চ ওপর মহলের নির্দেশ মেনে চিরাচরিত অভ্যাসে কাজ করার মধ্যেই তো আছে উৎপাতহীন শান্তি। যে শান্তি কূপমণ্ডূকতার, যে শান্তি জড়ত্বের স্থবিরতার। তাই তো পাঠ্যবিষয়কে অবহেলা করা, সাধারণ মানুষের জীবন ছন্দকে প্রাণভরে উপভোগ করতে চাওয়া পঞ্চককে ঘিরে সকলের বিড়ম্বনার শেষ থাকে না। আর সকল ছাত্রের যখন ধ্বজাগ্রকেয়ূরী পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে তখন পঞ্চক 'ওঁ তট তট তোতয় তোতয়' আউড়ে যাচ্ছে। তার না হয়েছে চক্রেশমন্ত্র, না হয়েছে মরীচি, মহামরীচি, না হয়েছে পর্ণশবরী। পঞ্চক স্বীকার

করে আটান্নপ্রকার আচমনবিধির মাত্র সে দুটো শিখেছে কেননা তৃতীয় প্রকরণের মধ্যমাঙ্গুলির কোন পর্বটা কতবার কতখানি জলে ডোবাতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে সে আঙ্গুলের অস্তিত্বই ভুলে যায়। অচলায়তনের অন্যান্য ছাত্র বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম, সঞ্জীবদের এ ধরনের হাস্যকর গোলোযোগ নেই। তারা তাদের শিক্ষাগুরুদের আদেশ পালনে পঞ্চকের মতো কোনো বিড়ম্বনা খুঁজে পায় না। সংশয়াতুর কোনো পশ্ন তাদের পঞ্চকের মতো তাড়িত করে না। চিরাচরিত অভ্যাস পালনের দ্বারা তারা সাফল্যের ধাপে পৌঁছতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করে। তারা যে অনেক জানে — তাই পঞ্চকের নির্বুদ্ধিতা তাদের কাছে পরিহাসের বিষয়। কিন্তু প্রাণকে কোথাও কি স্পর্শ করে এই পাঠ? জীবনকে কোনো গতি দেয় কি? পঞ্চকের তাই ঠোঁটের আগাতেই আটকে থাকে সব বিদ্যে। কেননা দাদা মহাপঞ্চকের মতো পণ্ডিত হওয়ার কোনো বাসনা পঞ্চকের নেই। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা আর পাঁচটা সাধারণ যুবকদের মতোই সে। মহাপঞ্চক যতই তাকে শাসনে বাঁধে, যতই তার প্রতি রুষ্ট হয়, পঞ্চক ততই তার প্রাণের কথাটি বলে প্রাণের দীপ্তিতে ভরপুর সাধারণ উচ্ছল যুবকের সহজ ভঙ্গিতে। মহাপঞ্চকের চোখে সে বানর, কিন্তু দর্শকের চোখে রবীন্দ্রনাথ তাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন জীবনরস প্রতিপদে উপভোগ করতে চাওয়া, সদ্য যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করতে চাওয়া মুক্ত মনের এক হাস্য-পরিহাসপ্রিয় কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত সাধারণ সদ্য যুবককে। সমগ্র নাটকে তার সংলাপে, চরিত্রের উপস্থাপনায় এই কথাই ছড়িয়ে থাকে। পঞ্চক সকলের চেয়ে পাঠে পিছিয়ে পড়া ছাত্র, সে বিশেষ কেউ না অথচ এই নির্বিশেষত্বের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার বিশেষত্ব। মহাপঞ্চক যখন পঞ্চকের অবাধ্যতার কারণে তার ওপর দারুণ রাগ, দারুণ শ্লেষ-বাক্যবর্ষণ করেন, তখন পঞ্চক বলে 'তোমার পাণ্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য হয় তুমি আমার দাদা বলে।'

নাটকের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ এনেছে শোণপাংশুপল্লি ও দর্ভক পল্লির প্রান্তিক মানুষদের। অচলায়তনের কোনো নিয়ম এদের সমাজে খাটে না। তাই তারা নীচু জাত — অস্পৃশ্য। দেশের রাজা তাদের সংস্পর্শ বাঁচাতে পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু প্রাচীর আশি হাত পর্যন্ত করেছেন, অচলায়তনের প্রতিটি মানুষও এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। এদেরকে ঘিরেই পঞ্চকের দ্বন্দ্ব - আর তাই এইসব প্রান্তিক মানুষের মঞ্চে উঠে আসা। পঞ্চক দেখে অচলায়তনের কোনো নিয়মই এইসব মানুষরা মেনে চলে না। তারা শাস্ত্র পড়ে না অথচ তাদের জীবনছন্দ তাই বলে কোথাও বিঘ্নিত হচ্ছে না। যে কোনো কাজে তারা আনন্দে অংশগ্রহণ করে। সুযোগ পেলেই তাদের মন আনন্দে নেচে ওঠে। প্রথম শোণপাংশু পঞ্চককে বলে — 'আমরা নাচবার সুযোগ

পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখতে পারি নে।' দ্বিতীয় শোণপাংশু বলে - 'আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।' সেই শুনে চমকে উঠে পঞ্চক বলে, 'আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁস নে।'

এই নীচু জাতকে ঘিরে পঞ্চকের মনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, নাটকের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এখান থেকেই তৈরি হয়। সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে পারবে কি এই প্রান্তিক মানুষেরা। অচলায়তনের মানুষেরা চিনতে পারবে কি মানুষের প্রকৃত ধর্ম কী? মানুষের প্রাণের দেবতা পূজো পাবেন কি? পঞ্চকের সামনে একদিকে শাস্ত্রঘেরা জীবনচর্যা অন্যদিকে এইসব অস্পৃশ্য নীচু জাতের মুক্ত জীবন - কোনটা সঠিক, কোনটা গ্রহণীয় এই প্রশ্নে ধাঁধা লেগে যায় পঞ্চকের মনে। একদিকে এতদিনের শিক্ষাজাত অভ্যেস সংস্কার যেমন এক মুহূর্তে ছাড়তে পারে না পঞ্চক তেমনি আর একদিকে নিজের প্রাণের মধ্যে শোনে এই প্রান্তিক মানুষদের অনাবিল আনন্দিত জীবনযাপনের প্রাণ ভোলানো ডাক। পঞ্চক কোন্ পথ বেছে নেবে ঠিক করে উঠতে পারে না। পঞ্চকের প্রাণের ঢেউ পৌঁছে যায় আচার্যের প্রাণেও। এদের দুজনকেই জীবনের নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করে দাদাঠাকুর ও এইসব প্রান্তিক মানুষেরা। পঞ্চক দেখে এই শোণপাংশুরা চাষ করে শুধু নয়, তারা কাঁকুড়ের চাষ করে, খেসারি ডালের চাষ করে যা অচলায়তনের বিধিবিধানের বাইরে। অচলায়তনের সকলে তা খুব আদর করে খায় কিন্তু নিয়ম না মানা এইসব মানুষদের ছায়া মাড়ায় না। শাস্ত্রের বিধানে আছে লোহার কাজ নিজের হাতে করতে নেই। অথচ লোহার কাজ করে এই শোণপাংশুরা — তারা আনন্দে গান গায় — 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন / ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে। ' অবাক হয় পঞ্চক — এইসব অশাস্ত্রীয় কাজ করেও তারা পাঁচ চোখ কিংবা সাত মাথাওয়ালার কোপে পড়েনি! প্রথম শোণপাংশু বিস্মিত পঞ্চককে জানায় 'যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে, তার কোপও বড়ো কম নয়।' রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই দেখান অন্ত্যজ শ্রেণির এইসব মানুষদের আত্মশক্তি ও শারীরিক তেজকে, তাদের কথাবার্তা ও চালচলনের সরস মেজাজ ও দৃপ্ত ভঙ্গিকে। এদের এই প্রাণশক্তির টানেই পঞ্চকের টানাপোড়েন ক্রমে ঘুচে যায়। এদের বনভোজনের প্রস্তাবে একসাথে বসে খাবার কথায় পিছিয়ে গিয়েও আবার সে জুটে যায় এদেরই দলে। মুক্ত কণ্ঠ পঞ্চক গান ধরে 'হারে রে রে রে রে / আমায় ছেড়ে দেরে দেরে / যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।'

মঞ্চ উপস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ এইসব বঞ্চিত মানুষদের প্রাণতরঙ্গ পৌঁছে দেন দর্শকের দরবারে। এরা না থাকলে পঞ্চক বা আচার্য যেমন নিজেদের চিনত না, তেমনি অচলায়তন যে কতটা অন্তঃসারশূন্য তাও যেন জীবনরসের

উপভোগকে বাদ দিয়েই বুঝতে হত দর্শককে। এদের স্বতন্ত্র সংলাপে যে পরিপূর্ণ জীবনছন্দের একখানি মালা গাঁথা হয় তাতেই দর্শক মনে বার্তা পৌঁছে যায় — যাদের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফসলে রাজ্যের মানুষের পেট চলে, প্রয়োজন মেটে অথচ যারা নিজেরা থাকে অর্ধাহারে, তাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ - এ ভাবনা কতটা অমানবিক। অচলায়তনকে ভাঙবার বোধে দর্শকমনকে এভাবেই প্রস্তুত করেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর তাকে ভাঙেন।

হয়ত উঁচু জাতের মতো মানুষের সম্মান পেতেই শোণপাংশু চণ্ডক নিজের জাত ছেড়ে স্থবিরক হয়ে উঠতে চেয়ে তপস্যা শুরু করে। কিন্তু নীচু জাতের, ছোটোলোকের এত বড়ো স্পর্ধা সহ্য করেন না স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত। রাজা তাকে হত্যা করেন। দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শোণপাংশুরা - ক্ষীপ্ত শোণপাংশুরা রাজার প্রাচীর ভাঙতে থাকে। রাজার বিশ্বাস, অচলায়তনের কর্মবিধি যথানিয়মে পালন হচ্ছে না বলেই এই দুর্লক্ষণ। রাজাকে মহাপঞ্চক জানায় উত্তর দিকের জানালা খোলায় একজটা দেবীর অভিশাপ লেগেছে যে। তা কি ব্যর্থ হবার! এই শিকলদেবীর পূজাবেদি কি তবে চিরকাল এমনই খাড়া থাকবে? ইহজীবনের বাতাস যারা প্রাণভরে নেয় তাদের পাগলামির হাওয়াতেই একদিন না একদিন ভাঙবে না কি সেই চিরকালের অটল অনড় বেদি? তা ভাঙে। অচলায়তনের গুরু এসে তা ভাঙেন, তিনি দাদাঠাকুর। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় অচলায়তনের প্রাচীর। বালকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অবারিত আলোয় আর পাখির গানে। আজ তাদের আনন্দের দিন — ষড়াসন বন্ধ, পঙ্‌ক্তিধৌতিরও দরকার নেই, আজ তারা দর্ভকদের হাতে করে আনা খাবার খাবে সকলের সাথে একসঙ্গে বসে। শোণপাংশু ও দর্ভকদের সাথে মিলে গুরু শুরু করলেন নতুন জীবনের প্রাচীর গড়ার কাজ। সমাজের শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে নিয়েই নাটকের শেষে সত্য-শিব-সুন্দরের আরাধনা সার্থক করলেন রবীন্দ্রনাথ।

ডাকঘরের প্রকাশকাল ১৯১২। 'ডাকঘর' নাটকে অমল ও তার চারপাশের চরিত্রকটি সকলেই সাধারণ মানুষ সমাজে যাদের খুব বড়ো উচ্চ মাপের পরিচিতি নেই। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মব্যস্ত মানুষদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কখনো খুঁজে দেখেন শিশুমনের সান্নিধ্য উপভোগ করার মতো স্নিগ্ধ অনুভূতিকে, কখনো বা বৈষয়িক ভাবনায়, অহংসর্বস্বতায় তৃপ্ত বয়স্ক মানুষকে। এইসব মানুষেরা নাটকে উঠে আসে অমলকে কেন্দ্র করে নাটককে তার সাংকিতকতার আবহে পৌঁছে দিতে।

বিভিন্ন মাত্রার সাধারণ মানুষ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটকে। কবিরাজের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন সেই ধরনের মানুষকে যে পুঁথির বিধানেই চিকিৎসা করে শুধু, রোগীর মানসিক দিকটি তার কাছে উপেক্ষার বিষয়। তার জ্ঞানের পরিধি কতদূর

সেটা সে দেখাতে ব্যস্ত - সে সুযোগ পেলেই কবিরাজি শাস্ত্র আওড়াতে ব্যস্ত। মনের সুস্থতার সঙ্গে শরীরের যোগ আছে এ কথা না ভেবেই সে অমলকে বাইরের আলো বাতাস থেকে ঘরে বন্ধ করে রাখে। দর্শকমনে সরস আমেজ গড়ে দেয়ে এই পুঁথিপোড়ো কবিরাজটি।

শিশুরা স্বভাবতই চঞ্চল, হাতে-পায়ে দুরন্ত। কিন্তু অমল যে অসুস্থ, তার বাইরে যাওয়া নিষেধ। তাই হাতে-পায়ের অস্থিরতা বন্ধ হলে তার মন সক্রিয় হয়ে ওঠে -- সেখানে তার হারিয়ে যাওয়ার কোথাও মানা নেই। জানলার ধারে পথের লোকের সঙ্গেই তার ভাব জমানো। তাদের সাথেই কথা বলে সে চলে যায় দূরে কোন অজানার দেশে। অমলের নাগালের মধ্যে পড়ে দিন আনি দিন খাই মানুষ দইওয়ালা, সময়মতো ঘণ্টা বাজানোর কাজে ব্যস্ত প্রহরী, রোজ ফুলের মালা গাঁথা যার কাজ সেই সুধা, খেলতে আসা ছেলের দল, অন্যকে ভীত ত্রস্ত রাখতে ভালোবাসে যে সেই মোড়ল, আর ছেলের দলকে পাগলামির খেয়ালে মাতিয়ে তোলা ঠাকুরদা।

দইওয়ালা হাঁক দিয়ে গেলে তাকে ডেকে তার গ্রামের কথা জিজ্ঞেস করল অমল। সব মানুষেরই মনের নিভৃত কোণে তার ভালোলাগার বিষয়গুলি মমত্বের সঙ্গে সযত্নে ধরা থাকে। দইওয়ালা তার গ্রামের প্রতি মমত্ব পোষণ করে। তার বিকিকিনির ব্যস্ত মুহূর্তে অমলের কথা তাকে বিশেষ অনুভূতিতে কাঁপায়। তাই দই কিনবে না জেনে অমলের মিছিমিছি ডাকাডাকিতে যে দইওয়ালা বিরক্ত অমলের কথায় সেই মানুষেরই মন বদল হয় - অমলকে বিনিপয়সায় দই খাইয়ে তৃপ্ত হতে চায় সে। গতানুগতিক বিকিকিনির মানুষ আর থাকে না দইওয়ালা - তার অন্তরের মমত্বময় মানুষটিকে বের করে আনে অমল - মুখোশ খসিয়ে মুখ দেখা দেয় এভাবে সব কটি চরিত্রেই। প্রহরী জানে তাকে সকলে ভয় করে। অমল তাকে স্বচ্ছন্দে ডাকাডাকি করছে দেখে প্রহরী কিছুটা বিস্মিত। অমলকে ভয় দেখিয়ে সে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাবার কথা বলে। অমলের শিশুমনের সহজ বুদ্ধিতে রাজার কাছে যাবার জন্য ঔৎসুক্য জাগে। অজানা মানুষের অজানা পেশা জানতে কৌতূহলী হয় শিশুমন। প্রহরী কেন ঘণ্টা বাজায়, সময় কোন দেশে বয়ে চলে যায় -- এ সব নানাধরনের কল্পনাজাত প্রশ্নে সে প্রহরীর অন্তরের মানুষটিকে স্পর্শ করে। দর্শকও দেখে কীভাবে এইসব পেশায় আবদ্ধ মানুষেরা তাদের যান্ত্রিকতার নির্মোক খসিয়ে সহজ, প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। অমল চায় না ঘরে বসে পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হতে। ঘরে বন্দী বলেই তার মন সুদূরের বাঁশি শোনে। সে দেখে তার জানলার পাশে আনাগোনা করা মানুষরা নানা কাজ নিয়ে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। শিশুদের খেলার সাধারণ পেশার মানুষেরা অনেক সময়ই যেমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তেমনি অমলও

যে সব সাধারণ মানুষদের দেখে তার মতই সেই কাজ করার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে। মালিনীর মেয়ে সুধার মত তারও সাধ যায় উঁচু ডাল থেকে ফুল পাড়তে। সুধার কাজ অনেক, তাকে রোজ ফুল পেড়ে মালা গাঁথতে হয়। অমলের মত এক জায়গায় বসে থাকার সুযোগ যদি সে পেত তবে সে বেনে-বউ পুতুলের বিয়ে দিত। কিন্তু সুধার অমলকে ভালো লাগলেও দাঁড়াবার উপায় নেই। শিশু হলেও সে যেন শিশুজগৎ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য - এই কারুণ্য ছুঁয়ে যায় চরিত্রটিকে ঘিরে। বড়ো মানুষের জটিল মানসিকতা, কূট বুদ্ধিতে অচল, অটল থাকে কিছু মানুষ - শিশুমনের সহজ জগতের বাতাস তাদের মহলে পৌঁছায় না। এরকমই এক মানুষ মোড়ল। আর সব চরিত্র থেকে সে ভিন্ন স্বাদের। তাই অমল যখন তার কাছে রাজার চিঠি আসার কথা বলে মোড়ল ভাবে কিছু পয়সা জমিয়ে মাধব দত্তর বড়ো বাড় বেড়েছে - রাজার সঙ্গে আনাগোনা শুরু হয়েছে। অন্যকে ভয় দেখিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে চায় মোড়ল। এই চরিত্র নাটকে এনে দেয় বিপরীত হাওয়াকে। নাটকে কিছুক্ষণ উদ্বেগের আবহ তৈরি হয়। সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষ এইভাবে নাটকের মূল বিষয়টিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। 'ডাকঘর'-এ রবীন্দ্রনাথ এনেছেন খেলা করা চঞ্চল কিছু সাধারণ ছেলের দলকে। চোখের সামনে তাদের খেলা দেখে অমল নিজে চঞ্চল হয়ে ওঠে - তাদের খেলার মধ্যেই নিজের খেলার সাধ মেটাতে চায় সে। কিছু মানুষ থাকে যারা বড়ো মানুষের বুড়োমির ধার মাড়ায় না। শিশুমনের খেয়ালখুশির জগতের সঙ্গে যার থাকে নিবিড় সংযোগ। এই ধরনের চরিত্র হলেন ঠাকুরদা। অমলের অসুস্থতার ক্লান্তি তিনি মুহূর্তে তার মনের মতো কথা বলে অনেকটাই দূর করতে পারেন। তিনি অমলকে ক্রৌঞ্চদ্বীপের কথা বলেন, ফকিরবেশে এসে অমলকে নানা দেশে যাবার মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। অসুস্থ শিশুকে নিয়মের বেড়াজালে কবিরাজের মতো আটকে রাখতে ভালোবাসেন না ঠাকুরদা, অমলের মনের মুক্তি যে চার দেওয়ালের বাইরে তা তিনি বোঝেন, তাঁর সান্নিধ্যে কল্পনার প্রসারিত জগতে প্রবেশ করে অমলও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ভুলে যায় তার অসুস্থতার গ্লানি। রাজার নকল চিঠি দেখিয়ে অমলের সাধ পূরণ করেন ঠাকুরদা। মৃত্যুমুখী শিশু জানে রাজা আসবেন তাকে দেখতে। এই আনন্দেই মৃত্যুর কষ্ট অনেকটা টের পায় না অমল। 'ডাকঘর' নাটকের ব্যঞ্জনা এভাবেই মূর্ত হয়ে ওঠে ঠাকুরদা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

একটি রোগক্লিষ্ট শিশুচরিত্রের কষ্ট ও গ্লানিভার নাটককে কোথাও পীড়িত করে না। ঠাকুরদার কথার মধ্যে দিয়ে সংকেতবহ হয়ে ওঠে 'রাজার চিঠি'র অর্থ দর্শকের কাছে। অন্যান্য সাধারণ মানুষগুলির মধ্যে দিয়েও রবীন্দ্রনাথ দর্শকের কাছে অমলের মতো একটি শিশুর মনোজগতের বার্তা পৌঁছে দেন। অমলের সান্নিধ্যে আসা এই

মানুষগুলিও তাদের অন্তর জগতের উদ্‌ঘাটনে আর টাইপ চরিত্র থাকে না, তারা হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল পৃথক একেকটি মানুষ।

'ফাল্গুনী' নাটকের প্রকাশকাল ১৯১৬। নাটক যেহেতু ইন্দ্রিয়গোচর শিল্প তাই জীবনরহস্যের সাংকেতিক রূপটিকে মূর্ত করে তুলতে হয় বাস্তব-অনুমোদিত চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ এদিকে দৃষ্টি রেখেই একপাশে রেখেছেন নবযৌবনদল-চন্দ্রহাস-সর্দারকে, অন্যদিকে এনেছেন কোটাল-ঘাটের মাঝি-দাদাকে। এদের সঙ্গে পরে যোগ দিয়েছে বাউল। এরা সকলেই সাধারণ মানুষ। তবে দুটি ধারার বিভাজনের মধ্যে তফাৎ আছে। দাদা-কোটাল-ঘাটের মাঝি এরা নিত্য প্রয়োজনের কাজের সীমাকে অতিক্রম করে অপ্রয়োজনের আনন্দকে চিনে নিতে পারে না। তাদের মন আটকে গেছে বড়ো মানুষের বুড়োমিতে। তাই যা মোটা দাগের জীবনকে চালানোর কাজে লাগে না তা তাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন। সর্দারের পরিচালনায় নবযৌবনদলের বুড়োর খোঁজ করে ফেরা দাদার চোখে, কোটালের চোখে ছেলেমানুষি। কেননা তাতে বিপদ আছে — অজানা পথে চলাই তো বিপদ। আর যৌবনধর্মের প্রাণশক্তি আহ্বান জানায় এই বিপদের পথকেই। নবযৌবন দল-সর্দার-চন্দ্রহাস — এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন নতুনকে বরণ করে নেবার জন্য নতুন পথে যাত্রার ঝুঁকি নেবার প্রবণতাকে। তাই এরা সাধারণ হলেও তা ভিন্ন ধারার।

বসন্তের দিনে নবযৌবনদল যখন প্রকৃতির আনন্দের রঙে প্রাণ মেশাতে চায় তখন দাদার উপস্থিতিতে একরাশ বুড়োমি উপস্থিত হয় মঞ্চে। দাদা বলে যে তার বয়স হয়েছে, বসন্ত উৎসবে তাকে মানায় না - একথা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় নবযৌবনদল, কেননা তারা দেখে পৃথিবীর বয়স দাদার বয়সের চেয়ে বেশি অথচ তার নবীন হতে লজ্জা নেই। দাদা তাদের চৌপদী শোনায় যাতে সার আছে, ভার আছে।

> দাদা — একটু বুঝিয়ে দিই — অর্থাৎ বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজত তাহলে —
> না, আমরা বুঝব না।
> কোনোমতেই বুঝব না।
> কার সাধ্য আমাদের বোঝায়।
> আমরা কিছু বুঝব না বলেই আজ পথে বেরিয়ে পড়েছি।
> আজ কেউ যদি আমাদের জোর করে বোঝাতে চায় তাহলে আমরা জোর করে ভুল বুঝব।
> দাদা ও শ্লোকটার অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশ্বের হিত যদি না করি তবে —
> তবে? তবে বিশ্ব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

দাদা ও নবযৌবনের সংলাপ থেকেই স্পষ্ট হয় চরিত্রের বৈপরীত্য সৃষ্টির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নবযৌবনদলকে কতটা সজীব মাত্রা দিয়েছেন। সাংকেতিক নাটকে

রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মানুষকে আঁকার প্রচেষ্টা এভাবেই জীবন্ত, বাস্তবোচিত হয়ে ওঠে, গড়ে ওঠে সরস হাস্য আমেজ। নাটকের ইন্দ্রিয়গোচর শিল্পের দিকটি এই পথেই সার্থকতা পায়।

ঘাটের মাঝি, কোটাল রোজকার প্রাত্যহিকতা থেকে, তথাকথিত নিরাপদ জীবনের ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে জানে না। তাই তারা দাদার চৌপদীর মধ্যে সার খুঁজে পায়। কোটালের কথামতো দাদার চৌপদী শুনলে তাদের চৈতন্য হয় — কেননা, তা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কাজে লাগে। কোটালের কথায় নবযৌবনদলের বুড়োকে ধরার নেশা ভালো কাজ নয়। কিন্তু নবযৌবনদল জানে তাদের জন্ম ত্রহ্যস্পর্শে, সকল কাজেই তাই অনাসৃষ্টি তাই তারা গায় 'ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।' তারা অযাত্রাতেই নৌকো ভাসাতে চায়। আর এই অযাত্রার দিকে নবযৌবনদলকে চালনা করার প্রেরণা জোগায়, সাহস জোগায় সর্দার। সে নিজে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে দেয় না — প্রাণের ভিতর থেকে নতুন পথ চিনে নেওয়ার উদ্যম তৈরি করে। নিজের পাণ্ডিত্যে সর্দার নবযৌবনদলের স্বকীয় বিচারবোধ ঢেকে দেয় না। সর্দারি করে না বলেই নবযৌবনদল ভালোবাসে এই সর্দারকে। এইভাবে বহুআয়তনিক সাংকেতিকতার মাত্রা নাটকে উপস্থাপিত হয় চরিত্রের সংলাপ দ্বারা; নবযৌবনদলের গান দ্বারা। আর সেই সাথে প্রকাশিত হতে থাকে নাটকে সাধারণ মানুষের সাধারণত্বের মাত্রা নির্ধারণ।

বুড়োকে ধরতে পথে বেরিয়ে তার খোঁজ না পেয়ে যখন যৌবনদল ক্লান্ত, হতাশাগ্রস্থ, যখন তাদের মনে হয় সর্দার তাদের ফাঁকি দিয়ে নিজে আরাম করছে তখন রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে আনেন অন্ধ বাউলকে। চন্দ্রহাস বলে সে বুড়োকে পাবার রাস্তা জানে। অন্ধ বলেই 'ওকে রাস্তা খুঁজতে হয় না, ভিতর থেকে দেখতে পায়।' সবাই যখন বুড়োর কথায় ভয় পায়, নানারকম বিকটত্বের কল্পনা করে তখন বাউলের মনেই কোনো ভয় নেই। বাউল বলে,

> 'একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হয়। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।'

গান গেয়ে পথ না চললে এই বাউল পথ দেখতে পায় না। ক্ষণে ক্ষণে তাই তার গান যার ব্যঞ্জনায় সে হয়ে ওঠে সংবেদনশীল একজন মানুষ! সাধারণ হয়েও যে আর সাধারণ নয়। এই বাউলের গানেই নবযৌবনদল আবার ফিরে পায় পথ চলার শক্তি।

'রক্তকরবী' নাটকের প্রকাশসাল ১৯১৬। ধনতান্ত্রিক আগ্রাসিতার লোভ মানুষের ভেতরের মানুষটিকে নিঙড়ে কীভাবে যন্ত্রে পরিণত করছে সেই ভাবনাই এই নাটকের মূল সুর। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের যারা

সর্দারের শাসনে ভীত, যান্ত্রিক কাজে বাধ্য। এই শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে আছে কিশোর, গোকুল, ফাগুলাল, গজ্জু পালোয়ান, শকলু-কঙ্কু-অভিমন্যু, বিশুপাগল। নিজেদের গ্রাম ছেড়ে এসে তারা যোগ দিয়েছে যক্ষপুরীতে সোনার তাল তোলার কাজে। ধনতন্ত্রের আগ্রাসিতার লোভ কীভাবে এই প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সাধারণ মানুষদের সমস্ত প্রাণলাবণ্য শুষে নিয়েছে তাকে ইন্দ্রিয়গোচর রূপ দিতে নাটকে চরিত্রকটির উপস্থাপনার তাৎপর্য অপরিসীম। তাদের অন্তরের মানুষটি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার জন্য আছে মদের নেশার ব্যবস্থা, আছে গোঁসাই-এর হরিনাম, আছে বস্তুবাগীশ ও পুরাণবাগীশ অধ্যাপকের তত্ত্বকথা আর সর্বোপরি আছে মোড়ল ও সর্দারের সতর্ক নজরদারি। তাই ফাগুলালের কাছে 'যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই' — কেননা খাঁচার মধ্যে পাখির ডানায় ওড়ার চঞ্চলতা দেখা দিলে সে নিরুপায়, তার যন্ত্রণা আরও বাড়ে আর তাই চাই মদ। গ্রামের জীবনে প্রাণের মেলায় তাদের ফেরার পথ বন্ধ — 'সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে, খোলা মদের আড্ডায়' ফেরার পথ তাদের বন্ধ 'তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান।' বিশুপাগল চন্দ্রাকে বলে 'আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ, তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি একচুমুকের তরল আগুনে।' যক্ষপুরীতে শ্রমিকদের নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। তাই তাদের মানুষ বলে পরিচয় দেবার মতো কোনো নামেও ডাকা হয় না। তাদের কেউ ৪৭ফ, কেউ ৬৯ঙ তাদের পাড়া ট, ঠ, ইত্যাদি নামে চিহ্নিত। বিশু জানে তাদের দেশে ফেরার ইচ্ছেটাকে শুধু ওপর থেকেই মারা হয়নি তার প্রাণরস শুকিয়েছে ভেতর থেকেই তাই দেশে ফিরলেও খোদাই করা সেখানে বেশি দিন থাকতে পারবে না, সোনার টানে যাদের চোখ ধাঁধিয়েছে তারা আবার ফিরবে আসবে — বন্দীদশা তাদের নিজেদের ভেতরে। যক্ষপুরীর শাসনের শক্তি পঙ্গু করে গজ্জু পালোয়ানের মতো শক্তিধর মানুষকেও। তার সমস্ত শক্তি নিঙড়ে তার মনের জোর, নিজের প্রতি আস্থাও নষ্ট করে ফেলা হয়। এরপর আর দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে সে আত্মপ্রত্যয় পায় না, দুর্বলচিত্তে সে মেনে নেয় পরের শাসন। অনুপ-উপমন্যু যারা কিনা নদীতে বাইচ খেলত, শকলু যে কিনা তলোয়ার খেলায় সকলের ওপরে ছিল তাদের সেই প্রাণশক্তি নেই, তাদের দেখলে আর চেনাই যায় না। শ্রমজীবী মানুষের ওপর প্রশাসনের নিপীড়নের এক সামাজিক দলিল মূর্ত হয়ে ওঠে এই সব সাধারণ মানুষের মধ্যে দিয়ে। এই মরা দেশে নন্দিনী এনেছে আনন্দিত প্রাণের ইশারাকে। প্রতি পদে মানুষের এই দুঃসহ বিপন্নতা মুক্ত হতে চায় নন্দিনীর প্রাণের মাধুর্যের সুধা আস্বাদন করে। রঞ্জনের যৌবনশক্তিতে আন্দোলিত প্রেম আনন্দিত করে নন্দিনীকে, আর সেই আনন্দিত প্রাণের উচ্ছলতা

আবেগ নিয়ে খরস্রোতা তটিনীর ঝংকারে নির্ভয়ে যক্ষপুরীতে বিরাজ করে নন্দিনী। খোদাইকর যে রঞ্জন তারই প্রেমিকা নন্দিনী। অন্যান্যদের মতো সেও এসেছে গ্রামের থেকে — প্রকৃতির প্রাণ লাবণ্যের আবীর রঙে রাঙানো এই মেয়ে একজন সাধারণ নারী — তবু সে রবীন্দ্রভাবনায় অসামান্য। তার এই উজ্জ্বল আনন্দিত আত্মপ্রকাশে বিভ্রান্ত হয় খোদাইকর গোকুল, ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা। যক্ষপুরীর চিরঅভ্যস্ত জীবনে পা রাখে না নন্দিনী, তাই তাকে নিয়ে গোকুলের, চন্দ্রার বিপর্যয়ের আশঙ্কা। তাদের চোখে সে সর্বনাশিনী। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সাধারণত্বের মাত্রা তারই প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এই দুটি চরিত্রে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেও অসাধারণত্বের মাত্রা ধরা পড়ে বাস্তবজীবন অভিজ্ঞতাতেই। ফাগুলালের মধ্যে মানবিক সত্তার বিকাশে, বিশু পাগলের অনির্বচনীয় প্রেমের উপলব্ধির মধ্যে তারই প্রকাশ খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিশোর, ফাগুলাল-বিশুপাগলের ভেতরের চিরমানুষটি জেগে ওঠে নন্দিনীর সান্নিধ্যে। যক্ষপুরীর শাসনকে অগ্রাহ্য করে কিশোরের নির্ভীক অন্তর নন্দিনীর জন্য রোজ ফুল এনে দিতে চায়। — তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বাজি রেখে যে কোনো কাজ করতে চায়। ফাগুলালের মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিবাদী সত্তা। গোঁসাইজি হরিনামে তাদের অবশ করতে এলে তাতে রাজি হয় না ফাগুলাল। আর বিশুপাগলের গানে নন্দিনীর রূপ মূর্ত হয় — সে তার কাছে 'স্বপন তরির নেয়ে', নন্দিনীর জন্য প্রেমের বেদনা আস্বাদন করে বিশুপাগল, তার কাছে তাই সে 'দুখজাগানিয়া।' খোদাইকরদের চর হিসেবে কাজ করে বিশু যাতে নিয়মমাফিক সর্দারদের খবর জোগান দিতে পারে সেই কাজেই বিশুকে আনা হয়েছিল। কিন্তু মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত বিশু যে কাজ করতে পারেনি। উপরন্তু নন্দিনীর প্রেরণায় যক্ষপুরীর শ্রমজীবী মানুষদের ভেতরের মানুষটিকে সে কাঁপন ধরাতে শুরু করেছিল। তার কথায় স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় যক্ষপুরীর পশুত্বের শাসনে ঘেরা যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাজনে যে সব মানুষের নিম্নকোটিতে অবস্থান সেইসব তথাকথিত সাধারণ মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন খোঁজেন অসাধারণত্বের মাত্রাকে তেমনি ক্ষমতা ও অর্থে বড়ো উচ্চকোটির মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান সাধারণত্বকে। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, লোভ, দম্ভ মানুষকে যেখানে পশুত্বের স্তরে নিয়ে যায় তখন মানবতার অপমানে তাদের ন্যূনতম লজ্জাবোধও আর কাজ করে না। তাই অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাজনে তারা শীর্ষে থাকলেও তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পান অতি সাধারণ মানসিকতার মানুষকে। গোঁসাই-মোড়ল-সর্দার এরা সকলেই সেই অর্থে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সাধারণ। ক্ষমতাবানকে তোষণ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজে নেওয়ার পথে হাঁটে চিকিৎসক-গোঁসাই-মোড়লের মত মানুষ। যক্ষপুরীকে

সোনার ধনে স্ফীত করতে প্রয়োজন হয় শ্রমজীবী মানুষদের সমস্ত মানবিক অধিকারের দাবিবোধটুকু থেকে অচেতন করে রাখা। কারণ এদের পরিশ্রমেই মিলবে উচ্চশ্রেণির মানুষের যাবতীয় আরাম সুখভোগ। সর্দারদের কূট অভিসন্ধিতে গোঁসাই হরিনাম শুনিয়ে আধ্যাত্মিক ভাবরসের ছলনায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায় এইসব সাধারণ মানুষের চেতনাশক্তিকে। মোড়লেরও আছে স্বার্থবোধ। তাই সে সমস্ত খোদাইকরের ও বিভিন্ন পাড়ার খবর অতি উৎসাহে সর্দারের কানে তুলতে ব্যস্ত। সর্দারের একমাত্র লক্ষ্য অর্থনৈতিক শক্তিতে স্ফীত হয়ে ওঠা। প্রাণশক্তিতে ভরপুর কিছু মানুষকে যক্ষপুরীর সোনার খনির কাজে নিয়োগ করে তাদের সমস্ত প্রাণরস নিঙড়ে নেবার জন্য সর্দারদের নানা কূট অভিসন্ধি। তাদের সেই শক্তির জালে ঘেরা পড়ে রাজা। খোদাইকরদের মন যাতে মুক্তির জন্য বিচলিত বোধ না করতে পারে তার জন্য তাদের স্ত্রীদেরও সঙ্গে আনার পথ বন্ধ করার কথা ভাবে সর্দার। যক্ষপুরীতে কোনো প্রাণের সাড়া যাতে উঁকি দিতে না পারে তার জন্য সর্দারের সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা। তাই সে শাস্তির জন্য বন্দী করে বিশুকে আর রঞ্জন-নন্দিনীর মিলন যাতে কোনোমতেই না হয় সেই ব্যবস্থা পাকাপাকি করে কৌশলে রাজার হাত দিয়ে রঞ্জন হত্যা করে। নন্দিনীর সংস্পর্শে রাজার বিচলিত অবস্থা দেখে চিকিৎসককে আক্ষেপ করে সর্দার বলে 'হায় হায় কী দুঃখ। আমাদের স্বর্ণপুরী যেরকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল, এমন কোনোদিন হয়নি, ঠিক এই সময়টাতেই।' -- মঞ্চে এইসব চরিত্র জীবন্ত বাস্তবতায় যখন উপস্থিত হয় তখন দর্শক সহজেই উপলব্ধি করে উচ্চকোটির মানুষের ভেতরকার অতি ক্ষুদ্র, সাধারণ চেহারাকে।

'মুক্তধারা' নাটকের প্রকাশসাল ১৯২৫। সাম্রাজ্যলোভের সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার অশুভ আঁতাত মানবতাকে কতখানি নিষ্ঠুর পেষণে দলিত করে এই বার্তাই পৌঁছে দেন রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকের মধ্যে দিয়ে।

বিচিত্র সাধারণ মানুষকে রবীন্দ্রনাথ যেমন নাটকটিতে প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি দেখিয়েছেন উচ্চ শ্রেণির মানুষের মধ্যেও সাধারণ মানসিকতাসম্পন্ন বর্বরতাকে। তাই রাজা হয়েও রণজিৎ সাধারণ, যন্ত্ররাজ বিভূতিও তার অন্যায় ক্ষমতার দম্ভে সাধারণ। যে রাজার শাসনদণ্ড মানুষের সুখ-দুঃখের পাশে থাকে না, সাম্রাজ্যলোভই যার শাসনযন্ত্রের বনিয়াদ তাকে রবীন্দ্রনাথ সাধারণের মানদণ্ডেই বসিয়েছেন। জয়মাল্য তিনি পরিয়েছেন মানুষের পাশে দাঁড়ানো যুবরাজ অভিজিতের গলায়, ধনঞ্জয় বৈরাগীর গলায়। উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ তাঁর পাশের রাজ্য শিবতরাইকে নিজের বশে রাখতে 'মুক্তধারা' ঝরনায় বাঁধ দেন। শিবতরাই-এর মানুষদের চাষের জমির জল শুকিয়ে তাদের অন্ন-জল বন্ধ করাই ছিল রাজার কূট

অভিসন্ধি। তাদের কাছে নিয়মিত খাজনা আদায় করে, তাদের রাজক্ষমতায় ত্রস্ত রাখতে যুবরাজ অভিজিৎকে তিনি শিবতরাই-এ রাখেন। কিন্তু নন্দীসংকটের পথ কেটে শিবতরাই-এর মানুষের আর্থিক দুর্গতি মোচনের ব্যবস্থা যখন অভিজিৎ করে দিল তখন রণজিৎ তাকে ফিরিয়ে আনলেন উত্তরকূটে - রাজদ্রোহী বলে বন্দী করলেন তাকে। সমস্ত নাটকে শিবতরাই-এর মানুষদের কাছে রণজিৎ কীভাবে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছেন সে কথাই ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হয়েছে।

অপরদিকে যুবরাজ অভিজিৎ রাজবংশের কেউ নয়। তাকে মুক্তধারার ঝরনাতলায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল। এ কথা সে জেনেছে। রাজা রণজিতের সাম্রাজ্যলোভ পীড়িত করেছে অভিজিৎকে। মানবতার নিপীড়নে সে পাশে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের। রাজবংশের কেউ না হয়েও প্রকৃত রাজার ধর্ম পালন করেছে অভিজিৎ নন্দিসংকটের পথ কেটে দিয়ে, শিবতরাই-এর মানুষদের কল্যাণের কথা ভেবে মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দিয়ে। সমাজে যাদের বিশিষ্ট কোনো পরিচিতি নেই এমন কিছু সাধারণ মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের এক বিশেষ মানসিকতার দিক রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করেছেন এই নাটকে। কাজের ভালো মন্দ দিক যথাযথভাবে বিচার না করেই কিছু মানুষের কাছে বিশেষ কেউ শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। মুক্তধারার ওপর যন্ত্র বসিয়ে সেই রকমই কিছু মানুষের কাছে জায়গা করে নিয়েছে বিভূতি। যে কিনা ছিল তাদের চবুগাঁয়ের নেড়া বিভূতি, সকলের সঙ্গে কৈলেস গুরুর কানমলা খেত সেই আজকে সকলকে ছাড়িয়ে 'যন্ত্ররাজ' বিভূতি। এইসব সাধারণ মানুষের কথা থেকেই জানা যায় যার কাছে বিভূতি এই বিদ্যে শিখেছে তাদের কদর হয় না রাজার কাছে — সে থাকে অনাহারে। অনেক চাপান-উতোরের পরও এইসব সাধারণ মানুষ মেনে নেয় বিভূতির শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের কাছে বিভূতিকে তোষণের হিড়িক পড়ে যায়। কে তার ডাইনে বসবে, কে তার বাঁয়ে বসবে তার হিসেব চলতে থাকে। কিছু ছকে বাঁধা সাধারণ মানুষের দৌলতে বিভূতির ক্ষমতার আস্ফালন কোন স্তরে পৌঁছতে পারে নিজের দম্ভে কেন বিভূজি যুবরাজকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করে — সে কথাই প্রকাশ পেয়েছে এইসব সাধারণ মানুষের চরিত্র রূপায়ণের ভেতর দিয়ে। এইসব সাধারণ প্রজার সংলাপে নাটকে গড়ে ওঠে সরস মেজাজ যা নাটকের বিষণ্ণতার ভারকে মাঝে মাঝে হালকা করে। ক্ষুদ্রস্বার্থবুদ্ধিতে ঘেরা, বড়মাপের মানবতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন এইসব সাধারণ প্রজাদের মঞ্চে এনে নাটকের দ্বন্দ্বকেও প্রকট করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নন্দিসংকটের পথ কেটে দেওয়ার কথা কানে গেলে এইসব প্রজাদের কাছে যুবরাজ অভিজিৎ আর জনপ্রিয় থাকে না, রাজার বন্দী শিবির থেকে তাকে বের করে এনে শাস্তি দেবার অভিপ্রায়ে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দর্শকের কাছে

নাটকের চরম মুহূর্ত, টেনশনকে ধরে দেন রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের সাধারণ মানুষকে মঞ্চে এনে।

নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন গুরু ও তার ছাত্রদলকে। রাজাকে খুশি করে চললে নিজের কিছু স্বার্থসিদ্ধি হয়, উপরি পাওনা হয় — এ কথা গুরু বোঝে। ছাত্রদের রাজকার্যকে স্তুতি করতে শেখায় এই গুরু। গুরুর দৌলতে ছাত্ররা জানে শিবতরাই-এর জল বন্ধ করে রাজা মহৎ কাজ করেছেন। শিবতরাই-এর মানুষের কাছে ভাবী কালে বড় হয়ে ওঠা এইসব ছাত্ররা যাতে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠতে পারে সেই শিক্ষাই গুরু দেয় — কেননা সেটা রাজার মনের মতো 'মানুষ' হবার শিক্ষা।

নাটকে বাউল চরিত্র বিশেষ ব্যঞ্জনার বার্তাবহ। রাজশাসনে পীড়িত, দুর্গত মানুষদের মুক্তি খুঁজতে যুবরাজ অভিজিৎ যে পথে যাত্রা করেছেন সে পথ থেকে সে আর ফিরবে না এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাউলের 'ও তো আর ফিরবে না রে' গানে। সাংকেতিক নাটকের সাংকেতিকতা এই গানে নিহিত। নাটকের পরিণতি আভাসিত বাউলের গানে যার সংবেদনশীলতা গভীরভাবে ছুঁয়ে যায় দর্শকমনকে।

সবশেষে যার কথা না বললে অসমাপ্ত থেকে যায় রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ মানুষকে দেখা সে ধনঞ্জয় বৈরাগী। এই মানুষ নাটকের আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের মতো বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধিতে বাঁধা পড়েনি, তার মনের গড়ন, চরিত্রের গড়ন বাঁধা আছে আরো উঁচু তারে। তার পুজো মানুষের প্রাণের দেবতার কাছে। তাই রাজশাসনের চোখ রাঙানিতে সে ভীত নয়। শিবতরাই-এর দুর্গত প্রজাদের মানসিক বল বাড়ে এই ধনঞ্জয় বৈরাগীকে কাছে পেয়ে। নানা গানে মানুষটির ভয়হীন, তেজোদীপ্ত মূর্তিটিই সঙ্কেতবহ হয়ে ওঠে। ধনঞ্জয় বৈরাগী বোঝে রাজত্ব শুধু একা রাজার নয়, তা প্রজাদেরও। রাজা যেমন নিপীড়ন করতে পারেন না তাঁর দম্ভের শাসনদণ্ড দিয়ে তেমনি প্রজাদেরও বিনাশের শক্তি নিয়ে অধিকার দাবি করা অনুচিত। মানবতা দেবতা যেখানে বিরাজ করেন মানুষের মধ্যে তিনিই পাঠান শুভবুদ্ধির বার্তা। তাই ধনঞ্জয় বৈরাগী বলে, 'যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না, রাজারও নয় প্রজারও না। ও তো বুক ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় করে বসা চাই।' সাংকেতিক নাটকের ভাষা এইভাবে ব্যবহৃত করতে চরিত্রটির প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা যায়। ধনঞ্জয় বৈরাগীর লক্ষ্য আত্মশক্তিতে সাধারণ মানুষকে জাগরিত করা। কিন্তু সে যখন দেখে তাকে না হলে সাধারণ প্রজারা মনের বল হারায় তখন রাজাকে সে বলে, 'ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি পাকিয়ে তোলা হয়নি আর-কি।' প্রজাদের কাছ থেকে তাই সে শেষপর্যন্ত সরে দাঁড়ায়। মানবজীবনের

প্রকৃত সত্য অন্বেষণের প্রয়োজনেই ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো চরিত্রসৃষ্টি নাটকটিকে সার্থকতা দিয়েছে।

'কালের যাত্রা' (১৯৩২) নাটকেও সাধারণ মানুষের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ ভাবনার উচ্চারণ করেছেন। নাটকটিতে এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ। রথের চাকা কেন নড়ে না এই প্রশ্নে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে, চিরকালের অভ্যাস ভঙ্গের বিস্ময়ে তারা আলোড়িত। নাটকে এসেছে সমাজের অস্পৃশ্য, নীচু জাতির কথা যারা চিরকাল উচ্চশ্রেণি ও উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা লাঞ্ছিত, নিপীড়িত।

নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে দর্শকমনের ঔৎসুক্য সজাগ করতে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এসেছেন কিছু সাধারণ মহিলাকে যারা এসেছে রথের মেলার উৎসবে যোগ দিতে। তাদের সংলাপে নাটকের প্রথমেই বিস্ময় তৈরি হয় — চিরকালের অভিজ্ঞতা অনুসারে রথের চাকা নড়ছে না। তৃতীয়ার কথা থেকে জানা যায় রাজ্য জুড়ে যেখানে প্রচুর জনসমাগমের দিন, যেখানে ব্রাহ্মণ ঠাকুর শিষ্য নিয়ে বেরোবেন, পেছনে চলবে সৈন্যসামন্ত, পণ্ডিতমশাই চলবেন পুঁথিপত্র হাতে ধরা ছাত্রদের নিয়ে সেখানে সমস্তই বন্ধ। দ্বিতীয় বলে, 'চারিদিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে / ছমছম করছে গা।' সন্ন্যাসীর সংলাপে তার কারণ স্পষ্ট হয় 'তোমরা কেবলই করেছ ঋণ / কিছুই করনি শোধ, / দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত। / তাই নড়ে না আজ আর রথ /'

এই ধরনের সাধারণ মানুষের মঞ্চে উপস্থিতিতে দর্শক মন ধীরে ধীরে প্রবেশ করে নাটকের মূল বিষয়ে। নাগরিক দলের কথায় প্রকাশ পায় নানা আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা যা নাটককে নাটকীয় গতি দান করে। কারোর মনে ভয় জাগে, রথের রশিকে সাপের ফণা বলে বিভ্রম জাগে, আবার কেউ ভাবে রথের রশি নিজে থেকে নড়লে চাকার তলায় নিজেদেরই পড়তে হবে। মানুষের অবচেতনে যে পাপবোধ সঞ্চিত থাকে এইসব মানুষের উৎকণ্ঠায় তাই আভাসিত। তাদের মনে হয় 'দেশে পুণ্যাত্মা কেউ নেই কি আজ / ধরুক না এসে দড়িটা।' মহিলাদের কথায় ফুটে ওঠে চিরাচরিত সংস্কারের কারণে ভীতি সমাজে, সংসারে নানা অলক্ষণের দিন বুঝি ঘনিয়ে উঠেছে। নারীকে যে সমাজ অশ্রদ্ধা বশত দূরে ঠেলেছে, মহাকালের রথ চালনায় তার ভূমিকা স্বীকার করেনি সেই নারীকণ্ঠই আজ সোচ্চারিত। দ্বিতীয়া বলে 'আমরা না থাকলে পুরুতের পেট হত না এত মোটা।' যেখানে সমাজে এত উঁচু নীচুর ভেদাভেদ তা যতদিন সমান না হচ্ছে ততদিন রথের রশি নড়বে না। সন্ন্যাসীর এই কথা বিস্মিত করে তৃতীয়াকে – 'বাবা, সাতজন্মে শুনিনি এমন কথা / চিরদিনই তো উঁচুর মান রেখেছে নীচু মাথা হেঁটে ক'রে / উঁচু-নীচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।' সাংকেতিক নাটকে

এইভাবে বিচিত্র মনস্তত্ত্ব বিচিত্র সাধারণ মানুষের সংলাপে উঠে এসে নাটকের অভিনয় ও মঞ্চ উপস্থাপনার বাস্তবতার দরজা জানলাগুলো খুলে দেয়। চিরাচরিত অভ্যাসের সংস্কারে এইসব মানুষ মনে করে উঁচু বর্ণের কাজে নীচু বর্ণের মানুষে হাত দিয়েছে বলেই এই অনর্থ। চিরকালীন সমাজব্যবস্থার অদলবদল হতে দিতে আত্মশ্লাঘা জাগে কিছু মানুষের। তাই প্রথম সৈনিক বলে,

> 'আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র, / কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ।/' ক্ষমতার জোরে চিরকাল ঠেকিয়ে রাখা যায় না মানুষের অধিকার — তাই শূদ্র পাড়ায় গোল ওঠে — চর এসে মন্ত্রীকে খবর দেয় 'দলে দলে ওরা আসছে ছুটে — বলছে, রথ চালাব আমরা।'

শূদ্রদের দলপতি বলে,

> 'এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়, দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে। এবার সেই বলি তো নিল না বাবা।' রথের রশি টানার অধিকার দেবতা যে তাদেরই দিয়েছেন। পুরোহিত বলে, 'স্পর্ধা দেখো একবার। কথার জবাব দিতে শিখেছে।'

নাটকীয় দ্বন্দ্বের মুহূর্ত নির্মাণে এই ভাবেই বিচিত্র সাধারণ মানুষের উপস্থাপনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সৈনিকরা বাধা দিতে এলে দলপতি বলে, 'আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ' - / আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।' তাদেরই টানে রথের চাকা নড়ে ওঠে - পুরোহিতের কাছে তা অবিশ্বাস্য, সৈনিকদের মনে ভয় ও আতঙ্ক আর নারীরা দেখল পুরোহিত এতদিন যা শিখিয়েছে তা ভুল। সৈনিকের প্রশ্নে এই উল্টোপাল্টা ব্যাপারের কৈফিয়ৎ দিল কবি —

> 'মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানেনি। / রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে — / দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।'

কবির অন্তর দৃষ্টিতে সাংকেতিক নাটকে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিশেষ ব্যঞ্জনার মাত্রা নিয়ে ধরা দেয়।

রবীন্দ্রনাটকের পূর্বধারায়ও সাধারণ মানুষ প্রচলিত অর্থে ও বিশেষ অর্থে এসেছে যা আরও পরিণত, ব্যঞ্জনাময় হয়েছে তাঁর সাংকেতিক নাটকে। মানুষকে তার মনুষ্যত্ববোধের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রেণি-বর্ণের বিভাজনের মধ্যে দিয়ে নয়। এই মাপকাঠির বিচারেই কেউ অভিজাত হয়েও সাধারণ আবার যাদের সমাজে কোনো বড় পরিচয় নেই, যারা শ্রেণি বর্ণ বিচারে নিম্ন, যারা প্রান্তিক, যারা অন্ত্যজ তাদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পান দেবতার আসনকে — মানবতার ধর্মে তারা ছোট নয়, প্রাণের সজীবতার স্পন্দন আছে তাদেরই মধ্যে। তারাই সভ্যতার রশিতে লাগাতে পারবে টান — সমস্ত স্থবিরতা, বর্বরতা খসে যে

সভ্যতা হয়ে উঠতে পারবে মানুষের সভ্যতা। তাই রবীন্দ্রনাথের জয়মাল্য তাদের গলাতে দুলেছে। সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'যাবার মুখে' কবিতার রবীন্দ্রনাথ লিখছেন —

'সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
তারা কেহ নয়, তারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে।
শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে,
অমরাবতীর নৃত্যনুপূর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।'

সাধারণ মানুষকে এভাবেই অসীমের ইশারা নিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাংকেতিক নাটকে। আর যাদের ক্ষেত্রে তা পারেননি সেখানেও মন তাঁর সজাগ থেকেছে সংসারে বিচিত্র মানুষকে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে নেবার প্রচেষ্টায়।

গ্রন্থপঞ্জি

চৌধুরী ভূদেব

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা চতুর্থ পর্যায় (রবীন্দ্রযুগ : দ্বিতীয় পর্বে)
দেজ পাবলিশিং : কলকাতা। জানুয়ারি ১৯৯৪।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চম খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : কলকাতা পৌষ ১৩৯৪।
র-র ষষ্ঠ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ : কলকাতা। বৈশাখ ১৩৯৫।
র-র সপ্তম খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ : কলকাতা। আশ্বিন ১৩৯৫।
র-র অষ্টম খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ : কলকাতা। ফাল্গুন ১৩৯৫।
র-র একাদশ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ : কলকাতা। আষাঢ় ১৩৯৭।

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা। আশ্বিন, ১৩৭৩।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সংগীত অন্তপ্রাণ ড. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে নদিয়ার মাঝদিয়ায় অবস্থিত সুধীররঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপিকা।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা : জাতীয়তাবাদ

সৌমেন ঘোষ

আপামর বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্ববন্দিত কবি বা সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত হলেও আক্ষরিক অর্থে ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর মণীষার উজ্জ্বল আলোকে মানব সভ্যতার বিচিত্র দিক আলোকিত করেছেন। জগৎ ও জীবনের বিবিধ বিষয় সম্পর্কে কবি তাঁর অকপট চিন্তা-চেতনা অভিব্যক্ত করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাসের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ইতিহাস তথা ঘটনাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সংযোগ ছিল সুবিদিত। কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিচিত্র সম্ভারের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমাজ চেতনার পাশাপাশি পরিস্ফুট হয়েছে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা। উচ্চ শিক্ষিত ও পশ্চিমি সভ্যতার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন জাতীয় চেতনা তথা জাতীয়তাবাদের ধারণা। কিন্তু সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, মানবিক অধিকার, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদের মতো রাজনৈতিক বিষয়গুলি শাশ্বত ভারতীয় চেতনার রসে জারিত করে তাকে ব্যাখ্যা করেছেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন আঙ্গিকে। যার দ্বারা সাহিত্যলোকের রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক ও বরণীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্।

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্রচিন্তা না হলেও সমকালীন রাজনৈতিক প্রবাহ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন —

> "রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত কখনো তেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন না.। কিন্তু দেশের ও দশের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দৈন্যের সহিত সহানুভূতির অভাব কোনদিনই তাঁহার হয় নাই।"

সমস্ত প্রকার শোষণ, পীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মানুষের মুক্তি ও মানব কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। পরিণত বয়সে প্রণীত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গান, নাটক, কবিতার মধ্য দিয়ে সমকালীন রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর রাজনীতি বিষয়ক রচনাগুলি উঠে এসেছে

'মন্ত্রী অভিষেক', স্বদেশী সমাজ, আত্মশক্তি, রাজা ও প্রজা, স্বদেশ, সমাজ, কালান্তর, ন্যাশনালজিম্, ইম্পিরিয়ালিজম্ প্রভৃতি রচনায়।

বাল্যকাল হতে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ছিল যুগ ও সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা প্রবাহমান, একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালান্তর পর্যায়ের রচনা 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত শীর্ষক' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। শচীন্দ্রনাথ সেনের 'Political Philosophy of Rabindranath' শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

> "বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থায় এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজ করেছি। যেহেতু বাক্যরচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্য যখন যা আমার মনে এসেছে তখনই তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে সেই সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার ধারণাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোন বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোন এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি। জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্য সূত্র আছে।"[১]

আসলে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ছিল গতিশীল। সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রথম দিককার রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তিনি সমকালীন রাজনীতির অতিমাত্রায় অনুকরণ প্রবণতার বিরোধিতা করেছেন। আবার পরবর্তীকালে স্বদেশি সমাজ শীর্ষক রচনায় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার অনুসঙ্গ হিসাবে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের বিষয়টি প্রধান্য পেয়েছে। প্রাথমিক পর্বে কংগ্রেসের চরমপন্থী আদর্শ ও স্বদেশি আন্দোলনের রক্ষণশীল ধর্মীয় ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারা সংকীর্ণধর্মবোধ বর্জিত হয়ে বিশ্বজনীনতার আদর্শে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্বদেশিযুগে তার অসংখ্য গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে তার অকৃত্রিম দেশপ্রেম, স্বদেশ চেতনা। কিন্তু মানবতাবাদী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের এই দেশপ্রেম বা স্বদেশভাবনা কখনই অন্ধদেশাত্মবোধ ও উগ্রজাতিপ্রীতির রূপ পরিগ্রহ করেনি। পরিবর্তে তো সঞ্চারিত বিশ্ব মানবের কল্যাণ কামনার আদর্শে।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় সমাজ শক্তির প্রাধান্য। তিনি রাজনীতিকে কখনই রাষ্ট্রসর্বস্ব বিষয় হিসাবে দেখেননি। পরিবর্তে তার কাছে তা সমাজ সর্বস্ব বিষয় হিসাবে ধরা পড়েছে। তিনি বিশ্বাস

করতেন সমাজের কল্যাণের মধ্যেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর রাষ্ট্রভাবনা ইউরোপীয় রাষ্ট্রদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। বরং তা ছিল সনাতনী ভারতীয় দর্শন ও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন প্রতিটি সভ্যতার একটি নিজস্ব মূল বা ভিত্তি আছে। ইউরোপে রাষ্ট্র যেমন সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত্তি। ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল আধার হল সমাজ। ভারতবর্ষীয় ধারাকে অনুসরণ করে তাই তিনি সমাজের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বদেশি সমাজশীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন

> "ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত দেশের সমস্ত কল্যাণ ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে করিয়াছিল মাত্র।"[২]

তিনি আরো বলেছেন –

> "ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানে পুঞ্জিত হয়, সেখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয় তাহলে দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্য ইউরোপে পলিটিক্স এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয় তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন ইউরোপে ঐক্য অর্জিত হয়েছে রাষ্ট্রের মাধ্যমে। তাই 'ইউরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান।"[৪] অন্যদিকে বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষ গ্রন্থিত হয়েছে সমাজের সূত্রে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শক্তির উপর নির্ভরশীল সহযোগিতার উপর নয়। রাষ্ট্র জাতিকে বলবান করে, আর মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় সমাজ। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষ কল্যাণকামী, যে সকলের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তুলতে চায়। মানুষের এই সমাজবোধ সার্থকরূপ পরিগ্রহ করে বিশ্বমানবিকতায় যেখানে সকল জাতি এক মানবিকতায় আবদ্ধ হতে পারে। এ চাহিদা নেশন স্টেট্স মেটাতে সক্ষম নয়। ইউরোপীয় জীবন যেখানে 'নেশনস্ স্টেট্স' কেন্দ্রিক ভারতীয় জীবন সেখানে সমাজকেন্দ্রিক। এই সমাজভিত্তিক ভারত

> "বিরোধিতাকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করেনি, পরকে শত্রু মনে করেনি। বহুমুখী পথ ও বিচিত্র মতকে সমাজে ঐক্যবদ্ধ করেছে, সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে সকলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নেশন স্টেটস ভারতীয় ভাবধারার পরিপন্থী এবং শক্তি দম্ভে মত্ত, মিলনের পরিবর্তে নিরঙ্কুশ জবর দখলেই তার তুষ্টি, সেখানে প্রেমের স্থান নেই।"

মানবতাবাদী কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ মানব কল্যাণের উৎস অন্বেষণ করেছেন মানব সমাজের মধ্যেই। তাই তাঁর ভাবনা জাতিরাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ পরিসরকে অতিক্রম করে বৃহত্তর মানব সমাজের সমবায়িক অঙ্গনে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন প্রকৃত মানব কল্যাণের পথ।

রাষ্ট্র ও মানব সমাজের রূপরেখা অঙ্কন করতে গিয়ে ইতিপূর্বে ভাববাদী দর্শনের প্রধান স্থপতি হেগেল ভাব সত্তার চূড়ান্ত রূপ হিসাবে রাষ্ট্রকে তুলে ধরে। তার উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কাছে রাষ্ট্র হল 'March of God on the earth'। তাই তিনি এই চূড়ান্ত ও দৈবজাত প্রতিষ্ঠানের কাছে মানুষের পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন তথা আত্ম নিবেদনের কথা বলেছেন এবং মনে করেছেন এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা ঘটাতে পারবে। হেগেলের পরবর্তীকালে মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বের মাধ্যমে উৎপাদনকেন্দ্রিক শ্রেণি সম্পর্কের নিরিখে রাষ্ট্রের চরিত্রকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কাছে শ্রেণি বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র একটি উৎপীড়নের যন্ত্র হিসাবে ধরা পড়েছে। তিনি এই রাষ্ট্রকে কোন শাশ্বত বা চিরন্তন প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেননি। পরিবর্তে শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির এক নায়কত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হেগেলের মতো রাষ্ট্রের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদনের পক্ষে সওয়াল করেননি। আবার মার্কসের মতো রাষ্ট্রের বিলুপ্তিও চাননি। পরিবর্তে তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের কর্মক্ষেত্রের পৃথকীকরণ ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চিন্তায় মানুষের মনুষ্যত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর যথার্থ বিকাশের জন্য সমাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আসলে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রগাঢ় দার্শনিক প্রজ্ঞা ও মননশীলতার দ্বারা বুঝেছিলেন মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার সুষম সমন্বয় কখনই ক্ষমতা বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সাধিত হতে পারে না। বরং তা সম্ভব হতে পারে সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং মানবতাবাদের সম্প্রসারণে।

সমকালীন বিশ্ব বিশেষত ইউরোপ জাতি, জাতীয়তাবাদের চেতনায় দারুণভাবে উদ্বেলিত, জাতি-জাতীয় জনসমাজ, জাতিরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে যে জাতীয়তাবাদের প্লাবন দেখা দিয়েছে এশীয় রাষ্ট্রগুলিতেও লেগেছে তার ঢেউ। জাতীয়তাবাদের অমোঘ নেশায় সমাচ্ছন্ন ইউরোপ উগ্রজাতিপ্রেম জাতিশ্রেষ্ঠ প্রমাণের নিষ্ঠুর খেলায় মত্ত। পাশ্চাত্য চিন্তকরা এই জাতীয়তাবাদকে 'উচ্চাদর্শের' আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সদা প্রয়াসী। ঠিক তখন ভারতীয় সমাজকেন্দ্রিক রাষ্ট্র ভাবনায় ভাবিত রবীন্দ্রনাথ জাতি ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে

এসে ভারতীয় সনাতনী চেতনার আলোকে এবং বিশ্বকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতি ও জাতীয়তাবাদের ধারণাটি পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপে শিল্পপণ্যের উৎপাদন অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের বাজার দখলকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির শুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতা এবং এর থেকে জন্ম নেয় সাম্রাজ্যবাদ যা জাতীয়তাবাদের মুখোশে আবৃত থাকে। রবীন্দ্রনাথ তার জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এই সমবায়িক নিষ্ঠুর রূপটিকে তুলে ধরেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে তাঁর 'Nationalism' গ্রন্থে। ১৯১৬-১৭ জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকালে বিভিন্ন স্থানে তিনি যে সকল ভাষণ প্রদান করেন তার সংকলিত রূপ এই Nationalism গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করলে দেখা যায় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের নগ্ন ও বীভৎস প্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে শঙ্কিত করেছে। তিনি মনে করেন পশ্চিমি সভ্যতায় বিকশিত রাষ্ট্রভাবনার বিষয়গুলি যেমন — 'নেশন-স্টেট্‌স', 'ন্যাশন্যালিজম্' প্রভৃতি প্রাচ্য সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণ অভিনব, অপরিচিত এবং অসংগতিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদকে 'বাণিজ্য ও রাজনীতির এক সমবায়' হিসাবে দেখেছেন। তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণাটি তুলে ধরেছেন এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যখন উগ্রজাতীয়তাবাদের ভাবধারায় জাগ্রত পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি আত্ম বিধ্বংসী সংঘর্ষে লিপ্ত এবং যার ছোঁয়াচ লেগেছে এশিয়ায় যেখানে জাপান নববিকশিত জাতি হিসাবে এই সাম্রাজ্যবাদী রণসজ্জায় সামিল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই আধিপত্যবাদী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মানবতাবিহীন ধ্বংসাত্মক রূপকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 'Nation' ভারতীয়দের কাছে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা। ব্রিটিশদের পূর্বে ভারতে অনেক শক্তি যেমন মোগল, পাঠান এসেছে কিন্তু তারা সকলে এদেশে Race হিসাবে এসেছে, জাতি হিসাবে নয়। কিন্তু ব্রিটিশরা আমাদের উপর 'Nation State' বা 'জাতি-রাষ্ট্রের' ধারণাটি চাপিয়ে দিয়েছে। তাঁর মতে পশ্চিমি জাতিরাষ্ট্র হল যান্ত্রিক লক্ষপূরণের উদ্দেশ্যে গঠিত মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন বিশেষ। সমসাময়িক ইউরোপীয় রাষ্ট্রদার্শনিকগণ জাতীয়তাবাদকে এক মহান আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাস সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমি জাতীয়তাবাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন জাতীয় আত্মম্ভরিতা এবং জাতিগত আধিপত্যের তত্ত্ব।[৫] রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 'Nation' হল সেই চরিত্র বিশিষ্ট নির্দিষ্ট জনসমষ্টি যা কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন যান্ত্রিক

উপায় সিদ্ধ করার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। সুতরাং তাঁর মতে 'Nation' হল সমগ্র জনসমষ্টির স্বার্থচেতনার সংঘটিত ও সংকীর্ণ রূপ। কবির দৃষ্টিতে রাজশক্তির ঐক্যসৃষ্টিকারী প্রভাব অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন বা 'race' ধর্ম বা ভাষাগত ঐক্য নেশনের উদ্ভবের মূলকারক নয়। কারণ সমকালীন "ইউরোপ জাতি মিশ্রণ হয়নি এমন রাষ্ট্র ছিল না।"[৬] আবার একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির অস্তিত্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে প্রায়শই লক্ষ করা যায়। তাই তিনি মনে করেন নেশন গঠনে উপরোক্ত উপাদানগুলির প্রভাব থাকলেও এর মূল উৎস হল আত্মিক ও মানসিক। তিনি বলেন,

> "সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ ..... একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগ, দুঃখ স্বীকার এবং পুনরায় সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একিভূত নিবিড় অভিব্যাপ্তি দান করে তাহাই নেশন।"[৭]

এর পিছনে ক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে কাজ করে "সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলে একত্রে জীবন বহন করার সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত ইচ্ছা।"[৮]

পশ্চিমি জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও তার বিরূপ ফলাফল বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে এই সাম্রাজ্যবাদ বা উগ্রজাতীয়তাবাদকেই চিহ্নিত করেছেন। লড়াইয়ের মূল প্রবন্ধে তিনি ইউরোপীয় উগ্রজাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এই ভাবে

> "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্য রাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে। সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে। এক সময় জিনিসই হল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তাহার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া ফেলা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেখানেই — জমা খরচ সব এক জায়গাতেই। কিন্তু বাণিজ্য প্রবাহের মতো রাজত্ব প্রবাহেরও দিনরাত আমদানি-রপ্তানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটি নতুন কাণ্ড ঘটিতেছে — তাহা একদেশের উপর আরেক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুইপারে। ...... এখানে মুশকিল হইয়াছে জার্মানির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল, সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড় কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গস্‌গস্‌ করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে তাহলে আমি নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।"[৯]

সভ্যতার সংকটরূপে উগ্র জাতীয়তাবাদকে চিহ্নিত করে কবি দেখিয়াছেন যে

জাতীয়তাবাদ অবধারিতভাবে সাম্রাজ্যবাদকে প্রশ্রয় দেয়। পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শাসনের দ্যোতক 'নেশন'কে তিনি এক 'দানব' বলে অভিহিত করেছেন। এই নৃশংস দানব দুর্বল দরিদ্র পরাধীন জাতিকে হিংসার যুপকাষ্ঠে বলী দেয়। পশ্চিমি শক্তিসমূহ নেশনের নামে তাদের আগ্রাসী মনোভাব ব্যক্ত করেছে। আর এই নেশনের নামেই পৃথিবীর অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে ভোগ করার উদগ্রবাসনা চরিতার্থ করতে তারা উদ্‌গ্রীব। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় শক্তি সমূহরে এই নির্লজ্জ বাসনাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করেছেন। তিনি বিশ্ববাসীকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন ' নেশন' হল বীভৎস বিভীষিকাময় মূর্তিমান অশুভ শক্তি যা নিতান্তই নিষ্ঠুর ও সংক্রামক। অপর জাতিকে ছোট করে নিজের জাতিকে বড় করার মানসিকতাকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> "মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারা হউক নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে ইহা নেশনের ধর্ম। ইহা প্যাট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত থেকে নেশনতন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে এমন সভ্যতার নির্দেশ তো আমরা এখনও য়ুরোপে দেখিতে পাই না।"[১০]

তিনি দেখিয়েছেন জাতি বা নেশন তার শক্তি মদমত্ততা সমৃদ্ধির সমস্ত ঠাটবাট, তার পতাকা ও পবিত্র স্তবগান, মন্দিরে গির্জায় নির্লজ্জ প্রার্থনা এবং স্বদেশে ধর্মের নামে সাহিত্যের হুহুঙ্কার নিয়ে যতই তর্জন গর্জন করুক না কেন এই সত্যটি সে লুকিয়ে রাখতে পারবে না যে জাতিই হলো জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু এর একমাত্র অভীপ্সা, অবশিষ্ট পৃথিবীর দুর্বলতার সুযোগে ফুলে ফেঁপে ওঠা। ঠিক যেমন কোন কোন শিকারি কীট তার শিকারের বিবশ মাংসের আস্বাদনে পুষ্ট হবার জন্য শিকারকে প্রাণে না মেরে কেবল তার মাংস স্বাদযুক্ত করার জন্য তাকে ক্ষীণজীবী করে রাখে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে উগ্রজাতি প্রেম ও জাতি পূজা ছিল বর্জনীয়। কারণ এই উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় আচ্ছন্ন মানুষ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে নিজেরই সৃষ্ট দানবের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পশ্চিমি উগ্রজাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসারেই শঙ্কিত হননি, পশ্চিম আত্মঘাতী জাতীয়তাবাদের অনুগামী জাপানে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ অন্ধ দেশপ্রেম ও তীব্র স্বাজাত্যবোধ জন্ম দেয়। তাই তা একটি নেশার মতো। সেই উগ্রজাতীয়তাবাদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে। এর প্রভাবে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি মানুষ নেশনের কর্তৃত্বাধীন যন্ত্রে পরিণত হয়। তাই জাতীয়তাবাদ হল মানুষের সৃষ্ট এক দানব যা সৃষ্টি করে 'সভ্যতার সংকট জন্ম দেয় জাতি গৌরবের উন্মাদনা ও উপনিবেশ বিস্তারের লালসা। তাই রবীন্দ্র

দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ হল এক ভয়ানক নির্মম মহামারী, এক পাপ-পঙ্কিল সংক্রামক ব্যাধি যা মানুষের প্রাণশক্তিকে শেষ করে দেবে। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন,

> "যাহারা ইম্পীরিয়লিজমের খেয়ালে আছেন, তাহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অধিকার ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই, পৃথিবীর নানা দিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।"[১১]

অন্য জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন, পররাজ্য গ্রাসের আসক্তিতে মত্ত এই বিকৃত জাতীয়তাবাদী প্রবণতাকে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করে বলেন, "নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম, কী প্রকার নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।"[১২]

শিক্ষার মিলন শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন,

> "পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে, কিন্তু ন্যাশ্যানালিজম্ সত্য নয়। অথচ সেই জাতীয় গণ্ডি দেবতার পূজার অনুষ্ঠানের চারিদিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যতদিন বিদেশি বলি জুটত ততদিন কোন কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্য স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল ..... যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল দেখা গেল ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোশ পরে। ..... পশ্চিমি মণীষীরা ভীত হয়ে বলেছেন যে, যে দুর্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনা উৎপত্তি, এত মারের পরেও তার নাড়ি বেশ তাজা আছে এই দুর্বুদ্ধির নাম ন্যাশ্যানালিজম্, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু। ঐক্য তত্ত্বের উল্টো দিক অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান।"[১৩]

ইউরোপের বলশালী পররাজ্য লোলুপ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন,

> "একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বতন্ত্র লোপ করে তারাই সর্বজাতির স্বাতন্ত্র লোপ করে। ইম্পিরিয়ালিজম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে।"[১৪]

পশ্চিমি সভ্যতার বেনিয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও তারই তাগিদে পররাজ্য গ্রাসের প্রবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাষায় নিন্দা করেছেন কারণ সেইসব অত্যাচারী দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির মধ্যেই বিদ্বেষ বিশ্বাসঘাতকতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভীতির মনোভাব পরিস্ফুট, সেখানে প্রেম ও প্রীতির স্থান নেই। কারণ,

> "নেশনের মেরুদণ্ডই যে স্বার্থ। স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং স্বার্থের সংঘাতে

মানুষকে অন্ধ করিবেই ..... এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদায় আশঙ্কাজনক। এস্থলে বিরোধ, বিদ্বেষ অন্ধতা মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন এসমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।"[১৩]

এই সাম্রাজ্যবাদের উগ্র ও নিষ্ঠুর রূপ তিনি তাঁর নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে অসাধারণ কাবিক্য নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন :

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

ভূয়োদর্শী চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের করাল রূপ ও তার প্রকৃতি বর্ণনা করেই তাঁর দায়িত্ব সমাপ্ত করেননি। কোন পথে এই উগ্রজাতীয়তাবাদী রূপ নিষ্ঠুর দানবের হাত থেকে ভাবী বিশ্বকে রক্ষা করা যায় সে পথের সন্ধানও দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে আন্তর্জাতিকতাবাদে উত্তরণের মাধ্যমেই একমাত্র আগামী মানব সভ্যতা তার অস্তিত্বটি ফিরে রাখতে পারে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা পরিণতি লাভ করেছে আন্তর্জাতিকতাবাদে। তাঁর দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এই পথে মানব সভ্যতার সংরক্ষণ সম্ভব নয়। সমকালীন পৃথিবীতে বিকৃত জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপের বিস্তার ঐক্য ও শান্তির দূত রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছে। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক সীমারেখা মানুষের মনে সংকীর্ণতার সৃষ্টি করে এই পথেই সৃষ্টি হয় জাতিদম্ভ ও সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতার। এই সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণীত হওয়ার কথা বলেছেন। বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বমানবিকতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই হল এই সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। তিনি মনে করেন মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যেই বিকশিত হতে পারে। জাতীয়তাবাদের মধ্যে নয়, তাই রবীন্দ্রনাথ পররাজ্য

লোলুপতা, বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সতত সরব ছিলেন। তাঁর মতানুসারে নিখিল মানবের সামগ্রিক কল্যাণ খন্ড খন্ড জাতি সত্তা সমূহের বহুমুখী বিকাশ ও উন্নতি সাধনের মাধ্যমেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সমাজ চেতনার মধ্যেই তাঁর মানবতা ও বিশ্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সমাজের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে বিশ্ব নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি সংকীর্ণ জাত্যাভিমান মোচন এবং উদার বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মননশীলতার সম্যক অনুশীলনের উপর জোর দিয়েছেন। তাই শিক্ষার মিলন শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন মানুষের মননশীলতার যথোচিত কর্ষণেই জাত্যাভিমান মোচন করা যায়। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তি দান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতানুসারে ঐক্যবোধের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থ মিলন সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালীর রাষ্ট্র চিন্তা'য় যথার্থ উল্লেখ করেছেন :

"যে সময় সারা বিশ্ব জাতীয়তাবাদের বিদ্বেষ ও বিভেদ প্রসূত হলাহল পানে উন্মত্ত সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানব সমাজকে একই মালায় গাঁথতে চেয়েছিলেন; তিনি এই বলে সতর্ক করেছেন যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও দ্বন্দ্ব চলতে থাকলে পরিণামে তা আত্মঘাতী হতে বাধ্য। মানুষের ধর্ম তার ঐক্যের মধ্যে নিহিত। পৃথিবীটাকে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক রেষারেষি ও কলহের আধার হিসাবে না দেখে মানুষের শাশ্বত আত্মার পবিত্র বাসভূমি রূপে দেখেছেন; হৃদয়গভীর আবেগে তিনি কামনা করেন বিশ্বজনীন মিলন; সেই বিশ্বজনীন মিলনের পথ হল সকল জাতির শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন ঠিকানা। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে যে প্রাচীর গাঁথা রয়েছে তার আশু অপসারণ চাই। যাতে অবাধ সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে সম্প্রীতি পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমবায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। .....

> .... তিনি উপলব্ধি করেন আধ্যাত্মিকবোধ ও অনুভূতির উপর বিশ্বমানবতন্ত্র রচিত হবে। সেইজন্য চাই বর্বর রাজনীতির পরিবর্তে উপযুক্ত আন্তর্জাতিক আইন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা, যাতে ভয়, অবিশ্বাস, বিভেদ, দ্বন্দ্ব ও জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অতিক্রম করে শান্তি, মৈত্রী সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হয়। ভারতের শাশ্বত বাণীর প্রতীক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধরূপে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা তার সেই চিন্তারই নিদর্শন।"[১২]

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। জাতীয়তাবাদের ধারণাটি পর্যালোচনা করলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তিনি ভারতের জাতীয়তা বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান ও অন্যান্য রচনার মধ্যে দিয়ে তার অকৃত্রিম দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের মুক্তি আন্দোলন, জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি কবির একান্ত আগ্রহ ছিল। তবে জাতিগঠন প্রক্রিয়ার তিনি ইউরোপীয় পথ অনুসরণের বিরোধী ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যুদ্ধলিপ্সু সংকীর্ণ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ ভারতীয়দের কাছে কখনই অনুকরণীয় নয়। তাই স্বদেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের মধ্যে কোনো খাদ না থাকলেও সেই দেশাত্মবোধ কখনই অন্ধ দেশাত্মবোধ ও উগ্র সাজাত্য প্রেমে পরিণত হয়নি। তাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথে এই ধরনের উগ্রতার সৃষ্টি হলে তিনি কখনই তা সমর্থন করতে পারেননি। আসলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবদরদী কবি। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের স্বপ্নই তিনি দেখেছেন আজীবন। মানব মুক্তিই তাঁর জীবনের মূল আদর্শ। আর রবীন্দ্র মানবতাবাদের রসচিন্তার উৎসভূমি ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি যা বিশ্বচরাচরের মানুষের মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানেনি। সমাজকেন্দ্রিক রাষ্ট্রচিন্তার দিশারী কবি তাই তার চিন্তাক্ষেত্রকে একটি রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিশ্ব সমাজের অসীম ক্ষেত্রে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং হয়ে উঠেছেন প্রকৃত বিশ্বনাগরিক।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও বর্তমান মানব সমাজে রবীন্দ্র চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা প্রবলভাবেই প্রাসঙ্গিক। বিগত শতকে সন্ত্রস্ত মানুষ পর্যবেক্ষণ করেছে দু-দুটি ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী মহাযুদ্ধ যা সভ্যতার গর্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। রণক্লান্ত, শান্তিকামী মানুষ শেষ পর্যন্ত ঠাঁই নিয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদের আশ্রয়ে। কিন্তু এ সত্ত্বেও সাবেক সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক কালে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, নব উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের মতো নব নব রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। এছাড়াও বিশ্বের নানা প্রান্তে সন্ত্রাসবাদ, আধিপত্যবাদ, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, গত উন্মাদনা মানব সমাজকে প্রায়শই ঠেলে দিচ্ছে সংকটের দিকে। এরূপ অবস্থায় স্থায়ী, শান্তিপূর্ণ নিরাপদ, যুদ্ধহীন আগামী বিশ্বকে বাস্তবায়নের জন্য আমাদের ফিরে তাকাতে হবে উদার-উন্মুক্ত সংস্কারহীন রবীন্দ্র চিন্তনের নিরাপদ আশ্রয়ে। সেটাই মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ।

সূত্র নির্দেশ :

১। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত : কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ পঃ বঃ সরকার ১৩৬৮, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০

২। স্বদেশী সমাজ, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড পৃঃ - ৬৮৪

৩। তদেব : পৃঃ ৬৮৫

৪। প্রসঙ্গকথা, আত্মশক্তি রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, পৃঃ - ৮৫২

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারত ভাবনা, অমর্ত মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা, সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পাদিত) একুশে কলকাতা ২০০১ পৃঃ ১২৪

৬। নেশন কী, আত্মশক্তি রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড পৃঃ ৬৭৬

৭। তদেব পৃঃ ৬৭৭

৮। তদেব পৃঃ ৬৭৮

৯। লড়াইয়ের মূল, কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড পৃঃ ২৩১

১০। বিরোধমূলক আদর্শ, আত্মশক্তি রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড পৃঃ ৮৮২-৮৮৩

১১। ইম্পীরিলিজম্ : রাজা প্রজা রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড পৃঃ ৯৬৪

১২। তদেব পৃঃ ৯৬৫

১৩। শিক্ষার মিলন শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড পৃঃ ৬৭৫-৬৭৬

১৪। তদেব পৃঃ ৬৭৪

১৫। বিরোধমূলক আদর্শ, আত্মশক্তি রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড পৃঃ ৮৮৩

১৬। শিক্ষার মিলন, শিক্ষা রবীন্দ্ররচনাবলী একাদশ খণ্ড পৃঃ ৬৭৬

১৭। সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (২য় খণ্ড) জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৬৮, পৃঃ ১০৫।

প্রাবন্ধিক শ্রী সৌমেন ঘোষ জঙ্গিপুর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

রবীন্দ্রনাথের পল্লিসংগঠন ভাবনা : একালের প্রেক্ষিত

ড. হেনা সিন্‌হা

রবীন্দ্রনাথের শহুরে গণ্ডীবদ্ধ জীবনে প্রথম পল্লির অনাবিল আনন্দ ও মুক্তির আস্বাদ বহন করে আনে শিলাইদহের প্রকৃতি। যদিও তাঁর এগারো বছর বয়সে কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের উপদ্রব দেখা দিলে পানিহাটির বাগান বাড়িতে আশ্রয়লাভের কথা 'জীবনস্মৃতি' পাঠকের অজানা নয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ীভাবে পল্লিবাসের সুযোগ আসে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে পিতার জমিদারির কাজ দেখাশোনার জন্য তিনি যখন পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে আসেন; পল্লির সঙ্গে তখন তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। পরবর্তী জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে বীরভূমের শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের শান্তশ্রী পল্লির সান্নিধ্যে। জমিদারির কাজে শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুর, কালিগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরে পল্লিবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যেমন মুগ্ধ হলেন তেমনি গ্রামের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনার সঙ্গেও পরিচিত হলেন। পল্লির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কথা জানিয়েছেন এভাবে —

> "তারপর পল্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে — ঠিক পূর্ববঙ্গে নয়, নদিয়া এবং রাজশাহী জেলার সন্নিকটে। সেখানে পল্লীগ্রামের নদীপথ বেয়ে নানান জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে আমাকে। পল্লীগ্রামকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার, তার আনন্দ ও দুঃখকে সন্নিকটভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেলেম এই প্রথম।"[১]

সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতির সান্নিধ্য তাঁকে নতুন জগতের সন্ধান দেয়। তিনি উপলব্ধি করলেন মানুষগুলি সহজ-সরল কিন্তু দরিদ্র; শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো থেকে নির্বাসিত, বহুদিক থেকে বঞ্চিত এবং অবহেলিতও; নিজেদের অধিকারবোধ ও ভালো-মন্দ ভাবনা সম্বন্ধেও উদাসীন। এদের সংগঠিত করতে হবে। সেই ভাবনাই রবীন্দ্রনাথকে নিরন্তর উদ্‌বেজিত করেছে। তিনি বিবিধ পথ ও পন্থা প্রয়োগ করে পল্লিবাসীর অনগ্রসরতা, উপেক্ষা, বঞ্চনা ও অনাদরের প্রতিকার করেছিলেন যা আজও অনুসরণযোগ্য।

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যেই তাঁর পল্লিভাবনার অনুরণন আছে কিন্তু তা সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও পত্রাবলিতে। পল্লির প্রশান্ত পরিবেশ ও সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্থ সাধারণ মানুষগুলির সান্নিধ্যে

এসে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন, যে পল্লি শস্য উৎপাদন করে শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই পল্লি কত উপেক্ষিত —

> " চাঁদের যেমন একপিঠে অন্ধকার, অন্যপিঠে আলো, এ সেইরকম। .... অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ।"[২]

পল্লিতে বসবাসকারী মানুষের এক বিরাট অংশ যারা মূলত কৃষিজীবী তাদের দুর্দশার কথা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন। কারণ গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি ও কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সম্ভব। পুরাতন প্রথায় নয়, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় চাষ করে অনেক বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে হবে — তবেই তাদের অবস্থার উন্নতি হবে। তাঁর মতে —

> "আমাদের দেশে চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয় — সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।"[৩]

প্রকৃতির দানের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সংযোগ-সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ভাবনায় — "যন্ত্রে যাঁরা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনমতেই পেরে উঠবে না।"[৪]

উন্নত ব্যবস্থায় কৃষিকার্য সুসম্পন্ন করতে বিদেশে প্রচলিত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষবাস শিক্ষার জন্য পুত্র, বন্ধুপুত্র ও জামাতাকে বিদেশে পাঠান। তাঁদের শিখে আসা অভিজ্ঞতা এদেশে প্রয়োগ করেন। বর্তমানে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণ। তিনি উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজেরও ব্যবস্থা করেন। জনবিস্ফোরণের দেশ এই ভারতবর্ষে একদিকে যখন কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে এবং অন্যদিকে খাদ্যশস্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান তখন কৃষিকাজের জন্য উন্নত প্রযুক্তি, রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল বীজ, কখনও কখনও জিনগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকারী বীজ বা শস্য ব্যবহার করে আশু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা — রবীন্দ্রনাথের সেদিনের ভাবনার নবরূপায়ণ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

রবীন্দ্রনাথের মতে সমবায়ের মাধ্যমে চাষই "আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।"[৫] শিলাইদহে বসবাসকালেই তাঁর মনে গ্রামবাসীদের নিয়ে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার চিন্তা জাগে। 'সমবায়নীতি', 'পল্লিপ্রকৃতি' গ্রন্থের

বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর সমবায় ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। পাশ্চাত্যের ইউরোপ ও আমেরিকায় চাষীরা যেভাবে চাষ করে, আমাদের দেশের চাষীদের তিনি সেইভাবে চাষ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম যেমন বাঁচানো যায় তেমনি পারস্পরিক সহযোগিতায় অনেক মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে। তাঁর ভাষায় —

> "অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই ইউরোপে আজকাল কো-অপারেটিভ প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে।"[৬]

রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণে ওইসব দেশের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের আনন্দময় জীবনের ছবি দেখে তিনি নিজের দেশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলির কথা চিন্তা করে তাদের বৈষয়িক ও মানসিক উন্নয়নের দিকে নজর দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে পতিসরে এবং পরে শ্রীনিকেতন পল্লিসংগঠনের সব ব্যাপারে মূলভিত্তিরূপে সমবায়কে দাঁড় করিয়েছিলেন। ব্যাপকভাবে কৃষি সমবায়, স্বাস্থ্য সমবায়, শিক্ষা সমবায়, শিল্প সমবায় প্রভৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। স্যার হ্যামিলটনকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

> "আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, একমাত্র এই ধরনের সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ভারতের মত দেশের অর্থনৈতিক দাসত্বের মুক্তি সম্ভব। আমার সীমিত ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও চেষ্টা করছি। দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করাতেই মানুষের কল্যাণ ও উন্নতি যেমন হয় তেমনি তাদের মরা মনকেও উজ্জীবিত করা যায়।"

পল্লিসংগঠনের ভিত্তির মূলে ছিল এই ভাবনা। শ্রীনিকেতনে এই কাজের অন্যতম সহায়ক তথা প্রধানকর্মী কালীমোহন ঘোষের পুত্র শান্তিদেব ঘোষ তাঁর স্মৃতি কথা 'জীবনের ধ্রুবতারা'য় জানিয়েছেন —

> "শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর গুরুদেবের চিন্তামতো দরিদ্র গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের যতগুলি কার্যসূচি রূপায়ণে পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের দ্বারা পিতৃদেব যত রকমের কাজ শুরু করেছিলেন, তার মধ্যে 'সমবায় সমিতি ও সমবায় ধর্মগোলা' ছিল অন্যতম। নানাপ্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্যে দরিদ্র গ্রামবাসীদের মনে সমবায়নীতি আগ্রহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন।"[৭]

স্বাধীনতার পর দেশের অনেক জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথের এই সমবায়ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। আজকের দিনে বিভিন্নরকম স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে

মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনার অনুসরণ লক্ষ করি।

বন্যা বা খরার ভয়ে ভীত মৌসুমি বৃষ্টিনির্ভর চাষবাস কৃষকদের সারা বছরের ভরণপোষণ জোগাতে পারত না – তাই জমিদার বা সুদখোর মহাজনদের কাছে তাদের ঋণ করতে হত। সেই ঋণ ও তার সুদ জমতো পুরুষাণুক্রমে এবং শেষে দেনার দায়ে জমি বিক্রি করে তারা ভূমিহীন মজুরে পরিণত হত। অর্থগৃধ্নু জমিদার এবং মহাজনদের হাত থেকে ঋণভারগ্রস্ত অসহায় কৃষককে রক্ষা করার জন্য এবং কৃষকদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 'পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেন। বন্ধু-বান্ধব ও দু-একজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে এই ব্যাঙ্ক খুললেন। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন –

> "রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজে গ্রামের সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি কার্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সংঘকর্ম ও সঞ্চয়-অভ্যাস শিক্ষা দিবার জন্য জমিদারিতে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন, সেই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক 'পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক' নামে পরিচিত হয়। .... রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সমবায় শক্তি জাগরূক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন ও অন্যান্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন বাংলাদেশে সরকারি কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই। ১৯০৫ সালে ব্যাঙ্ক বলিতে কী বুঝাইত, তাহার কোনো ধারণা সাধারণ লোকের ছিল না, সুতরাং কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাকে একটি নূতন ঘটনাই বলিব।"[৮]

কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গতি ছিল কম। এজন্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারের এক লক্ষ আশি হাজার টাকার পুরোটাই পতিসর কৃষিব্যাঙ্কে রেখেছিলেন তিনি। পরে অবশ্য এ টাকা ফেরত পাওয়া যায়নি। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি থেকে জানতে পারি –

> "কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালিগ্রাম পরগণার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। .... ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার।"

বর্তমানযুগে এই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আরও উন্নত রূপ লক্ষ করি। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, অল্প সুদে চাষিদের স্ব-নির্ভর করে তোলার বিভিন্ন স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। নোবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুস-এর ভাবনার মধ্যেও আমরা রবীন্দ্রভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করি।

ঝগড়া বিবাদের জন্য মামলা-মোকদ্দমায় যাতে প্রজাদের অহেতুক সময় ও

অর্থব্যয় না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে রবীন্দ্রনাথ হিতৈষী সভা গঠন করেন। গ্রামের উন্নতির জন্য এই হিতৈষী সভা যেমন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পরিবহন, চাষের উন্নতি, বয়নশিল্প, জলকষ্ট নিবারণ, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি করতেন। তেমনি সালিশির মাধ্যমে বিবাদের মীমাংসা করতেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ খ্রি.) লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন –

> "যাতে গ্রামের লোক নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে – বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় – তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।"

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়ানেও এর সমর্থন মেলে –

> " .... এই কয়েকটি প্রধান কাজ ছাড়াও বুজে যাওয়া মজা ডোবা ও পুকুর পুনরুদ্ধার করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, যেখানে পানীয়জলের অভাব সেখানে কূপ খনন করে দেওয়া প্রভৃতি সাধারণের উপকারার্থে নানান কাজে হিতৈষি সভা ক্রমশঃ হাত দিচ্ছে। পতিসরে একটি ধর্মগোলারও ব্যবস্থা হয়েছে।"[৯]

গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলীপ্রথার প্রবর্তন করেন। সমস্তরকম অব্যবস্থাকে 'ব্যবস্থাবদ্ধ' করতে এবং আমলাদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষার্থে তিনি এই মণ্ডলীপ্রথার প্রচলন করেন। তাঁর মতে কতকগুলি পল্লি নিয়ে এক একটি মণ্ডলী স্থাপন করা উচিত।

> "সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্প-শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডল থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।"[১০]

আজকের লোক আদালত, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যেন তার এক পরিমার্জিত সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথ শতাব্দীকাল আগেই আমাদের পঞ্চায়েত তথা পৌরব্যবস্থার চেহারাটা যেন উপলব্ধি করেছিলেন।

পল্লিবাসীদের জলকষ্টের দিকটিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। পদ্মাতীরে এবং শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে জলাভাব লক্ষ করেছেন। 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের 'জলোৎসর্গ' ও 'সম্ভাষণ' প্রবন্ধ দুটিতে জলাভাবজনিত কষ্টের কথা উল্লেখ করা

হয়েছে। পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের তীব্র জলকষ্টের কথা স্মরণ করে বলেছেন --

> "পদ্মা-তীরের পল্লীতে থাকবার সময় দেখেছি চার-পাঁচ মাইল তফাত থেকে মধ্যাহ্ন রৌদ্র মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে মেয়েরা বারে বারে জলবহন করে নিয়ে চলেছে।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ ব্রতীদল গঠন করে পুষ্করিণী খনন, জলাশয় পরিষ্কার প্রভৃতির মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। একসময় ধনী ব্যক্তিরা জলদান করতেন, অনেক দরিদ্র মানুষ এতে উপকৃত হতো। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

> "একদিন ধনীরা জলদান, শিক্ষার ব্যবস্থা পুণ্যকাজ বলে মনে করত। ... যেই তারা গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে আরম্ভ করেছে অমনি জল গেল শুকিয়ে, কলেরা ম্যালেরিয়া গ্রামকে আক্রমণ করলে, গ্রামে গ্রামে আনন্দের উৎস বন্ধ হয়ে গেল।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ সে সময় জলাভাব দূরীকরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর জল সংক্রান্ত বক্তব্যগুলি আজও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

> "আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা বলে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই, যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পঙ্কবিলীন -- যে করে আরোগ্যবিধান সেই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষার্ত, মলিন, রুগ্ন, উপবাসী।"[১৩]

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার কমে যাচ্ছে, অনেক ব্লক 'ব্রাউন' এবং 'ডার্কব্লক' হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। নগরায়ণের প্রভাবে জলাভূমি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে আমাদের জল, তা থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে পল্লি তথা দেশের বিশাল অংশের মানুষ। আজও রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জল সংস্কার এবং জলের সদ্ব্যবহারের জন্য 'জল চেতনা জাঠা' বের করতে হয়। যে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সেদিন কাজ শুরু করেছিলেন সে কাজ আজও আমরা সুসম্পন্ন করতে পারিনি তো বটেই বরং সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সেই সচেতনতার কথা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হচ্ছে।

শিক্ষাকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম ব্রত। বিভিন্নপ্রকার রচনা এর সাক্ষ্য বহন করে। কারণ তিনি শহরের মানুষের তুলনায় পল্লির মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, অর্থনীতি বিভিন্ন দিকের বঞ্চনার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন, ব্যথিত হয়েছেন। সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন সেই বৈষম্য দূর করে প্রতিকার করার। শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম-শহরের বৈষম্য

তুলে ধরতে 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩) প্রবন্ধে লিখছেন —

> "শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এনলাইটেন্ড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ... দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনো দিন চালানো হয়নি, সেকথা মনে রাখতে হবে।"[১৪]

দেশের এই প্রায় বারো আনা অনালোকিত সাধারণ পল্লির মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থায় সচেষ্ট হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পল্লির মানুষের এই বঞ্চনা ও ব্যবধানের প্রতিকারার্থে তিনি লিখেছেন —

> "…. গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না, যে শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে।"[১৫]

কারণ শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। গ্রামের মানুষকেও সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার সার্বিক উন্নতি দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছেন তেমনি উৎসাহিতও হয়েছেন। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি লিখছেন —

> "আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা অবমাননার নিম্নতল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক, খ, গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ ধনী-দরিদ্র, গ্রাম-শহর-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ যাতে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে তার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস ছিল আত্যন্তিক। প্রাথমিক থেকে শুরু করে লোকশিক্ষা এবং 'সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা'র উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অর্থাৎ ন্যূনতম শিক্ষাটা যাতে পায় তার ব্যবস্থা করতেই হবে, তারপর যার সামর্থ্য আছে শহরের হোক বা গ্রামের সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে — এই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষা-প্রসার-বিষয়ক নীতি পরবর্তীকালে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুসরণ করে চলেছেন। ভারতের সংবিধানে চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামেও প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়েছে। বারো ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। 'নৈশ বিদ্যালয়' স্থাপন ও 'প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা'-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্প গ্রহণ করে নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তোলার চেষ্টা করছেন। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের ভাবনায় ও সর্বশিক্ষা মিশনের সাধু প্রচেষ্টার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সংক্রান্ত এই কল্যাণবোধের প্রতিফলন দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা একটা বড়ো বিষয়, প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষা ও

সংস্কৃতিচর্চার জন্য ছিল শান্তিনিকেতন। আর গ্রামজীবনের নাড়ির সঙ্গে যোগরক্ষা করে কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা বিস্তারের দিকে লক্ষ রেখে শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষাসত্র, পল্লিশিক্ষা-সদন, পল্লিশিক্ষা ভবন, শিল্পভবন প্রভৃতি। এর মূল আদর্শ ছিল গ্রাম জীবনের প্রেক্ষিতে এমন একদল স্বাবলম্বী নাগরিক তৈরি করা যারা শিক্ষা শেষে নিজেদের দায়িত্বে গ্রামোন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ জীবন নির্বাহ করতে পারবে। শ্রীনিকেতনে গ্রামোন্নয়নের কাজে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করেছিলেন এল্‌মহার্স্ট্‌ সাহেব, কালীমোহন ঘোষ, সন্তোষ মজুমদার, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

বর্তমানে আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বেশ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। West Bengal State Council of Vocational Education খোলা হয়েছে। স্কুলে বিভিন্নরকম ভোকেশনাল কোর্স চালু হয়েছে। আমাদের রাজ্যে ভোকেশনাল কোর্সকে সেরকমভাবে গ্রহণ না করলেও গুজরাট, মহারাষ্ট্রের মতো শিল্পোন্নত রাজ্যে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ছাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথ পল্লি-উন্নয়নের মধ্য দিয়ে গ্রামের হতদরিদ্র মানুষগুলিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। আদর্শপল্লি গঠনের ও আত্মশাসনের শক্তিতে পল্লিকে সম্পূর্ণ করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাঁর এই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের 'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ' এবং 'পল্লীর উন্নতি' নামক প্রবন্ধে। অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে কয়েকটি গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার কথা তিনি বলেছেন —

> "আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে — এই কথা তখন মনে জেগেছিল এখনও সেই কথা মনে হচ্ছে।"[১১]

এই আদর্শ রূপায়ণে এবং শোষণমুক্ত সমাজ-কাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন একদল মানুষের যারা বৈজ্ঞানিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে যূথবদ্ধ হয়ে দীর্ঘকালের জন্য শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

পল্লির স্বাস্থ্য পরিষেবাও ছিল উপেক্ষিত। গ্রামের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা উল্লেখ করে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে একটি ভাষণে জানান —

"গ্রামের মধ্যে ..... অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি .....।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সমবায় প্রথায় গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যসমিতি গঠন করে রোগ নিবারণের চেষ্টা করেন। চিকিৎসার জন্য তিনি গ্রামে হাসপাতালেরও ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসা বিভাগের কর্মচারীদের বেতন দিতেন জমিদারি এস্টেট থেকে। তিনি নিজেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। আজ অবশ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সৌজন্যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা অনেক উন্নত। বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করে সর্বস্তরের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য-পরিষেবা পৌঁছে দেবার চেষ্টা চলছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রতীদল গঠন করে গ্রামের মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ব্রতীদলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ ছিল — "রোগীদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য কুঠি বাড়িতে নিয়ে আসবে, আর কঠিন রোগীদের সরকারি ডাক্তারখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। খবরদার, ঝাড় ফুঁক করতে দেবে না।" কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমরা সমস্ত মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে পারিনি — পারিনি তাদের কু-সংস্কারমুক্ত করতে। আজও গণেশ দুধ খায়, আরব সাগরের জল মিষ্টি হয়, গ্রামের অসহায় মহিলাকে ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়, সাপে কামড়ালে এ.ভি.এস. না দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা হয়। তাবিজ, কবজ, পাথর ও ধাতুর ব্যবসা রমরমিয়ে চলে। এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আবারও প্রয়োজন অনুভব করি রবীন্দ্রনাথের মতো বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষের।

শহরের মানুষের জন্য যেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আনন্দলাভের ব্যবস্থা আছে, গ্রামের মানুষের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। গ্রামের যেসব মানুষ কবিত্বশক্তির অধিকারী তাঁরা মনের আনন্দে ছড়া, গান, কবিতা প্রভৃতি রচনা করেন। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'গ্রাম্যসাহিত্য', 'ছেলেভুলানো ছড়া', প্রভৃতি প্রবন্ধে অজ্ঞাত পরিচয় গ্রাম্যকবিদের গান, ছড়া, কবিতা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

"গ্রামের মধ্যে প্রতিদিনের বিচিত্র কাজও চলিতেছে এবং তাহার ছিদ্রে ছিদ্রে একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে। ... গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক সেই আনন্দের সুর আছে। .... গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে; সেজন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।"[১৯]

গ্রামের সকল মানুষের চিত্তে যাতে আনন্দ সঞ্চারিত হতে পারে সেদিকেও তাঁর নজর ছিল। তাঁর মতে "গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে সবল হয়ে উঠুক। গানে

গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক।"[২০] রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামের মানুষের কাছে সংস্কৃতি চর্চা সেভাবে গুরুত্ব পায় না নানা কারণে। সেই মানুষগুলি নিরন্তর পরিশ্রম করে কিন্তু বিনোদনের জন্য কিছুই পায় না। তিনি একটি অভিভাষণে পল্লিবাসীর চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন —

> "পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিককালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেইজন্য যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে।"[২১]

রবীন্দ্রনাথ পল্লির এই শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করেছেন -- যাতে পল্লিবাসীর আত্মপ্রকাশের নানা দিক খোলা যায়, দেশের শিক্ষিত সমাজকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তাঁতের কাজ, রঙের কাজ, বেতের কাজ, কাঠের কাজ, চামড়া, মাটি, গালা, সূচিশিল্প, দড়ি প্রভৃতির কাজ ছাত্রদের শেখানো এবং গ্রামে গ্রামে সেগুলি ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। ব্রতীবালকদল ছাড়াও শান্তিনিকেতন থেকে স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন কাজে অভিজ্ঞ মেয়েরা গ্রামে গিয়ে সেইসব বিষয়ে সেখানকার মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে আসতেন। ফলে গ্রামবাসীর সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেত এবং আত্মপ্রকাশের নতুনদিকও উন্মোচিত হত।

মেলার প্রচলন ঘটিয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মেলামেশার, সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ও উৎপাদিত সামগ্রীর বেচাকেনার ব্যবস্থা করা জাতীয় নানান কর্মকাণ্ডের পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহে কাত্যায়নী ও রাজরাজেশ্বরী মেলা, শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা, শ্রীনিকেতনে মাঘ মেলা, শিল্প মেলা তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি প্রকৃতির উৎসবগুলিও তাঁর প্রবর্তিত অসাম্প্রদায়িক উৎসব বাংলার বহু গ্রামে নির্মল আনন্দ বিতরণ করেছে।

পল্লিবাসীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ও আত্মীয়তা স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের পাশে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিতেন রবীন্দ্রনাথ। কর্মীদের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল বিনীতভাবে আক্রমণে-বিদ্রুপে অবিচল থেকে নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে গ্রামের লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের কুসংস্কার, কুরুচি, জ্ঞাতিবিদ্বেষ ও অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে হবে আত্মীয়ের মমতা নিয়ে, তাদের বাইরের বৃহত্তর জগতের, স্বদেশের

অতীতের গৌরবময় ইতিহাস শোনাতে হবে। সেইসঙ্গে গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছে লোকসংগীত, লোকসাহিত্য, টোটকাচিকিৎসা, ছড়া, বচন প্রভৃতি বিষয় শিখতে হবে। তাদের শোকে সমবেদনা এবং উৎসবে আনন্দ জাগিয়ে আপনজন হয়ে উঠতে হবে। এইভাবে পল্লির মানুষের মনের তথা সংস্কৃতির উন্নতির সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বহমান রবীন্দ্রসংস্কৃতি চর্চাতে আজও তা অনুসৃত হয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ পল্লি তথা দেশের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব পালন করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই প্রথম শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরকে কবি এই উৎসবের বর্ণনা দিয়েছিলেন — "এখানে হল বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হল হালচালন। .... তোমার টবের বকুলগাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল।"[২২] তারপর থেকে প্রতিবছর এ উৎসব পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায় অরণ্যপ্রীতি বা বৃক্ষপ্রীতির কথা লিখেছেন। 'বনবাণী' কাব্যের বিভিন্ন কবিতা, 'বলাই'-এর মতো গল্প তার সাক্ষ্য বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দাদামশাইকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন —

> "গাছপালা নইলে আমি তো বাঁচিব না। .... ইট-কাঠ, চুন-সুরকি মৃত্যুভারের মতো আমাদের উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে। বড়ো বড়ো ইমারতগুলো তাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাদের গিলিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড কলকাতাটার কঠিন জঠরের মধ্যে আমি হজম হইয়া যাই। কিন্তু এখানে এই গাছপালার মধ্যে প্রাণের হিল্লোল আছে।" (চিঠিপত্র)

একশো বছরেরও বেশিকাল আগে তিনি যেন বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশ সংকট সম্পর্কে সতর্কবার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১৭ ভাদ্র শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে 'অরণ্য দেবতা' নামক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। যার মধ্যে তাঁর অরণ্যপ্রীতির পরিচয় যেমন আছে তেমনি অরণ্য ধ্বংস সাধনের বিরুদ্ধে সাবধানবাণীও উচ্চারিত হয়েছে —

> "সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিলা পাষাণী, বন্ধ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোনো লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায়নি। চারিদিকে অগ্নি-উদ্‌গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন সুযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর অঙ্গনে, চারিদিকে তাঁর তৃণশষ্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হল, নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন করে। তখনো জীবের আগমন হয়নি, তরুলতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া। সকলের চেয়ে তার

বড়ো দান অগ্নি; সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে। মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারালো; যে তার প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইট কাঠের বাসস্থান তৈরি করার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিল যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে।"

প্রবন্ধের বক্তব্য আজও এতটাই প্রাসঙ্গিক যে কারণে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া থেকে নিবৃত্ত হতে পারলাম না। আজকের দূষণগ্রস্ত মানুষের কাছে তা প্রতিশোধকের কাজ করবে।

ক্রমবিকশিত সভ্যতার মনুষকুল কীভাবে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করে তাদেরই রক্ষাকারী অরণ্যকে ধ্বংস করেছে সে কথাও জানিয়েছেন উক্ত প্রবন্ধে —

"লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়েভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।"

পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য আশু কর্তব্যের কথাও রয়েছে প্রবন্ধে।

"আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম হলকর্ষণ -- হলকর্ষণ আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারিদিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।"[২৩]

এছাড়াও 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'হলকর্ষণ উপেক্ষিতা পল্লী' নামক ভাষণে 'পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধে অরণ্যের তথা বৃক্ষরোপণের, বৃক্ষ সংরক্ষণের পক্ষে এবং অরণ্য ধ্বংসের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। মানুষের শুভবুদ্ধির উদ্বোধনের মাধ্যমেই পরিবেশ সংকটের সমাধান সম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন —

"প্রকৃতির দান ও মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড়ো হয়েছে — আজও এই দুটোকেই সহযোগীরূপে চাই।"[২৪]

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম বড়ো সমস্যা পরিবেশ দূষণ। 'এ পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য' করে আমরা আর রাখতে পারছি না। আমাদের চারিদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, দৃশ্যদূষণ ও মানবিকগুণের দূষণ। মানুষের ভোগলিপ্সা প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে যথেচ্ছভাবে। কিন্তু ফিরিয়ে দেয়নি কিছু। প্রকৃতির সঙ্গে গড়ে তোলেনি কোনো আত্মিক সম্পর্ক। বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের পর —বৃহৎশিল্প স্থাপন, সহযোগী হিসাবে বড়ো জনপদ গড়ে ওঠা ও বৃহৎ যানবাহনের ব্যবহার বেড়েছে খুবই। এগুলি পরিবেশকে করেছে অধিক থেকে অধিকতর দূষিত; পরিবেশের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ।

এখন আমরা অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিও থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্‌সবার্গ ছোটাছুটি করছি, সংগঠিত করছি বসুন্ধরা সম্মেলন, অনুসৃত হচ্ছে কিয়েটো প্রোটোকল। তাও পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত মানুষের দারিদ্র্য ও অপুষ্টি — এগুলি দূরীকরণের কোনো প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা। রবীন্দ্রনাথ ইট, কাঠ-পাথরের গড়া নাগরিক সভ্যতাকে কটাক্ষ করে বলেছেন — "দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর।" আজকের পরিবেশ আন্দোলনের ভাবনা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই ভেবে গেছেন। পরিবেশবিদ্‌রা আরো জোরালো ভাবে সে কথাই উচ্চারণ করেন। আমরা সবাই জানি বিশ্ব-উষ্ণায়ন রুখতে সবুজায়ন একান্ত জরুরি। তারজন্য বর্তমানে বনসৃজন প্রকল্প, অরণ্য সপ্তাহ পালন, বনসুরক্ষা প্রভৃতি করা হচ্ছে। পরিবেশবিদ্‌রা পরিবেশ বাঁচাতে 'চিপকো আন্দোলন'; 'সবুজ বাঁচাও' আন্দোলন গড়ে তুলছেন। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বনসৃজন করা হচ্ছে। সুদূরদ্রষ্টা কবি অনেক আগেই বৃক্ষরোপণ-হলকর্ষণ উৎসব পালন করেছেন; গেয়েছেন — "মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে / হে প্রবল প্রাণ", একাত্মতা অনুভব করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে। বৃক্ষ, প্রকৃতি, ঋতুবৈচিত্র্য প্রভৃতি নিয়ে উৎসব করেছেন। গ্রিন হাউস গ্যাসের উদ্‌গীরণের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি এবং ব্যাপক গাছপালা অরণ্যের ধ্বংস সাধন যে আজ পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্নকারী ভূ-উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী তা কবি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। কাজেই আজকের পরিবেশবিদদের ভাবনার পথপ্রদর্শক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু ভাবজগতে বিচরণ করেননি, অবহেলিত ও উপেক্ষিত গ্রামের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে বিচলিত হয়ে তার সমাধানের কথাও চিন্তা করেছেন — এই বিশাল কর্মকাণ্ডই তার প্রমাণ। শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের

সদস্যদের প্রতি 'সম্ভাষণ' — এই পল্লিজীবন কেন্দ্রিক এই কর্মানুষ্ঠানের যথাযথ মূল্যায়নের আবেদন জানিয়েছেন —

"আমি আমার জীবনে অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক নিন্দা এখনও আমার ভাগ্যে আছে। আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানিনা, বুঝতে পারি না — এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন। ..... আজ আপনারা দেখে যান এবং বুঝে যান বাংলার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোথায়। ... আপনারা যদি আমার এই কর্মানুষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন -- তবেই তার প্রকৃত সার্থকতা।"[২৫]

অন্য একটি অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মকাণ্ডের ভবিষ্যৎ বিচারের দায়িত্ব দিয়েছেন স্বদেশবাসীকে —

"সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। .... পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।"[২৬]

মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ পল্লিবাসীর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ স্থাপন করেছিলেন তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে আমরা যদি এক সুন্দর পৃথিবী ভাবী প্রজন্মকে উপহার দিতে পারি, যেখানে কৃষক, শ্রমিকসহ সমস্ত মানুষ সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে, যেখানে উন্নত প্রথায় চাষ হবে, সমবায়ভিত্তিতে জীবন চলবে, সাধারণ বিচারে জন্য আদালতে যেতে হবে না, গ্রামীণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি উন্নত হবে, বসন্ত যেখানে বোবা হবে না — তবেই সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

সূত্র নির্দেশ :

১। অভিভাষণ, পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পঃবঃ সরকার, পৃষ্ঠা - ৫৭১।

২। পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ, পঃ বঃ সরকার, পৃ-৫১৫।

৩। পল্লীসেবা, তদেব — পৃঃ-৫১৮

৪। তদেব — পৃঃ-৫০৭।

৫। সমবায়নীতি — তদেব — পৃঃ-৪১৭।

৬। তদেব — পৃঃ-৪১৮।

৭। শান্তিদেব ঘোষ, জীবনের ধ্রুবতারা, দেশ, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৬ সংখ্যা।

৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩ — পৃঃ-(১৭৬-১৭৭)।

৯। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, ১৯৬৬, পৃঃ-৩৩।

১০। রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকসংস্করণ, ১২শ খণ্ড, পৃঃ-৮১৯।

১১। রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ-৫৬৬।

১২। তদেব — পৃঃ-৫৩৯।

১৩। ১১-এর অনুরূপ।

১৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, ১১শ খণ্ড, পৃঃ-৬৫৮।

১৫। ১১এর অনুরূপ — পৃঃ-৫১৯।

১৬। রাশিয়ার চিঠি, র-র জন্ম সংস্করণ ১০ম খণ্ড, পৃঃ-৭০৭।

১৭। ১২-এর অনুরূপ — পৃঃ-৫৪০।

১৮। র-র জন্ম সংস্করণ, ১২শ খণ্ড, পৃঃ - ৮২১।

১৯। র-র জন্ম সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ-৭১৯-৭২০।

২০। ১৯এর অনুরূপ।

২১। তদেব — পৃঃ ৫৩৪।

২২। চিঠিপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পত্রসংখ্যা-২৮।

২৩। ১৯এর অনুরূপ — পৃঃ - ৫৩১-৫৩২।

২৪। তদেব — পৃঃ-৫১৪।

২৫। তদেব — পৃঃ - ৫৬৯-৭০।

২৬। তদেব — পৃঃ-৫৩৫।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লী ও শহর — মধুসূদন বসু, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

২। রবীন্দ্রনাথ : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সম্পাদনা — বিপ্লব চক্রবর্তী, বর্ধমান।

৩। রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীজীবন — ড. অসীমকুমার মণ্ডল, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা।

৪। রবীন্দ্রনাথ : পল্লীপুনর্গঠন, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫। জনবিজ্ঞানের ইস্তাহার — শারদসংখ্যা — ২০১০, পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চ।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বাংলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপিকা ড. হেনা সিন্‌হা বর্তমানে জঙ্গিপুর কলেজে কর্মরতা।

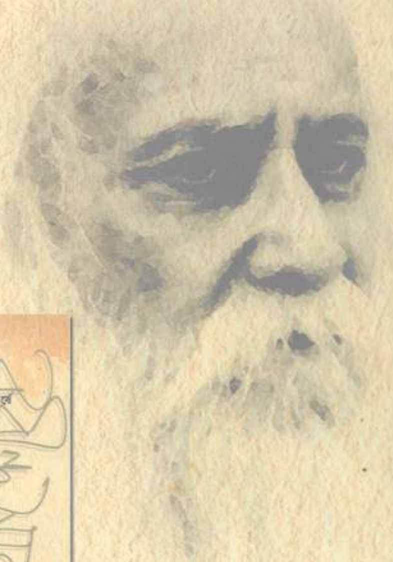

ISBN 978-81-921883-0-0